

মাধ্যমিক রসায়ন

নবম-দশম শ্রেণী



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

মাধ্যমিক রসায়ন

নবম-দশম শ্রেণী

রচনা

ড. সরোজ কান্তি সিংহ হাজারী

সম্পাদনা

ড. আবুল খায়ের

ড. এ টি এম শরীফ উল্লাহ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
লেজার স্ক্যান লিমিটেড
ফোন : ৯৫৬২৮৬৫, ৯৫৬৭৬০৮

চিত্রাঙ্কন
নাসির বিশ্বাস

প্রচ্ছদ
সেলিম আহমেদ

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

মূল্য :

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

জাতীয় উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি শিক্ষা। শিক্ষার ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের অব্যাহত ধারায় যাতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক।

দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এ পুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমরা জানি, জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল, জীবনমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির ধারাবাহিক সংস্কার ও নবায়ন। এ বিবেচনার আলোকেই ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য একটি ‘শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স’ গঠন করা হয়। এ টাস্কফোর্স প্রণীত কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে ১৯৯৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির দিকনির্দেশনায় উক্ত স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন করা হয়। নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী রচিত পাঠ্যপুস্তক ১৯৯৬ সালে ষষ্ঠ ও নবম এবং ১৯৯৭ সালে সপ্তম, অষ্টম ও দশম শ্রেণীতে প্রবর্তিত হয়।

পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে রচিত পুস্তকগুলো প্রবর্তনের পর আরও কয় বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ আমাদের সম্মুখে। তাই সময়, দেশ ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। আশা করা যায়, সংশোধিত ও পরিমার্জিত এ নতুন সংস্করণ যথাসম্ভব নির্ভুল, তথ্যসমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

এ শতাব্দী হবে প্রাণ রসায়নের শতাব্দী। প্রাণধর্মী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ সাধিত হবে এসময়। ভিন্ন মাত্রার সার কৃষি উৎপাদনে আনবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এন এম আর পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় এবং কিলেট পদ্ধতিতে অনেক জটিল রোগের চিকিৎসা হয়ে পড়বে সহজলভ্য। পদ্ধতি হিসেবে এগুলো রসায়নে পঠন-পাঠনের চিরাচরিত আলোচ্য বিষয়। রসায়নকে বলা হয় বস্তু ও শক্তির বিজ্ঞান। চাহিদা অনুসারে বস্তুর উৎপাদন এবং ভোগের প্রয়োজনে বস্তুকে সুষমামণ্ডিত করা রসায়ন শিল্পের মূল লক্ষ্য। হাইড্রাজিন ও ডাইনাইট্রোজেন টেট্রাক্সাইডের জুটি যেমন মহাকাশযানে একটি জ্বালানি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তেমনি আগামী দিনগুলোতে রসায়ন অনেক অপ্রচলিত জ্বালানি উদ্ভাবন করে এ সেক্টরে মানুষের সংকটের অবসান ঘটাবে।

আশা করা যায়, মাধ্যমিক রসায়ন পাঠ্যপুস্তকে নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমরা জানি—‘শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া’। সময় ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষিতে এর পরিমার্জন পরিবর্তন ও উন্নয়ন একটি স্বাভাবিক কর্মধারা। তাই এ পাঠ্যপুস্তকের আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে এ বইয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ বইটি রচনা, সম্পাদনা ও যৌক্তিক মূল্যায়নসহ প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দান করেছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য বইটি প্রণীত হল তারা উপকৃত হবে আশা করি।

প্রফেসর মো: মোস্তফা কামাল উদ্দিন

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

ঢাকা।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	পদার্থের অবস্থা ও পরিবর্তন	১
দ্বিতীয়	পদার্থের গঠন	৮
তৃতীয়	অ্যামোনিয়ামের সূত্র	২২
চতুর্থ	সংকেত, যোজনী ও সমীকরণ	৩০
পঞ্চম	পরমাণুর গঠন	৪৭
ষষ্ঠ	রাসায়নিক বন্ধন	৫৫
সপ্তম	পর্যায় সারণি	৬৫
অষ্টম	রাসায়নিক ক্রিয়া	৭৬
নবম	রাসায়নিক গতিবিদ্যা ও সাম্যাবস্থা	৮৫
দশম	তড়িৎ বিশ্লেষণ	৯৩
একাদশ	রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর	১০২
দ্বাদশ	ধাতু নিষ্কাশন	১১০
ত্রয়োদশ	ধাতু ও ধাতব যৌগের ধর্ম এবং ব্যবহার	১২০
চতুর্দশ	কতিপয় প্রয়োজনীয় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধাতুর রসায়ন	১৫২
পঞ্চদশ	জৈব যৌগ	১৮৩
ষোড়শ	ব্যবহারিক রসায়ন	২০০

প্রথম অধ্যায়

পদার্থের অবস্থা ও পরিবর্তন

বিষয় : (ক) পদার্থের অবস্থা : পদার্থ কী? পদার্থের অবস্থাভেদ ও শ্রেণীবিভাগ, পদার্থের অবস্থাভেদে পারস্পরিক রূপান্তর, আন্তঃআণবিক শক্তি, (খ) পদার্থের পরিবর্তন : ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন।

১.১ পদার্থ (Matter)

এ বিশ্বে আমরা যা কিছু দেখতে পাই বা যা কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করি, সব কিছুকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়; পদার্থ ও শক্তি। যার ভর আছে, যা কোনো স্থান দখল করে অবস্থান করে এবং যা তার স্থিতিশীল বা গতিশীল অবস্থার পরিবর্তনে বাধা প্রদান করে, তাকে পদার্থ বলা হয়।

অন্যকথায় বলা যায়, যার জড়তা (inertia) আছে, তাই পদার্থ। আমাদের চারদিকে যত বস্তু আছে, সবই পদার্থ। টেবিল, চেয়ার, মাটি, পানি, বাতাস ইত্যাদি। বাতাস আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু তার অস্তিত্ব অনুভব করি, তার ভর আছে এবং তা স্থান দখল করে আছে। সুতরাং বাতাস পদার্থ।

তাপ, আলোক প্রভৃতি হচ্ছে শক্তি। এগুলো কোনো স্থান দখল করে না। এগুলোর ভর নেই। সুতরাং এগুলো পদার্থ নয়।

১.২ পদার্থের অবস্থাভেদ (States of matter)

পদার্থ তিন অবস্থায় থাকতে পারে : (ক) কঠিন, (খ) তরল ও (গ) গ্যাসীয়।

(ক) কঠিন পদার্থ (Solid) : কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন, নির্দিষ্ট আকার এবং কমবেশি দৃঢ়তা আছে। খুব সহজে কঠিন পদার্থের আকার বা আয়তনের পরিবর্তন হয় না। বল প্রয়োগ করলেই কঠিন পদার্থ সাধারণত ভেঙে যায় না। অর্থাৎ কঠিন পদার্থের দৃঢ়তা আছে। এ দৃঢ়তা বস্তুভেদে বিভিন্ন পরিমাণের হয়। বিভিন্ন ধাতু, পাথর, লবণ, বালু প্রভৃতি কঠিন পদার্থের উদাহরণ। কঠিন পদার্থের অণুসমূহ পরস্পরের অতি সন্নিবিষ্ট থাকে এবং নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত থাকে।

(খ) তরল পদার্থ (Liquid) : তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন আছে, কিন্তু নির্দিষ্ট আকার নেই। যখন যে পাত্রে রাখা হয়, সে পাত্রের আকার ধারণ করে। কিন্তু পাত্রভেদে ভর বা আয়তনের কোনো পরিবর্তন হয় না। তরল পদার্থের অণুসমূহ পরস্পরের সন্নিবিষ্ট থাকে, তবে তাদের মধ্যকার আকর্ষণ কঠিন পদার্থের মতো প্রবল নয়। অণুসমূহ স্থান পরিবর্তন করতে পারে বলে তরল পদার্থের কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই। পানি, পেট্রল, কেরোসিন, ভোজ্য তেল তরল পদার্থের উদাহরণ।

(গ) গ্যাসীয় পদার্থ (Gas) : গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকার বা আয়তন নেই। কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসীয় পদার্থ, তা যত অল্প হোক না কেন, কোনো বড় বা ছোট পাত্রে রাখা হলে, তার সকল স্থান দখল করে এবং সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। কিন্তু পাত্রের আকার বা আকৃতিভেদে ভরের কোনো তারতম্য হয় না। গ্যাসীয় পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে দূরত্ব অনেক বেশি, তাই আকর্ষণ শক্তি অনেক কম, ফলে তারা প্রায় সম্পূর্ণ মুক্তভাবে চলাচল করে। নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসীয় পদার্থের উদাহরণ।

১.৩ পদার্থের রূপান্তর বা অবস্থার পরিবর্তন (Transformation of matter)

সাধারণত একই পদার্থ তিনটি ভিন্ন অবস্থাতেই বিরাজ করতে পারে। যেমন বরফ, পানি ও জলীয় বাষ্প একই পদার্থ। সাধারণ তাপমাত্রায় পানি একটি তরল পদার্থ। তাকে ঠান্ডা করলে 0°C তাপমাত্রায় তা কঠিন পানি বা বরফে রূপান্তরিত হয়। এ বরফকে তাপ দিলে তা আবার পানিতে পরিণত হয়। পানিকে তাপ দিলে 100°C তাপমাত্রায় ফুটে বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। বাষ্পকে ঠান্ডা করলে তা পানিতে পরিণত হয়। তাকে ঠান্ডা করে 0°C এ নিয়ে গেলে বরফে পরিণত হয়। এরূপভাবে প্রায় সকল কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে তারা গলে তরলে রূপান্তরিত হয়। যে তাপমাত্রায় কোনো পদার্থ কঠিন অবস্থা হতে তরলের পরিণত হয়, তাকে সে পদার্থের গলনাঙ্ক (melting point) বলা হয়।

তরলকে আরো উত্তপ্ত করলে তা বাষ্পে পরিণত হতে থাকে এবং এক সময় ফুটে আরম্ভ করে। যে তাপমাত্রায় কোনো

তরল পদার্থ ফুটতে থাকে তাকে সে পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক (boiling point) বলা হয়। স্ফুটনাঙ্ক বাইরের চাপের ওপর নির্ভরশীল। সাধারণত খোলা পাত্রে স্ফুটনাঙ্ক মাপা হয়। তখন তরলের উপরের বায়ুচাপ 1 atm থাকে।

সাধারণত বাষ্পকে ঠান্ডা করলে তরল এবং তরলকে ঠান্ডা করলে কঠিন পদার্থের সৃষ্টি হয়। সমগ্র প্রক্রিয়া নিম্নরূপে দেখান যায় :



অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে কঠিন পদার্থ উত্তপ্ত করলে সরাসরি বাষ্পে রূপান্তরিত হয়, তাকে উর্ধ্বপাতন (sublimation) বলা হয়। যেমন, আয়োডিন এবং ন্যাপথালিন। অপরদিকে অনেক পদার্থ উত্তপ্ত করে তরল বা গ্যাস হওয়ার পূর্বেই বিয়োজিত বা বিয়োজিত হয়ে যায়।

১.৪ আন্তঃআণবিক শক্তি (Intermolecular forces)

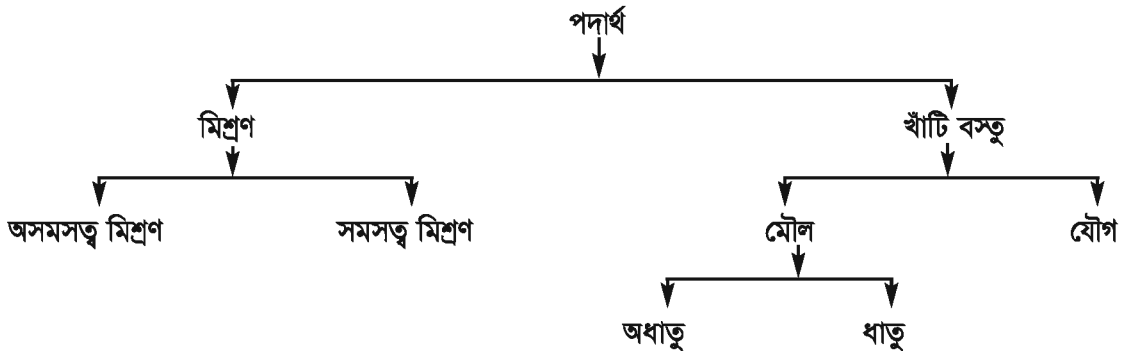
প্রশ্ন ওঠে, একই পদার্থ তিন অবস্থায় থাকে কেন? এবং তাপমাত্রার ওপরে এ অবস্থাসমূহ নির্ভরশীল কেন? যে কোনো বস্তু অতি ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত, তাদেরকে সে বস্তুর অণু বলা হয়। অণুসমূহ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। যেমন, বরফ বা পানিতে অণুগুলো পরস্পরকে আকর্ষণ করে বলেই এরা একত্রে থাকে। এ আকর্ষণ শক্তিকে আন্তঃআণবিক শক্তি বলা হয়। আকর্ষণের পরিমাণ বস্তুর প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে।

আন্তঃআণবিক শক্তির কারণে অণুসমূহ পরস্পরের সন্নিহিত থাকতে চায়। অপরদিকে অণুসমূহ সর্বদা কম্পমান থাকে। তাপমাত্রা যত বাড়ে, কম্পনও তত বাড়ে। তাপশক্তির কারণে তাদের মধ্যে গতির সঞ্চার হয়। যার ফলে অণুসমূহ পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। আন্তঃআণবিক শক্তির তুলনায় অণুসমূহের গতিশক্তি অনেক কম হলে অণুসমূহ নির্দিষ্ট অবস্থানে বিরাজ করে। তখন কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে কম্পন শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছে যে অণুসমূহ আর নির্দিষ্ট স্থানে বিরাজ করে না। চলাচল করে। তখন তরল অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাপমাত্রা আরো বাড়ালে অণুসমূহের গতিশক্তি এত বৃদ্ধি পায় যে তারা পরস্পর হতে অনেক দূরে সরে যায় এবং প্রায় মুক্তভাবে চলাচল করে। তখন গ্যাসীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়।

একটি বিষয় তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে বস্তুর অণুসমূহের মধ্যে বেশ আকর্ষণ বিদ্যমান। তাদেরকে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন করতে অনেক তাপ দিতে হবে। অর্থাৎ বস্তুর আন্তঃআণবিক শক্তি বেশি হলে তার গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক খুব বেশি হয়। যেমন, সাধারণ লবণের গলনাঙ্ক 801°C ও স্ফুটনাঙ্ক 1465°C । অপরদিকে বস্তুর আন্তঃআণবিক শক্তি খুব কম হলে নিম্ন তাপমাত্রাতেই তার অণুসমূহ পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। যেমন, হাইড্রোজেনের আন্তঃআণবিক শক্তি খুবই কম, তাই সাধারণ তাপমাত্রায় এটি গ্যাস। পানির অণুসমূহের মধ্যকার আন্তঃআণবিক শক্তি সাধারণ লবণের ন্যায় অত্যধিক বেশি না হলেও মোটামুটি বেশি। পানির স্ফুটনাঙ্ক 100°C এবং গলনাঙ্ক 0°C ।

১.৫ পদার্থের শ্রেণীবিভাগ (Classification of matter)

উপাদান এবং সংযুতি (composition) অনুসারে পদার্থসমূহের নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে :



মিশ্রণ : দুই বা ততোধিক পদার্থকে যে কোনো অনুপাতে একত্রে মিশালে যদি তারা নিজ নিজ ধর্ম বজায় রেখে পাশাপাশি অবস্থান করে, তবে উক্ত সমাবেশকে মিশ্রণ বলা হয়। মিশ্রণ দুই প্রকারের হতে পারে। যেমন, অসমসত্ত্ব মিশ্রণ ও সমসত্ত্ব মিশ্রণ।

অসমসত্ত্ব মিশ্রণ : যে মিশ্রণের বিভিন্ন অংশে তার উপাদানসমূহ বিভিন্ন অনুপাতে থাকে, তাদের পৃথক অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় এবং যার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ধর্ম প্রদর্শন করে, তাকে অসমসত্ত্ব মিশ্রণ বলা হয়। যেমন, বালি ও চিনির মিশ্রণ একটি অসমসত্ত্ব মিশ্রণ। এ মিশ্রণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, কোনো অংশে বালির পরিমাণ বেশি, অন্যত্র কম। এছাড়া খালি চোখে অথবা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে বালি ও চিনির দানা পৃথকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। পানি যোগ করলে চিনি দ্রবীভূত হবে, বালি হবে না। অর্থাৎ দুইটি অংশ ভিন্ন ধর্ম প্রদর্শন করে।

সমসত্ত্ব মিশ্রণ : যে মিশ্রণের সকল অংশে তার উপাদানসমূহ একই অনুপাতে বিদ্যমান এবং যাতে একাধিক বস্তুর অস্তিত্ব সহজে বুঝা যায় না, তাকে সমসত্ত্ব মিশ্রণ বলা হয়। পানিতে চিনির দ্রবণ বা শরবত একটি সমসত্ত্ব মিশ্রণ। তার বিভিন্ন অংশে পানি ও চিনির অনুপাত একই। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও চিনির অস্তিত্ব পৃথকভাবে বুঝা যায় না। সাগরের পানি নানা প্রকার লবণের সমসত্ত্ব মিশ্রণ। রোদের তাপে পানি শুকিয়ে সাগর পাড়ের লবণ-খামারিরা লবণ সংগ্রহ করে। সাগরের কিছু পরিমাণ পরিষ্কার পানি ফুটিয়ে তুমিও পরীক্ষা করে দেখতে পার।

খাঁটি বস্তু (Pure substance) : নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় রাসায়নিক সংযুক্তি ও ধর্ম বিশিষ্ট পদার্থকে খাঁটি বস্তু বলা হয়। যেমন, বিশুদ্ধ সোনা, বিশুদ্ধ পানি প্রত্যেকটি খাঁটি বস্তু।

খাঁটি বস্তুকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; (১) মৌল বা মৌলিক পদার্থ এবং (২) যৌগ বা যৌগিক পদার্থ।

মৌল বা মৌলিক পদার্থ (Element) : যে বস্তুকে রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষণ করে অন্য কোনো সহজ বস্তুতে রূপান্তরিত করা যায় না, তাকে মৌল বা মৌলিক পদার্থ বলা হয়। সোনা, তামা, লোহা, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন প্রত্যেকে এক একটি মৌল। এদের যে কোনো একটিকে বিশ্লেষণ করে অন্য বস্তু পাওয়া যাবে না।

মৌলিক পদার্থকে গুণের ক্রমানুসারে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : ধাতু এবং অধাতু।

ধাতু (Metals) : চকচকে এবং তাপ ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী মৌলকে ধাতু বলা হয়। যেমন— তামা, লোহা, স্বর্ণ ইত্যাদি।

অধাতু (Non-metals) : প্রধানত তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী মৌলসমূহকে অধাতু বলে। যেমন— নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ক্লোরিন ইত্যাদি।

যৌগ বা যৌগিক পদার্থ (Compound) : যে বস্তুকে রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়, তাকে যৌগ বা যৌগিক পদার্থ বলা হয়। যেমন— হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এ দুইটি মৌল নির্দিষ্ট ভর অনুপাতে পরস্পর যুক্ত হয়ে পানি উৎপন্ন করে। অতএব, পানি একটি যৌগিক পদার্থ।

১.৬ পদার্থের পরিবর্তন (Changes in matter)

পদার্থের পরিবর্তন দুই ধরনের : ভৌত বা অবস্থানগত পরিবর্তন (physical change) এবং রাসায়নিক পরিবর্তন (chemical change)।

(ক) ভৌত বা অবস্থানগত পরিবর্তন : যে পরিবর্তনের ফলে পদার্থের শুধু বাহ্যিক আকার বা অবস্থার পরিবর্তন হয় কিন্তু তা কোনো নতুন পদার্থে পরিণত হয় না, তাকে ভৌত বা অবস্থানগত পরিবর্তন বলা হয়।

উদাহরণ : ১। পানিকে ঠাণ্ডা করলে তা বরফে এবং তাপ দিলে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। আবার বরফকে তাপ দিলে বা বাষ্পকে শীতল করলে পানি পাওয়া যায়। বরফ, পানি ও জলীয় বাষ্প একই পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। সুতরাং পানি হতে বরফ বা জলীয় বাষ্প তৈরি হওয়া বা তার বিপরীত ঘটনা ভৌত পরিবর্তন।

২। চিনির দানাকে গুঁড়া করলে বড় দানা হতে ক্ষুদ্র দানার সৃষ্টি হয়। কিন্তু চিনি হতে অন্য পদার্থ উৎপন্ন হয় না। মুখে

দিলে দেখা যায় যে, টুকরা ছোট কী বড় উভয় প্রকার টুকরাই সমান মিষ্টি। সুতরাং বড় দানাকে গুঁড়া করে ছোট দানা তৈরি করা একটি ভৌত পরিবর্তন।

৩। একটি লোহার টুকরাকে চুম্বক দ্বারা ঘর্ষণ করলে তা চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ সময় লোহা হতে অন্য কোনো পদার্থের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং এ পরিবর্তনও একটি ভৌত পরিবর্তন। চুম্বকত্ব প্রাপ্ত লোহার টুকরাকে উত্তপ্ত করলে তা চুম্বকত্ব হারিয়ে সাধারণ লোহায় রূপান্তরিত হয়।

(খ) রাসায়নিক পরিবর্তন : যে পরিবর্তনের ফলে এক বা একাধিক বস্তু প্রত্যেকে তার নিজস্ব সত্তা হারিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম বিশিষ্ট এক বা একাধিক বস্তুতে পরিণত হয়, তাকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলা হয়। অন্য কথায়, যে পরিবর্তনে বস্তুর রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন হয়, তাকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলা হয়।

উদাহরণ : ১। এক টুকরা লোহাকে বহুদিন আর্দ্র বাতাসে রেখে দিলে তার উপর বাতাসের অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের বিক্রিয়ায় পানিযুক্ত ফেরিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়, যা মরিচা নামে পরিচিত। মরিচার ধর্ম লোহা, অক্সিজেন ও পানি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন যৌগ উৎপন্ন হয়েছে। সুতরাং লোহার উপর মরিচা পড়া একটি রাসায়নিক পরিবর্তন।

২। একটি মোমবাতি জ্বালার সময় উত্তাপে মোমের কিছু অংশ গলে যায়। এটি ভৌত পরিবর্তন। কিন্তু অধিকাংশ মোম বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প তৈরি করে। শেষোক্ত দুইটি বস্তু মোম ও অক্সিজেন হতে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং মোমবাতির দহন একটি রাসায়নিক পরিবর্তন। প্রকৃতপক্ষে সকল দহন রাসায়নিক পরিবর্তন। উল্লেখ্য যে, বাতাসের অক্সিজেনের সাথে কোনো কিছুর বিক্রিয়াকে দহন বলে।

(গ) ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের পার্থক্য

ভৌত পরিবর্তন	রাসায়নিক পরিবর্তন
১। কোনো নতুন ধরনের বস্তু সৃষ্টি হয় না।	১। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক বা একাধিক বস্তু সৃষ্টি হয়।
২। বস্তুর ভৌত ধর্মের পরিবর্তন হয়।	২। বস্তুর ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন হয়।
৩। বস্তুর অণুর গঠনের পরিবর্তন হয় না।	৩। বস্তুর অণুর গঠনের পরিবর্তন হয়ে সম্পূর্ণ নতুন অণুর সৃষ্টি হয়।
৪। বস্তুর রাসায়নিক সংযুতির পরিবর্তন হয় না।	৪। রাসায়নিক সংযুতির পরিবর্তন হয়।
৫। এ পরিবর্তন অস্থায়ী। সাধারণ পরিবর্তনের কারণ (যেমন, তাপ ও চাপ) সরিয়ে নিলে বস্তু পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে।	৫। এ পরিবর্তন স্থায়ী। বস্তুকে পূর্বের অবস্থায় সহজে ফিরিয়ে আনা যায় না।
৬। তাপশক্তির শোষণ বা উদগিরণ ঘটতে পারে, নাও ঘটতে পারে।	৬। তাপশক্তির শোষণ বা উদগিরণ অবশ্যই ঘটবে।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

পদার্থ : যার ভর আছে, যা কোনো স্থান দখল করে অবস্থান করে এবং যা তার স্থিতিশীল বা গতিশীল অবস্থার পরিবর্তনে বাধা প্রদান করে, তাকে পদার্থ বলা হয়।

ভর : কোনো বস্তুর পরিমাণকে তার ভর বলা হয়।

পদার্থের অবস্থাভেদ : পদার্থ তিন অবস্থায় থাকতে পারে : (ক) কঠিন, (খ) তরল এবং (গ) গ্যাসীয়। (ক) কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন, নির্দিষ্ট আকার ও কমবেশি দৃঢ়তা আছে। (খ) তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন আছে, কিন্তু নির্দিষ্ট আকার নেই। যখন যে পাত্রে রাখা হয়, সে পাত্রের আকার ধারণ করে। (গ) গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকার বা আয়তন নেই, যখন যে পাত্রে রাখা হয় সে পাত্রের আকার ও আয়তন ধারণ করে।

পদার্থের রূপান্তর : সাধারণত কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে তা তরল পদার্থে পরিণত হয় এবং তরল পদার্থকে আরো তাপ দিলে তা গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। শীতল করলে গ্যাস তরলে এবং আরো শীতল করলে তরল পদার্থ কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

আন্তঃআণবিক শক্তি : যে কোনো বস্তু অণু নামক অতি ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। অণুসমূহের মধ্যকার আকর্ষণকে আন্তঃআণবিক শক্তি বলা হয়।

মিশ্রণ : দুই বা ততোধিক পদার্থকে যে কোনো অনুপাতে একত্রে মিশালে যদি তারা নিজ নিজ ধর্ম বজায় রেখে পাশাপাশি অবস্থান করে, তবে উক্ত সমাবেশকে মিশ্রণ বলা হয়।

অসমসত্ত্ব মিশ্রণ : যে মিশ্রণের বিভিন্ন অংশে তার উপাদানসমূহ বিভিন্ন অনুপাতে থাকে, তাদের পৃথক অস্তিত্ব দেখা যায় এবং যার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ধর্ম প্রদর্শন করে, তাকে অসমসত্ত্ব মিশ্রণ বলা হয়।

সমসত্ত্ব মিশ্রণ : যে মিশ্রণের সকল অংশে তার উপাদানসমূহ একই অনুপাতে বিদ্যমান এবং যাতে একাধিক বস্তুর অস্তিত্ব অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও বুঝা যায় না; অর্থাৎ সর্বত্র একই ধর্ম প্রকাশ পায়, তাকে সমসত্ত্ব মিশ্রণ বলা হয়।

খাঁটি বস্তু : নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় রাসায়নিক সংযুতি ও ধর্মবিশিষ্ট পদার্থকে খাঁটি বস্তু বলা হয়।

মৌল বা মৌলিক পদার্থ : যে বস্তুকে রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষণ করে অন্য কোনো সহজ বস্তুতে রূপান্তিত করা যায় না, তাকে মৌল বা মৌলিক পদার্থ বলা হয়।

যৌগ বা যৌগিক পদার্থ : যে বস্তুকে রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়, তাকে যৌগ বা যৌগিক পদার্থ বলা হয়।

পদার্থের পরিবর্তন দুই ধরনের : (১) ভৌত পরিবর্তন ও (২) রাসায়নিক পরিবর্তন।

ভৌত পরিবর্তন : যে পরিবর্তনের ফলে পদার্থের শুধু বাহ্যিক আকার বা অবস্থার পরিবর্তন হয়, কিন্তু তা অন্য কোনো পদার্থে পরিণত হয় না, তাকে ভৌত বা অবস্থানগত পরিবর্তন বলা হয়।

রাসায়নিক পরিবর্তন : যে পরিবর্তনের ফলে এক বা একাধিক বস্তু স্বীয় সত্তা হারিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধর্মবিশিষ্ট অন্য এক বা একাধিক বস্তুতে পরিণত হয়, তাকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলা হয়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোন পদার্থটির আন্তঃআণবিক শক্তি সবচেয়ে কম?

- ক. পাথর খ. পেট্রল
গ. লোহা ঘ. কার্বন ডাইঅক্সাইড।

২। নবম শ্রেণীর একজন ছাত্র -

- i. এক টুকরা লোহাকে এক সপ্তাহ আর্দ্র বাতাসে রেখে দিল
- ii. একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে এর পরিবর্তন লক্ষ করল
- iii. পানির সাথে দধি, চিনি মিশিয়ে আইসক্রিম তৈরি করল।

কোন ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরিবর্তন হল?

- [illegible]

৩। পরীক্ষাগারে শিক্ষার্থীরা তিনটি যৌগ পরীক্ষা করে নিম্নের উপাত্ত পেল

- গলনাঙ্ক 801°C , স্ফুটনাঙ্ক 1465°C
- গলনাঙ্ক 0°C , স্ফুটনাঙ্ক 100°C
- গলনাঙ্ক 183°C , স্ফুটনাঙ্ক 162°C

গ্যাসীয় যৌগের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?

- ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. ii এবং iii

৪। কঠিন পদার্থ $\xrightleftharpoons[\text{শীতল}]{\text{তাপ}}$ তরল $\xrightleftharpoons[\text{শীতল}]{\text{তাপ}}$ গ্যাস

নিচের কোন পদার্থটি উপরের প্রক্রিয়াটির ব্যতিক্রম-

- | | |
|------------|-------------|
| ক. সালফার | খ. অক্সিজেন |
| গ. আয়োডিন | ঘ. তুঁতে |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

পদার্থের অবস্থা ও পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একজন বিজ্ঞান শিক্ষক নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলের জানালার খিলে এক ধরনের বাদামি বর্ণের আস্তরণ পড়ার দৃশ্য দেখালেন। তারপর তিনি একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে তাদেরকে এর পরিবর্তন লক্ষ করার জন্য বললেন। শিক্ষার্থীরা দেখল মোমবাতিটি পুড়ে ধীরে ধীরে আকারে ছোট হয়ে যাচ্ছে। উপরে বর্ণিত ঘটনা ব্যবহার করে, তিনি পদার্থের তিনটি ভৌত অবস্থার পরিবর্তন ছাত্রদের উদ্দেশে বর্ণনা করলেন।

- ক. জানালার খিলে পড়া বাদামি আস্তরণের নাম কী?
- খ. জানালার খিলে পড়া বাদামি আস্তরণ কী ধরনের পরিবর্তন— ব্যাখ্যা কর?
- গ. বাদামি আস্তরণ পড়া থেকে জানালার খিলকে কীভাবে মুক্ত রাখা যায় বর্ণনা কর।
- ঘ. ‘মোমবাতিটির দহনে ভৌত ও রাসায়নিক উভয় ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে’— বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পদার্থের গঠন

বিষয়বস্তু : পরমাণু ও অণু কী? পারমাণবিক ভর ও আণবিক ভর। গ্রাম পারমাণবিক ভর ও মোল। পরমাণুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ডাল্টনের পরমাণুবাদের স্বীকার্যসমূহ।

রাসায়নিক সংযোগ সূত্রসমূহ : ভরের অবিনাশিতাবাদ সূত্র, স্থিরানুপাত সূত্র, গুণানুপাত সূত্র, বিপরীত অনুপাত সূত্র ও গ্যাস আয়তন সূত্র।

বস্তুকণার বিন্যাস ও গতি : বস্তুকণার বিন্যাস, অণু-পরমাণুর গতিতত্ত্ব, গ্যাস ও তরলের ব্যাপন ক্রিয়া ও ব্রাউনের গতিতত্ত্ব।

২.১ ডাল্টনের পরমাণুবাদ (Dalton's Atomic Theory)

সকল পদার্থ ক্ষুদ্রতম কণা দ্বারা গঠিত, এ মতবাদ বহু পুরাতন। গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস (Democritus) খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দিতে এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, সকল পার্থিব পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণা দ্বারা গঠিত। ডেমোক্রিটাস এ অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম কণার নাম দেন atomos। এ শব্দটি দুইটি গ্রিক শব্দ হতে উদ্ভূত : a (অর্থাৎ না) এবং tomos (অর্থাৎ ভাগ করা); তাই atomos শব্দের অর্থ যা আর ভাগ করা যায় না। কিন্তু বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle)-এর প্রভাবে এ মতবাদ চাপা পড়ে যায়। অ্যারিস্টটলের মতে পদার্থ নিরবচ্ছিন্ন, তাকে যত ইচ্ছা ক্ষুদ্রতম অংশে ভাগ করা যায়। দীর্ঘ দিন পরে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দিতে পরমাণু মতবাদ আবার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের সমর্থন লাভ করে।

অবশেষে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ডাল্টন (John Dalton) ১৮০৩ সালে এ মতবাদকে বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আধুনিক রসায়নের ভিত্তি হচ্ছে এ পরমাণুবাদ; এ কারণে জন ডাল্টনকে আধুনিক রসায়নের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক।



চিত্র ২.১ : জন ডাল্টন

২.২ ডাল্টনের পরমাণুবাদের স্বীকার্যসমূহ (Postulates বা Assumptions)

- (১) প্রত্যেক পদার্থ পরমাণু নামক অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। ডাল্টন যৌগের ক্ষুদ্রতম কণিকার নাম দেন যৌগ পরমাণু (compound atom) এবং মৌলের ক্ষুদ্রতম কণিকার নাম দেন সরল পরমাণু (simple atom)।
- (২) একই পদার্থের সকল পরমাণুর ধর্ম ও ভর অভিন্ন।
- (৩) ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর ধর্ম ও ভর বিভিন্ন।
- (৪) পরমাণুসমূহ অবিভাজ্য, তাদের সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই।
- (৫) দুই বা ততোধিক পদার্থের পরমাণুর সংযোগে নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয়। এ সংযোগ পূর্ণ সংখ্যার নির্দিষ্ট সরল অনুপাতে হয়।
- (৬) পরমাণুসমূহ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
- (৭) রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে কোনো পরমাণু ধ্বংস বা কোনো নতুন পরমাণু সৃষ্টি হয় না, শুধু তাদের মধ্যকার সংযোগ প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে।

ডাল্টনের পরমাণুবাদের ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতাসমূহ (Limitations)

এ কথা অনস্বীকার্য যে ডাল্টনের পরমাণুবাদই আধুনিক রসায়নের ভিত্তি। তবে এ তত্ত্বে কিছু ত্রুটি আছে :

- (১) ডাল্টনের মতবাদে মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাসমূহের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখানো হয়নি। শুধুমাত্র মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে “সরল পরমাণু” এবং যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রে “যৌগিক পরমাণুর” কথা বলা হয়েছে।
- (২) ডাল্টনের মতে পরমাণু ক্ষুদ্রতম কণিকা এবং অবিভাজ্য। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় জানা যায় যে, পরমাণুও বিভাজ্য এবং সকল পরমাণু মূলত ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন দ্বারা গঠিত।
- (৩) ডাল্টনের মতে একই মৌলের পরমাণুসমূহ ভর ও ধর্মে অভিন্ন। কিন্তু বর্তমানে জানা গেছে যে একটি মৌলের বিভিন্ন ভরের পরমাণু আছে। তাদেরকে আইসোটোপ (Isotope) বলা হয়।

২.৩ পরমাণু ও অণু (Atoms and Molecules)

অণু শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র। পরম অর্থ অত্যন্ত। মৌলিক পদার্থের অত্যন্ত ক্ষুদ্রতম অংশ বুঝাতে পরমাণু শব্দ ব্যবহৃত হয়। পরমাণু খালি চোখে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও নয়।

ভিন্ন ভিন্ন মৌলের দুই বা ততোধিক পরমাণু বিভিন্ন অনুপাতে রাসায়নিকভাবে মিলিত হয়ে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে।

যেমন, পানি একটি যৌগিক পদার্থ। এটি তিনটি অবস্থায় বিরাজ করতে পারে। এক ফোঁটা পানি একটি উত্তপ্ত কড়াইয়ে ছেড়ে দিলে চটচট শব্দ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। পানি তার ক্ষুদ্রতম অংশ অর্থাৎ অণুতে বিভক্ত হয়েছে। পানির অণুর গুণ ও ধর্ম অপরিবর্তিত থেকে যায়, কারণ ঠান্ডা করলে অণুগুলো মিলে আবার পানি উৎপন্ন হয়।

যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ যা ঐ যৌগের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখে তাকে অণু বলা হয়। অধিকাংশ মৌলের পরমাণু খুব সক্রিয়। এরা যেমন ভিন্ন পরমাণুর সাথে বিক্রিয়া করে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে, তেমনি একই পরমাণুর সাথে মিলিত হয়ে মৌলিক পদার্থের অণু (molecules of elements) সৃষ্টি করে। হিলিয়াম (Helium), নিয়ন (Neon) প্রভৃতি গ্যাসের অণুতে অবশ্য একাধিক পরমাণু থাকে না।

অণু ও পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য

পরমাণু	অণু
১। মৌলিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য রক্ষাকারী ক্ষুদ্রতম কণা।	১। মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য রক্ষাকারী ক্ষুদ্রতম কণা।
২। পরমাণু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।	২। অণু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না।

২.৪ অণু, পরমাণু অস্তিত্বের পরীক্ষা সাক্ষ্য

২.৪.১ ব্যাপন (Diffusion) : কোনো মাধ্যমে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় বস্তুর স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous) এবং সমভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলা হয়।

(ক) একটি বন্ধ ঘরের এক কোণায় একটি সেন্টের শিশি খুলে রাখ। কিছুক্ষণ পর দেখবে ঘরের অন্যত্রও সে সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বাড়িতে পোলাও কোর্মা রান্না করলে তার সুগন্ধ সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একবার ভেবে দেখছ কি, এ সুগন্ধ একস্থান হতে আরেক স্থানে আসলো কীভাবে? প্রকৃতপক্ষে সুগন্ধযুক্ত বস্তুর অণুগুলো গ্যাসীয় অবস্থায় ক্রমে ক্রমে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তোমার নাকে প্রবেশ করলে তুমি সে সুগন্ধ অনুভব কর।

(খ) আরেকটি পরীক্ষা কর। এক গ্লাস পানি নাও। তাতে একটি দানা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ছেড়ে দাও। পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট তোমরা যে কোনো ওষুধের দোকানে পাবে; তার বর্ণ তীব্র বেগুনি। দেখবে ধীরে ধীরে ঐ দানার নিকটে পানির রং বেগুনি হচ্ছে। ক্রমশ সে রং সম্পূর্ণ পানিতে ছড়িয়ে পড়বে, যদিও তুমি পানি কোনরূপ নাড়াচাড়া করছো না।

(গ) আরেকটি পরীক্ষা কর। এক গ্লাস পানি নিয়ে তাতে এক চামচ চিনি ফেলে দাও। পানি নাড়াবে না। একটু পরে উপর থেকে একটু পানি মুখে দাও। দেখবে কোনো স্বাদ নেই। গ্লাসটি না নেড়ে এভাবে রেখে দাও। পরদিন দেখবে চিনি প্রায় সম্পূর্ণরূপে পানিতে দ্রবীভূত হয়েছে এবং উপরের এক ফোঁটা পানি মুখে দিলে দেখবে তা মিষ্টি।

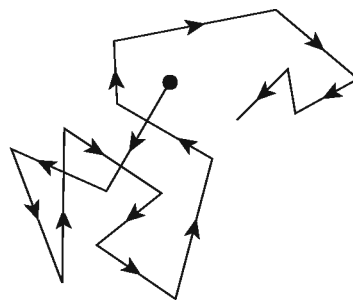
(ক) পরীক্ষাতে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়া এবং (খ) ও (গ) পরীক্ষাতে পানিতে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, চিনি সমস্ত দ্রবণে ছড়িয়ে পড়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে মনে করতে হবে যে বস্তুগুলো অতি ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। বাতাসে সুগন্ধের কণা এবং দ্রবণে উপরিউক্ত বস্তুর কণা ছড়িয়ে পড়েছে।

“কোনো মাধ্যমে কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় বস্তুর স্বতঃস্ফূর্ত (spontaneous) এবং সমভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে।”

যদি সুগন্ধি এবং চিনি ও পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দানা অতিক্ষুদ্র কণার সমষ্টি না হত তাহলে ব্যাপন (ছড়িয়ে পড়া) সম্ভব হত না। এ থেকে বুঝা যায় বস্তু নিশ্চয়ই অতি ক্ষুদ্র কণার সমন্বয়ে গঠিত, যার নাম দেয়া হয়েছে অণু বা পরমাণু। কণাগুলো যে সুযোগ পেলেই গতি সম্পন্ন হয় তাও এ থেকে বুঝা যায়। ব্রিটিশ উদ্ভিদবিদ রবার্ট ব্রাউনের (Robert Brown) একটি পরীক্ষাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

২.৪.২ ব্রাউনীয় গতি (Brownian Movement) : ১৮২৭ সালে ব্রিটিশ উদ্ভিদবিদ রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown) দেখেন যে পোলেন কণাকে (পরাগরেণু) পানিতে রেখে দিলে তা বিস্ফোরিত হয়ে অতি ক্ষুদ্র কণিকাসমূহের সৃষ্টি করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করে তিনি দেখতে পান যে কণিকাসমূহ অবিরাম ইতস্তত ভ্রমণশীল। কণার এরূপ ইতস্তত ভ্রমণকে ব্রাউনীয় গতি বলা হয়।

ব্রাউনীয় গতির ব্যাখ্যা : আণবিক গতিতত্ত্বের সাহায্যে সহজে ব্রাউনীয় গতির ব্যাখ্যা করা যায়। মনে করি পানিতে একটি ক্ষুদ্র ভাসমান কণা আছে। ঐ কণা বহু সংখ্যক অণু দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ অণুসমূহ সর্বদা বিভিন্ন দিকে ধাবমান। ফলে কিছু সংখ্যক অণু যে কোনো সময় ভাসমান কণাটিকে ধাক্কা দেয়। এ ধাক্কা বিভিন্ন দিক হতে আসে, কিন্তু সব দিকের ধাক্কা সমান না হওয়ায় কণিকা একদিকে ধাবিত হয়।



চিত্র ২.২ : ব্রাউনীয় গতি

তোমরা অনেক সময় কানামাছি ‘ভৌঁভৌঁ’ নামে একটি খেলা কর। একজন সহপাঠীর চোখ বেঁধে ছেড়ে দাও এবং একেক জন একেক দিক হতে ধাক্কা মার, ফলে সে একেক বার একেক দিকে ছিটকে পড়ে। কণাটির অবস্থা ঠিক সে রকম। কণাটির আকার যত বাড়ে সকল দিক হতে ধাক্কার পরিমাণ তত বাড়ে, ফলে একটি দিকে অসমান ধাক্কার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। এ অবস্থায় ব্রাউনীয় গতি প্রায় শূন্য হয়।

২.৫ পারমাণবিক ভর ও আণবিক ভর (Atomic mass and molecular mass)

পরমাণু এবং অণু অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাদের ভরও অত্যন্ত কম। অতি শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপে যেমন তাদের দেখা যায় না তেমনই সবচেয়ে সূক্ষ্ম নিক্তিতেও তাদের ভর মাপা যায় না। বিজ্ঞানীগণ ভর বর্ণালীবীক্ষণ পদ্ধতিতে (mass spectrophotometric method) অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এসব ভর নির্ণয় করে থাকেন।

সবচেয়ে হালকা মৌল হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ভর $1.67 \times 10^{-24}g$ । প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সবচেয়ে ভারী মৌল ইউরেনিয়ামের একটি পরমাণুর ভর $3.95 \times 10^{-22}g$ । পানির একটি অণুর ভর হচ্ছে $2.99 \times 10^{-23}g$ ।

অণু বা পরমাণুসমূহের এত ক্ষুদ্র ভর মনে রাখা এবং বিভিন্ন হিসাবে ব্যবহার করা অসুবিধাজনক। তাই বিজ্ঞানীরা অণু ও পরমাণুর আপেক্ষিক বা তুলনামূলক ভর ব্যবহার করে থাকেন।

পারমাণবিক ভর ধারণার প্রবর্তক জন ডাল্টন ১৮০৩ সালে হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ভরকে পারমাণবিক ভরের প্রমাণ (standard) হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানে সকল বিজ্ঞানী কার্বন-12 আইসোটোপের ভরের $\frac{1}{12}$ অংশকে পারমাণবিক ভরের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আধুনিক সংজ্ঞানুসারে—

$$\text{মৌলের একটি পরমাণুর ভর} = \frac{\text{মৌলের পারমাণবিক ভর}}{\text{একটি কার্বন-12 পরমাণুর ভরের } \frac{1}{12} \text{ অংশ}}$$

$$\text{যেমন, অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর} = \frac{\text{অক্সিজেনের একটি পরমাণুর ভর}}{\text{একটি কার্বন-12 পরমাণুর ভরের } \frac{1}{12} \text{ অংশ}} = 16$$

একইভাবে আণবিক ভরও সংজ্ঞায়িত করা হয় :

$$\text{আণবিক ভর} = \frac{\text{বস্তুর একটি অণুর ভর}}{\text{একটি কার্বন-12 পরমাণুর ভরের } \frac{1}{12} \text{ অংশ}}$$

$$\text{যেমন, পানির আণবিক ভর} = \frac{\text{পানির একটি অণুর ভর}}{\text{একটি কার্বন-12 পরমাণুর ভরের } \frac{1}{12} \text{ অংশ}} = 18$$

পারমাণবিক ভর ও আণবিক ভর উভয়ই হচ্ছে দুইটি ভরের অনুপাত। এগুলো সরল সংখ্যা। এগুলোর একক নেই। আরো উল্লেখ্য যে পারমাণবিক ভর ও আণবিক ভরকে পূর্বে যথাক্রমে পারমাণবিক ওজন (atomic weight) এবং আণবিক ওজন (molecular weight) বলা হত। ঐতিহাসিক কারণে এখনো মাঝে মাঝে এ দুইটি পদ ব্যবহার করা হয়। আণবিক ভরকে সংকেত ভরও (formula mass) বলা হয়। বিশেষত আয়নিক যৌগের ক্ষেত্রে পদটি অধিকতর সঠিক। রসায়নের বিভিন্ন গণনায় পারমাণবিক ভরসমূহের প্রয়োজন হয়। মৌলসমূহের পারমাণবিক ভর সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

২.৬ আণবিক ভরের গণনা

ভর বর্ণালীবীক্ষণ পদ্ধতিতে অনেক অণুর আণবিক ভর নির্ণয় করা যায়। আবার কোনো অণুতে বিদ্যমান পরমাণুসমূহের পারমাণবিক ভরের যোগফল দ্বারা ঐ অণুর আণবিক ভর গণনা করা হয়।

সুতরাং কোনো বস্তুর একটি অণুতে বিদ্যমান মৌলগুলোর পারমাণবিক ভরকে যথাক্রমে সে অণুতে বিদ্যমান মৌলগুলোর পরমাণুর সংখ্যা দ্বারা গুণ করে গুণফলসমূহকে যোগ করে যে ফল পাওয়া যায় তা হচ্ছে সে বস্তুর আণবিক ভর।

উদাহরণস্বরূপ পানির সংকেত^১ H_2O । পানির একটি অণুতে ২টি হাইড্রোজেন ও ১টি অক্সিজেন পরমাণু বিদ্যমান।

$$\therefore \text{পানির আণবিক ভর} = (\text{হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর} \times 2) + (\text{অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর} \times 1) = 1 \times 2 + 16.00 \times 1 = 18$$

একইভাবে সালফিউরিক এসিড H_2SO_4 -এর আণবিক ভর = (হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর $\times 2$) + (সালফারের পারমাণবিক ভর $\times 1$) + (অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর $\times 4$)

$$= 1 \times 2 + 32 \times 1 + 16 \times 4 = 98.$$

২.৭ গ্রাম পারমাণবিক ভর, গ্রাম আণবিক ভর ও মোল (Gram atomic mass, gram molecular mass and mole)

যে কোনো মৌলের পারমাণবিক ভরকে গ্রামে প্রকাশ করলে যে পরিমাণ পাওয়া যায়, সে পরিমাণ মৌলকে উক্ত মৌলের এক গ্রাম পারমাণবিক ভর বা এক মোল পরমাণু (mole সংক্ষেপে mol) বলা হয়। যেমন 1.0 g হাইড্রোজেন = 1 গ্রাম পারমাণবিক ভর হাইড্রোজেন = 1 মোল পরমাণু হাইড্রোজেন

16.0 g অক্সিজেন = 1 গ্রাম পারমাণবিক ভর অক্সিজেন = 1 মোল পরমাণু অক্সিজেন।

একইভাবে কোনো বস্তুর আণবিক ভরকে গ্রামে প্রকাশ করলে যে পরিমাণ পাওয়া যায়, সে পরিমাণ বস্তুকে গ্রাম আণবিক ভর বা এক মোল অণু বলা হয়, যেমন –

18.0 g পানি = 1 গ্রাম আণবিক ভর = 1 মোল অণু পানি।

32.0 g অক্সিজেন = 1 গ্রাম আণবিক ভর অক্সিজেন = 1 মোল অণু অক্সিজেন।

অনেক পরীক্ষার ফলে বিজ্ঞানীগণ দেখেছেন যে এক মোল বস্তুতে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কণা আছে। এ সংখ্যাটির নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাভোগেড্রো সংখ্যা (Avogadro Number)। অ্যাভোগেড্রো সংখ্যার মান 6.02×10^{23} । এক মোল

১. অণু ও পরমাণুর সংকেত সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পানিতে 6.02×10^{23} সংখ্যক পানির অণু আছে। এক মোল পরমাণু অক্সিজেনে তেমনিভাবে 6.02×10^{23} সংখ্যক অক্সিজেন পরমাণু আছে। এ সংখ্যার ভিত্তিতে বলা যায়, যে পরিমাণ বস্তুতে ঐ বস্তুর 6.02×10^{23} সংখ্যক কণা আছে তাই এক মোলের সমান। কণাটি অণু, পরমাণু, আয়ন (ion) বা ইলেকট্রন (electron) যে কোনোটি হতে পারে।

২.৮ পারমাণবিক ভর ও একটি পরমাণুর ভর

পারমাণবিক ভর হচ্ছে একটি সরল রাশি যা একটি পরমাণু, একটি কার্বন-12 পরমাণু ভরের $\frac{1}{12}$ অংশের তুলনায় কতগুণ ভারী তা প্রকাশ করে। এর কোনো একক নেই। অপরদিকে একটি পরমাণুর ভর উল্লেখ করতে এককের প্রয়োজন হয়। ভরের প্রচলিত একক হচ্ছে গ্রাম (g) বা কিলোগ্রাম (kg)।

কোনো মৌলের একটি পরমাণুর ভর আমরা নিম্নরূপে গণনা করতে পারি।

$$\text{মৌলের একটি পরমাণুর ভর} = \frac{\text{মৌলের গ্রাম পারমাণবিক ভর}}{\text{অ্যাভোগেড্রো সংখ্যা}}$$

যেমন- হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর = 1.0

হাইড্রোজেনের গ্রাম পারমাণবিক ভর = 1.0g

$$\text{অতএব, হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ভর} = \frac{1.0\text{g}}{6.02 \times 10^{23}} = 1.67 \times 10^{-24}\text{g}.$$

একইভাবে একটি অণুর ভর গণনা করতে গ্রাম আণবিক ভর ব্যবহার করা হয়।

যেমন- H_2SO_4 এর আণবিক ভর = 98.0

H_2SO_4 এর গ্রাম আণবিক ভর = 98.0g

$$\therefore \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ এর একটি অণুর ভর : } \frac{98.0\text{g}}{6.02 \times 10^{23}} = 1.63 \times 10^{-22}\text{g}$$

২.৯ রাসায়নিক সংযোগ সূত্রসমূহ (Laws of chemical combinations)

দুই বা ততোধিক মৌল রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। কিন্তু এ সংযোগ যথেষ্টভাবে ঘটতে পারে না, অর্থাৎ একটি মৌলের যে কোনো পরিমাণ অন্য মৌলের যে কোনো পরিমাণের সাথে যুক্ত হয় না। বরঞ্চ একটি মৌলের একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অন্য মৌলের অন্য সুনির্দিষ্ট পরিমাণের সাথে যুক্ত হয়ে একটি নির্দিষ্ট যৌগ গঠন করে।

বিভিন্ন বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রমাণিত হয়েছে যে, মৌলসমূহের পারমাণবিক সংযোগ কতকগুলো নিয়ম বা সূত্র মেনে চলে। এ নিয়মগুলোকে রাসায়নিক সংযোগ সূত্র বলা হয়। নিম্নোক্ত পাঁচটি সূত্র বিদ্যমান, যেগুলোর প্রথম চারটি সূত্র ভর অনুপাতে মৌলের সংযোগের নিয়ম প্রকাশ করে এবং পঞ্চম সূত্রটি গ্যাসের ক্ষেত্রে আয়তন অনুপাত সংযোগের নিয়ম প্রকাশ করে।

- (১) ভরের নিত্যতা সূত্র (The law of conservation of mass)
- (২) স্থিরানুপাত সূত্র (The law of constant proportion)
- (৩) গুণানুপাত সূত্র (The law of multiple proportion)
- (৪) বিপরীত অনুপাত সূত্র (The law of reciprocal proportion)
- (৫) গ্যাস আয়তন সূত্র (The law of gaseous volume)

২.৯.১ ভরের বা পদার্থের নিত্যতা সূত্র

এ সূত্রটি পদার্থের অবিনাশিতাবাদ সূত্র (Law of indestructibility of matter) নামেও পরিচিত। ১৭৭৪ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে এ সূত্র আবিষ্কার করেন। এ সূত্রকে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করা যায় :

- (১) পদার্থকে সৃষ্টি করা যায় না বা ধ্বংসও করা যায় না, তাকে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করা যায় মাত্র।
- (২) যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থসমূহের মোট ভর, বিক্রিয়কগুলোর মোট ভরের সমান থাকে।
উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দুইটি বিক্রিয়ক A ও B এর ভর যথাক্রমে m ও n গ্রাম হয় এবং তাদের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে C, D, ও E এ তিনটি পদার্থ উৎপন্ন হয়, যাদের ভর যথাক্রমে x, y ও z তবে উপরিউক্ত সূত্রানুযায়ী বিক্রিয়ক পদার্থের ভর = উৎপন্ন পদার্থের ভর। অর্থাৎ $m + n = x + y + z$

ভরের নিত্যতা সূত্রের পরীক্ষামূলক প্রমাণ

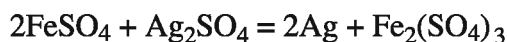
ভরের নিত্যতা সূত্রের পক্ষে অনেক পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ আছে। তন্মধ্যে ল্যানডোল্ট (Landolt)-এর পরীক্ষার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :

বিজ্ঞানী ল্যানডোল্ট তাঁর পরীক্ষার জন্য একটি H আকৃতির কাচের নল ব্যবহার করেন (চিত্র ২.৩)। বাহুদ্বয়ের নিচের দিক বন্ধ এবং উপরের দুইটি মুখ খোলা। এ খোলা মুখ দিয়ে দুই অংশে দুই ধরনের দ্রবণ প্রবেশ করানো যায়। একটি পরীক্ষায় তিনি এক অংশে পরিমাণমতো ফেরাস সালফেট দ্রবণ এবং অন্য অংশে সিলভার সালফেট দ্রবণ প্রবেশ করিয়ে খোলা প্রান্তদ্বয় উত্তাপে গলিয়ে বন্ধ করে দেন, যেন পরবর্তীতে কোনো কিছু কাচের নলে প্রবেশ করতে বা সেখান হতে বের হতে না পারে। এ দুটো দ্রবণ যেন পরস্পরের সাথে মিশে না যায়, এমন সাবধানে তিনি একটি সূক্ষ্ম নিক্তিতে সমগ্র নলের ভর মাপেন।



চিত্র ২.৩ : ল্যানডোল্ট-এর পরীক্ষা

অতঃপর নলটিকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দ্রবণদ্বয়কে ভালোভাবে পরস্পরের সাথে মিশ্রিত করেন। এ সময় সিলভার সালফেট ও ফেরাস সালফেট বিক্রিয়া করে ফেরিক সালফেটের দ্রবণ এবং সিলভার ধাতুর অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করে।



বিক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর নলটিকে পূর্বের তাপমাত্রায় আনার জন্য অনেকক্ষণ রেখে তার ভর মাপা হয়। দেখা যায় যে, বিক্রিয়া হওয়া সত্ত্বেও ভরের কোনো ধরনের পরিবর্তন হয়নি।

ল্যানডোল্ট অন্যান্য বিভিন্ন বিক্রিয়ক নিয়েও একইভাবে পরীক্ষা করে দেখেন যে, সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিক্রিয়া সংগঠিত হলেও কোনো ক্ষেত্রে সামগ্রিক ভরের কোনরূপ হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটেনি। এভাবে ভরের নিত্যতা সূত্র প্রমাণিত হয়।

২.৯.২ স্থিরানুপাত সূত্র

এ সূত্রটিকে নির্দিষ্ট অনুপাত সূত্র বা নির্দিষ্ট সংযুতির সূত্রও বলা হয়। ফরাসি রসায়নবিদ প্রাউস (Joseph Louis Proust) ১৭৯৯ সালে সূত্রটি প্রকাশ করেন। এ সূত্রটি নিম্নরূপে বিবৃত করা যায় :

উৎস যাই হোক না কেন, একই যৌগে একই মৌলসমূহ তাদের ভরের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে যুক্ত থাকে।

যেমন— নদী, পুকুর, সমুদ্র ইত্যাদি থেকে অথবা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় আমরা পানি পেতে পারি। কিন্তু পানির উৎস যাই হোক না কেন, পানিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পানিতে কেবল হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন আছে এবং ৯.০ ভাগ ভরের পানিতে ১.০ ভাগ হাইড্রোজেন এবং ৮.০ ভাগ অক্সিজেন বিদ্যমান। অর্থাৎ বিশুদ্ধ পানিতে ভর অনুসারে সর্বদা ১১.১% হাইড্রোজেন ও ৮৮.৯% অক্সিজেন থাকে। যৌগে মৌলসমূহের অনুপাত স্থির থাকে বলে এ সূত্রকে স্থিরানুপাত সূত্র বলা হয়।

স্থিরানুপাত সূত্র সম্পর্কিত সরল গাণিতিক সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন প্রণালিতে প্রস্তুত তিনটি সিলভার ক্লোরাইডের বিশ্লেষণ হতে নিম্নলিখিত উপাত্ত পাওয়া গেল। দেখাও যে, উক্ত উপাত্ত স্থিরানুপাত সূত্রকে সমর্থন করে।

উৎপন্ন সিলভার ক্লোরাইডের ভর (গ্রাম)	সিলভারের ভর (গ্রাম)
১ম নমুনা : 72.135	54.325
২য় নমুনা : 92.777	69.867
৩য় নমুনা : 121.471	91.462

সমাধান

$$\begin{array}{lcl}
 \text{১ম নমুনা : AgCl এ ক্লোরিনের ভর} & = & (72.135 - 54.325)\text{g} \\
 \text{এখন, 17.810g ক্লোরিনের সংগে সংযুক্ত সিলভারের ভর} & = & 54.325\text{g} \\
 \text{বা, } 1 & \text{''} & \text{''} \\
 & = & \frac{54.325}{17.810\text{g}} \\
 & = & 3.05\text{g}
 \end{array}$$

সুতরাং ১ম নমুনায় ক্লোরিন ও সিলভারের ভরের অনুপাত = ১ : ৩

$$\begin{array}{lcl}
 \text{২য় নমুনা : AgCl এ ক্লোরিনের ভর} & = & (92.777 - 69.867)\text{g} \\
 \text{এখন, 22.910g ক্লোরিনের সংগে সংযুক্ত সিলভারের ভর} & = & 69.867\text{g} \\
 \text{বা, } 1 & \text{''} & \text{''} \\
 & = & \frac{69.867\text{g}}{22.91} \\
 & = & 3.05\text{g}
 \end{array}$$

সুতরাং ২য় নমুনায় ক্লোরিন ও সিলভারের ভরের অনুপাত = ১ : ৩

$$\begin{array}{lcl}
 \text{৩য় নমুনা : AgCl এ ক্লোরিনের ভর} & = & (121.471 - 91.462)\text{g} \\
 \text{এখন, 30.099g ক্লোরিনের সংগে সংযুক্ত সিলভারের ভর} & = & 91.462\text{g} \\
 \text{বা, } 1 & \text{''} & \text{''} \\
 & = & \frac{91.462\text{g}}{30.09} \\
 & = & 3.05\text{g}
 \end{array}$$

সুতরাং ৩য় নমুনায় ক্লোরিন ও সিলভারের ভরের অনুপাত = ১ : ৩

অতএব, উপরিউক্ত গণনায় দেখা যায় যে, প্রতিটি নমুনায় ক্লোরিন ও সিলভারের ভরের অনুপাত হল ১ : ৩ এবং এটি নির্দিষ্ট। সুতরাং প্রদত্ত উপাত্ত স্থিরানুপাত সূত্রকে সমর্থন করে।

২.৯.৩ গুণানুপাত সূত্র

১৮০৩ সালে জন ডাল্টন এ সূত্র প্রকাশ করেন। এটি নিম্নরূপে ব্যক্ত করা যায় :

যদি দুইটি মৌল পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একাধিক যৌগ উৎপন্ন করে তবে এসব যৌগের যে কোনো একটি মৌলের একটি নির্দিষ্ট ভরের সাথে অপর মৌলের যে বিভিন্ন ভরসমূহ গৃহকভাবে যুক্ত হয়, সেই ভরগুলো পরস্পরের সাথে একটি সরল অনুপাত বজায় রাখে।
যেমন 1 : 2, 2 : 3, 3 : 4, 3 : 5 প্রভৃতি।

যেমন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে দুইটি ভিন্ন যৌগ গঠন করে। এ যৌগ দুইটির নাম পানি এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড। প্রথম যৌগে 1g হাইড্রোজেনের সাথে 8g অক্সিজেন যুক্ত। দ্বিতীয় যৌগে 1g হাইড্রোজেনের সাথে 16 g অক্সিজেন যুক্ত। দুইটি যৌগে অক্সিজেনের পরিমাণের অনুপাত = 8 : 16 = 1 : 2, যা একটি সরল অনুপাত।

গাণিতিক উদাহরণ : A ও B দুইটি মৌল পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে চারটি ভিন্ন ভিন্ন যৌগ গঠন করে। তাদের মধ্যে B যথাক্রমে 25%, 14.28%, 10% ও 7.69% আছে। দেখাও যে তাদের সংযোগ গুণানুপাত সূত্রকে সমর্থন করে।

সমাধান : প্রথম যৌগ

$$B = 25\%; \therefore A = (100 - 25) = 75\%$$

25g B সংযুক্ত আছে 75g A এর সাথে

$$\therefore 1g B \text{ সংযুক্ত আছে } \frac{75}{25} = 3g A \text{ এর সাথে}$$

দ্বিতীয় যৌগে

$$B = 14.28\%; \therefore A = (100 - 14.28) = 85.72\%$$

14.28g B সংযুক্ত আছে 85.72g A এর সাথে

$$\therefore 1g B \text{ সংযুক্ত আছে } \frac{85.72}{14.28} = 6g A \text{ এর সাথে}$$

তৃতীয় যৌগে

$$B = 10\%; \therefore A = (100 - 10) = 90\%$$

10g B সংযুক্ত আছে 90g A এর সাথে

$$\therefore 1g B \text{ সংযুক্ত আছে } \frac{90}{10} = 9g A \text{ এর সাথে}$$

চতুর্থ যৌগে

$$B = 7.69\%; \therefore A = (100 - 7.69) = 92.31\%$$

7.69g B সংযুক্ত আছে 92.31g A এর সাথে

$$\therefore 1g B \text{ সংযুক্ত আছে } \frac{92.31}{7.69} = 12g A \text{ এর সাথে}$$

দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন যৌগে 1 গ্রাম B এর সাথে যথাক্রমে 3, 6, 9 ও 12 গ্রাম A সংযুক্ত আছে। A এর ভর সমূহের অনুপাত : 3 : 6 : 9 : 12 = 1 : 2 : 3 : 4, যা একটি সরল অনুপাত। সুতরাং প্রদত্ত উপাত্ত গুণানুপাত সূত্রকে সমর্থন করে।

২.৯.৪ বিপরীত অনুপাত সূত্র

১৭৯২ সালে রসায়নবিদ রিকটার (Richter) সর্বপ্রথম এটি প্রকাশ করেন। সূত্রটি নিম্নরূপ :

যে ভর অনুপাতে দুই বা ততোধিক মৌল অপর মৌলের নির্দিষ্ট ভরের সাথে পৃথকভাবে সংযুক্ত হয়, উহাদের নিজেদের মধ্যে সংযোগের ক্ষেত্রে এরা ঐ ভর বা এর সরল গুণিতক বা উপগুণিতক অনুপাতে যুক্ত হবে।

উদাহরণ : কার্বন ও অক্সিজেন এ দুইটি মৌল পৃথকভাবে হাইড্রোজেনের সাথে মিথেন (CH_4) এবং পানি (H_2O) উৎপন্ন করে। প্রথম যৌগে 1g হাইড্রোজেন 3g কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে। দ্বিতীয় যৌগে 1g হাইড্রোজেন 8g অক্সিজেনের সাথে যুক্ত থাকে। আবার কার্বন ও অক্সিজেন পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে দুইটি যৌগ কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) এবং কার্বন মনোঅক্সাইড (CO) তৈরি করে। বিপরীত অনুপাত সূত্র মতে এ দুটো যৌগে কার্বন ও অক্সিজেনের অনুপাত 3:8 বা তার সরল গুণিতক বা উপগুণিতক হবে।

প্রকৃতপক্ষে CO_2 এ 12g কার্বন 32g অক্সিজেনের সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ তাতে কার্বন ও অক্সিজেনের ভরের অনুপাত 12 : 32 বা 3 : 8

অপরদিকে CO এ 12g কার্বন 16g অক্সিজেনের সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ তাতে কার্বন ও অক্সিজেনের ভরের অনুপাত 12 : 16 বা 3 : 4; যা 3 : 8 অনুপাতের উপগুণিতক।

গাণিতিক উদাহরণ : কার্বন ডাইসালফাইডে 15.79% কার্বন, সালফার ডাইঅক্সাইডে 50% সালফার এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডে 27.27% কার্বন আছে। উল্লিখিত বিশ্লেষণ ডাটা কোন রাসায়নিক সংযোগ সূত্রকে সমর্থন করে?

সমাধান : কার্বন ডাইসালফাইডে

কার্বন 15.79%, \therefore সালফার = $(100 - 15.7) = 84.21\%$

84.21g সালফার যুক্ত হয় 15.79g কার্বনের সাথে

1g সালফার যুক্ত হয় = $\frac{15.79}{84.21} = 0.187\text{g}$ কার্বনের সাথে

সালফার ডাইঅক্সাইডে,

সালফার 50%, \therefore অক্সিজেন = $(100 - 50) = 50\%$

50g সালফার যুক্ত হয় 50g অক্সিজেনের সাথে

1g সালফার যুক্ত হয় = $\frac{50}{50} = 1\text{g}$ অক্সিজেনের সাথে

এ যৌগদ্বয়ে 1g সালফারের সাথে পৃথক পৃথকভাবে 0.187g কার্বন ও 1g অক্সিজেন যুক্ত হয়েছে। বিপরীত অনুপাত সূত্র অনুযায়ী কার্বন ও অক্সিজেনের যৌগে কার্বন ও অক্সিজেনের ভরের অনুপাত 0.187 : 1 অথবা তার সরল গুণিতক বা উপগুণিতক হতে হবে।

কার্বন ডাইঅক্সাইডে

কার্বন = 27.27% \therefore অক্সিজেন = $100 - 27.27 = 72.73\%$

সুতরাং এ যৌগে কার্বন ও অক্সিজেনের ভরের অনুপাত = $27.27 : 72.73 = 0.374 : 1$, যা পূর্বোক্ত অনুপাত 0.187 : 1 এর সরল গুণিতক। সুতরাং প্রদত্ত ডাটা বিপরীত অনুপাত সূত্রকে সমর্থন করে।

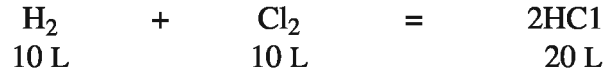
২.৯.৫ গ্যাস আয়তন সূত্র

১৮০৮ সালে ফরাসি রসায়নবিদ গে লুসাক এ সূত্রটি আবিষ্কার করেন। সূত্রটি শুধুমাত্র গ্যাসীয় অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কঠিন বা তরল অবস্থার ক্ষেত্রে নয়।

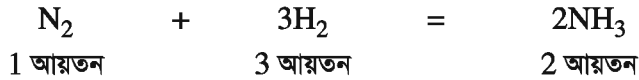
সূত্রটি নিম্নরূপ :

যখন বিভিন্ন গ্যাস পরস্পরের সাথে রাসায়নিকভাবে বিক্রিয়া করে তখন (১) তারা এমনভাবে বিক্রিয়া করবে যেন তাদের পরস্পরের আয়তনসমূহের মধ্যে সর্বদা একটি সরল অনুপাত থাকবে এবং (২) বিক্রিয়ার উৎপাদ যদি গ্যাসীয় হয়, তবে তার বা তাদের আয়তনের সাথে বিক্রিয়ক গ্যাসগুলোর আয়তনের মধ্যেও একটি সরল অনুপাত বিদ্যমান থাকবে। অবশ্য সকল গ্যাসের আয়তন একই চাপে এবং একই তাপমাত্রায় পরিমাপ করতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ 10 litre হাইড্রোজেন গ্যাসের সাথে 10 litre ক্লোরিন গ্যাস বিক্রিয়া করে 20 litre হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। এখানে বিক্রিয়ক গ্যাসসমূহ এবং উৎপাদ-এর আয়তনের অনুপাত হচ্ছে 1 : 1 : 2, যা একটি সরল অনুপাত।



একইভাবে এক আয়তন নাইট্রোজেন গ্যাস তিন আয়তন হাইড্রোজেন গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করে দুই আয়তন অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন করে।



এ ক্ষেত্রে, নাইট্রোজেনের আয়তন : হাইড্রোজেনের আয়তন : অ্যামোনিয়ার আয়তন = 1 : 3 : 2, যা একটি সরল অনুপাত।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

পরমাণু : মৌলের ক্ষুদ্রতম অংশকে পরমাণু বলে।

অণু : কোনো যৌগিক অথবা মৌলিক বস্তুর যে ক্ষুদ্রতম কণা ঐ বস্তুর ধর্মাবলি অক্ষুণ্ণ রেখে স্বাধীনভাবে বিরাজ করতে পারে, তাকে সে বস্তুর অণু বলা হয়।

মৌলিক পদার্থ : যে পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে শুধুমাত্র এক ধরনের মৌল পাওয়া যায়, তাকে মৌলিক পদার্থ বলে।

যৌগিক পদার্থ : যে পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন ধরনের মৌল পাওয়া যায়, তাকে যৌগিক পদার্থ বা যৌগ বলা হয়।

পারমাণবিক ভর : কোনো মৌলের একটি পরমাণুর ভর একটি কার্বন-12 পরমাণুর ভরের অংশের $\frac{1}{12}$ অংশের যতগুণ ভারী, সে সংখ্যাকে ঐ মৌলের পারমাণবিক ভর বলা হয়।

আণবিক ভর : কোনো পদার্থের একটি অণুর ভর একটি কার্বন-12 পরমাণুর ভরের $\frac{1}{12}$ অংশের যতগুণ ভারী, সে সংখ্যাকে সে পদার্থের আণবিক ভর বলা হয়।

গ্রাম পারমাণবিক ভর : কোনো মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ভরকে গ্রামে প্রকাশ করলে যে পরিমাণ পাওয়া যায় সে মৌলের ঐ পরিমাণকে এক গ্রাম পারমাণবিক ভর বা এক গ্রাম পরমাণু বলা হয়।

কোনো বস্তুর আণবিক ভরকে গ্রামে প্রকাশ করলে যে পরিমাণ পাওয়া যায়, সে বস্তুর সে পরিমাণকে 1 mole বলা হয়।

এক মৌল বস্তুতে অ্যাভোগেড্রো সংখ্যক কণা বিদ্যমান। অ্যাভোগেড্রো সংখ্যার মান 6.02×10^{23}

ডাল্টনের পরমাণুবাদ : ডাল্টনের পরমাণুবাদ আধুনিক রসায়নের ভিত্তি। এ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক পদার্থ গঠনে বিচ্ছিন্ন এবং পরমাণু নামক অতিক্ষুদ্র অসংখ্য কণার সমন্বয়ে গঠিত। পরমাণুসমূহকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না।

একই মৌলের পরমাণুসমূহ সকল বিষয়ে অভিন্ন। কিন্তু বিভিন্ন মৌলের সুনির্দিষ্ট পূর্ণসংখ্যক পরমাণুসমূহ পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন যৌগ উৎপন্ন করে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় কোনো পরমাণুর কোনরূপ পরিবর্তন হয় না, পরমাণুসমূহের মধ্যে সংযোগের পরিবর্তনের মাধ্যমে ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হয় মাত্র।

বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী দেখা যায় যে, ডাল্টনের পরমাণুবাদের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে।

রাসায়নিক সংযোগসূত্রসমূহ : দুই বা ততোধিক মৌলের রাসায়নিক সংযোগের ফলে বিভিন্ন যৌগ উৎপন্ন হয়। এ সংযোগের সময় বিভিন্ন নিয়ম বা সূত্র মান্য করা হয়। এ নিয়মসমূহকে রাসায়নিক সংযোগসূত্র বলা হয়। পাঁচটি সূত্র বিদ্যমান (১) ভরের নিত্যতা বা অবিনাশিতাবাদ সূত্র (২) স্থিরানুপাত সূত্র (৩) গুণানুপাত সূত্র (৪) বিপরীত অনুপাত সূত্র (৫) গ্যাস আয়তন সূত্র।

ভরের নিত্যতা বা অবিনাশিতাবাদ সূত্র : কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থসমূহের মোট ভর বিক্রিয়কসমূহের মোট ভরের সমান থাকে।

স্থিরানুপাত সূত্র : উৎস বা প্রস্তুত প্রণালি যাই হোক না কেন, একই যৌগে সর্বদা একই মৌলসমূহ একই নির্দিষ্ট ভর অনুপাতে যুক্ত থাকে।

গুণানুপাত সূত্র : যদি দুইটি মৌল পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে একাধিক যৌগ উৎপন্ন করে, তবে সেই যৌগসমূহের যে কোনো একটি মৌলের একই নির্দিষ্ট ভরের সাথে অপর মৌলটির যে বিভিন্ন ভর পৃথকভাবে সংযুক্ত হয়, সেই ভরগুলোর মধ্যে একটি সরল অনুপাত বিদ্যমান থাকে।

বিপরীত অনুপাত সূত্র : দুই বা ততোধিক মৌল অপর একটি মৌলের নির্দিষ্ট ভরের সাথে যে ভর অনুপাতে সংযুক্ত হয়, তারা পরস্পরের সাথে সে ভর অনুপাত অথবা তার সরল গুণিতক বা উপগুণিতকে সংযুক্ত হয়।

গ্যাস আয়তন সূত্র : যখন বিভিন্ন গ্যাস পরস্পরের সাথে রাসায়নিকভাবে বিক্রিয়া করে, তখন (১) তারা এমনভাবে বিক্রিয়া করবে যেন তাদের আয়তনসমূহের মধ্যে সর্বদা একটি সরল অনুপাত থাকবে, এবং (২) বিক্রিয়ার উৎপাদ যদি গ্যাসীয় হয়, তবে তাদের আয়তনের সাথে বিক্রিয়ক গ্যাসসমূহের আয়তনের মধ্যেও একটি সরল অনুপাত থাকবে। অবশ্য সকল গ্যাসের আয়তন একই চাপ ও তাপমাত্রায় পরিমাপ করতে হবে।

ব্যাপন : কোনো মাধ্যমে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় বস্তুর স্বতঃস্ফূর্ত এবং সমভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলা হয়।

ব্রাউনীয় গতি : কোনো মাধ্যমে অতি ক্ষুদ্র কণার ইতস্তত ভ্রমণকে ব্রাউনীয় গতি বলা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. বিভিন্ন যৌগে 1 গ্রাম X-এর সাথে যথাক্রমে 4, 6, 8 গ্রাম Y সংযুক্ত আছে।
এদন্ত উপাত্ত নিচের কোন সূত্রকে সমর্থন করে?

- ক. ভরের নিত্যতা সূত্র
খ. গুণানুপাত সূত্র
গ. বিপরীত অনুপাত সূত্র
ঘ. গ্যাস আয়তন সূত্র

২. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O}$

উপরের বিক্রিয়াটি সমর্থন করে-

- i. গুণানুপাত সূত্র
ii. বিপরীত অনুপাত সূত্র
iii. গ্যাস আয়তন সূত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচে চারটি মৌলের পারমাণবিক ভর দেওয়া হল :

মৌল	পারমাণবিক ভর
H	1
N	14
P	31
O	16

উপরের ছক ব্যবহার করে নিচের ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৩. অ্যামোনিয়াম ফসফেটের আণবিক ভর কত হবে?

- ক. 133
খ. 141
গ. 149
ঘ. 159

৪. ছকে এদন্ত নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত হাইড্রোজেনিক এসিডের বাষ্প ঘনত্ব-

- ক. 8.5
খ. 17
গ. 21.5
ঘ. 43

সৃজনশীল প্রশ্ন :

ইথেন, ইথিলিন এবং অ্যাসিটিলিন প্রত্যেকটি যৌগ দুইটি মৌলের সমন্বয়ে সৃষ্ট। এদের সমন্বয় একটি রাসায়নিক সংযোগ সূত্রকে সমর্থন করে। প্রদত্ত যৌগসমূহে কার্বনের শতকরা পরিমাণ নিচের ছকে দেওয়া হল :

যৌগের নাম	যৌগে কার্বনের পরিমাণ
ইথেন	20%
ইথিলিন	14.28%
অ্যাসিটিলিন	7.68%

- ক. রাসায়নিক সংযোগ সূত্র কী?
- খ. ছকে প্রদত্ত ইথেন যৌগে কার্বন (20%) ও হাইড্রোজেন (80%) এ উপাত্ত স্থির অনুপাত সূত্রকে সমর্থন করে-
ব্যাখ্যা কর।
- গ. ছকে প্রদত্ত উপাত্তগুলো কোন রাসায়নিক সংযোগ সূত্রকে সমর্থন করে তা প্রমাণ কর।
- ঘ. কার্বন ও অক্সিজেন যুক্ত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে, যাতে অক্সিজেনের পরিমাণ 72.73%, পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ 88.89% এবং কার্বন ও হাইড্রোজেনের একটি যৌগ মিথেনে কার্বনের পরিমাণ 75%। এ উপাত্তগুলো কি ছকে প্রদত্ত উপাত্ত সংশ্লিষ্ট সূত্রকে সমর্থন করে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

অ্যাভোগেড্রোর সূত্র

বিষয়বস্তু : অ্যাভোগেড্রোর সূত্র, এর প্রয়োগ, অ্যাভোগেড্রোর সূত্র হতে তিনটি অনুসিদ্ধান্ত : (১) অধিকাংশ মৌলিক গ্যাস দ্বিপরিমাণক; (২) যে কোনো গ্যাসের আণবিক ভর তার বাষ্প ঘনত্বের দ্বিগুণ, (৩) সকল গ্যাসের মোলার আয়তন, আদর্শ অবস্থায় 22.4 লিটার, মোলার আয়তন, অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যা।

৩.১ ভূমিকা

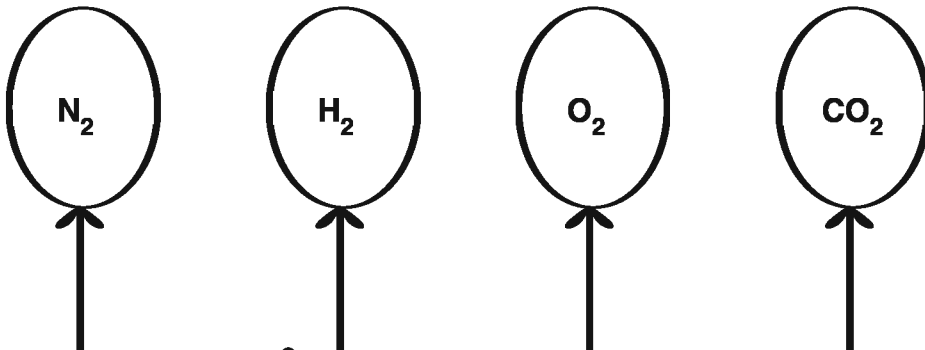
১৮০৩ সালে ডাল্টনের পরমাণুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর তার সাহায্যে রাসায়নিক সংযোগ সূত্রসমূহের প্রথম চারটি সূত্র ব্যাখ্যা করা হয়। গে লুস্যাকের (Joseph Louis Gay-Lussac) গ্যাস আয়তন সূত্রটি এ পরমাণুবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টায় ১৮১১ সালে বার্জেলিয়াস (Jons Jacob Berzelius) প্রস্তাব করেন যে, একই তাপমাত্রা এবং একই চাপে সম আয়তন বিশিষ্ট সকল গ্যাসে সমানসংখ্যক পরমাণু থাকে। কিন্তু দেখা যায় যে, তা পরমাণুবাদের মূল কথা অর্থাৎ, পরমাণুসমূহ যে অবিভাজ্য—তার বিরুদ্ধে যায়। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৮১১ সালে অ্যাভোগেড্রো (Amadeo Avogadro) সর্বপ্রথম অণুর ধারণা প্রবর্তন করেন এবং বস্তুর দুই ধরনের ক্ষুদ্রতম কণা, পরমাণু ও অণুর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন এবং ডাল্টনের পরমাণুবাদকে সংশোধন করেন। তিনিই অণু ও পরমাণুর বর্তমান সংজ্ঞা প্রদান করেন।

এভাবে অ্যাভোগেড্রো দুই প্রকার ক্ষুদ্রতম কণার ধারণাকে ভিত্তি করে বার্জেলিয়াসের ব্যাখ্যাকে সংশোধন করে অন্য একটি ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন, যা অ্যাভোগেড্রো প্রকল্প (Avogadro's hypothesis) নামে পরিচিত হয়। এ প্রকল্পটি বিভিন্ন পরীক্ষায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বর্তমানে তা অ্যাভোগেড্রো সূত্র নামে পরিচিত।

৩.২ অ্যাভোগেড্রোর সূত্র (Avogadro's Law)

বিবৃতি : একই তাপমাত্রায় এবং চাপে সম আয়তন বিশিষ্ট সকল গ্যাসে (মৌলিক ও যৌগিক) সমান সংখ্যক অণু থাকে।

মনে করি চারটি একই আয়তনের বেগুনে যথাক্রমে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ভর্তি করা হয়েছে। তাদের উপর একই চাপ বিদ্যমান এবং গ্যাসসমূহের তাপমাত্রাও একই। যদি কোনোভাবে প্রথম বেগুনে n সংখ্যক নাইট্রোজেন অণুর উপস্থিতি প্রমাণ করা যায় তবে সূত্র অনুসারে অন্যান্য বেগুনেও যথাক্রমে n সংখ্যক হাইড্রোজেন, n সংখ্যক অক্সিজেন এবং n সংখ্যক কার্বন ডাইঅক্সাইডের অণু থাকবে। যদিও গ্যাসসমূহের প্রকৃতি, ভর এবং আণবিক গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন।



চিত্র ৩.১ : অ্যাভোগেড্রোর সূত্রের ব্যাখ্যা

৩.৩ অ্যাভোগেড্রোর সূত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োগ

অ্যাভোগেড্রোর সূত্র রসায়নের উন্নতি সাধনে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে। নিম্নে এর গুরুত্ব ও প্রয়োগ সংক্ষেপে উল্লেখিত হল :

- (১) অ্যাভোগেড্রোর সূত্রের অবিস্মরণীয় অবদান হচ্ছে এই যে, তা সর্বপ্রথম ‘অণু’ ধারণার প্রবর্তন করে এবং অণু ও পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে।
- (২) ডাল্টনের পরমাণুবাদ তত্ত্বে ত্রুটি ছিল তার প্রধান অংশ এটি দূর করে।
- (৩) এটি ডাল্টনের পরমাণুবাদ ও গে লুসাকের গ্যাস আয়তন সূত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে।
- (৪) এ সূত্রের ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়া সঠিকরূপে উপলব্ধি করা এবং সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।
- (৫) এ সূত্রের সাহায্যে যে কোনো গ্যাসের আণবিক ভর বের করা সম্ভব হয়েছে।
- (৬) এর সাহায্যে কতিপয় মৌলের পারমাণবিক ভর বের করার একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- (৭) এছাড়া অ্যাভোগেড্রোর সূত্রের সাহায্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে।

এ অনুসিদ্ধান্তগুলো (Corollary) হচ্ছে

- (ক) নিষ্ক্লিয় গ্যাস ব্যতীত অন্যান্য মৌলিক গ্যাসের অণুসমূহ দ্বিপারমাণুক অর্থাৎ তাদের অণুতে দুইটি করে পরমাণু বিদ্যমান।
- (খ) যে কোনো গ্যাসের আণবিক ভর তার বাষ্প ঘনত্বের দ্বিগুণ।
- (গ) একই তাপমাত্রা ও চাপে সকল গ্যাসেরই মোলার আয়তন সমান এবং প্রমাণ চাপ ও তাপমাত্রায় তা 22.4 লিটার।

৩.৪ প্রথম অনুসিদ্ধান্তের প্রমাণ

অ্যাভোগেড্রোর সূত্র প্রাপ্ত প্রথম অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে : নিষ্ক্লিয় গ্যাসসমূহ ব্যতীত অন্যান্য মৌলিক গ্যাসের অণুসমূহ দ্বিপারমাণুক।

মৌলিক গ্যাসসমূহ হচ্ছে হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফ্লোরিন ও ক্লোরিন। আমরা এখানে উদাহরণস্বরূপ হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন গ্যাস যে দ্বিপারমাণুক তা প্রমাণ করব।

পরীক্ষায় দেখা যায় যে, একই তাপমাত্রা ও চাপে এক আয়তন হাইড্রোজেন ও এক আয়তন ক্লোরিন পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে দুই আয়তন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

অ্যাভোগেড্রোর সূত্র অনুসারে একই তাপমাত্রা ও চাপে এক আয়তন হাইড্রোজেন ও এক আয়তন ক্লোরিন পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে দুই আয়তন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

অ্যাভোগেড্রোর সূত্র অনুসারে একই তাপমাত্রা ও চাপে একই আয়তনে সকল গ্যাসেই অণুর সংখ্যা সমান। মনে করি এক আয়তন গ্যাসে n সংখ্যক অণু বিদ্যমান।

সুতরাং n সংখ্যক হাইড্রোজেন অণু + n সংখ্যক ক্লোরিন অণু = $2n$ সংখ্যক হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অণু।

বা 1টি হাইড্রোজেন অণু + 1টি ক্লোরিন অণু = 2টি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অণু।

যেহেতু হাইড্রোজেন ক্লোরাইড শুধু হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের যৌগ এবং যেহেতু ডাল্টনের মতে কোনো পরমাণুর ভগ্নাংশ রাসায়নিক সংযোগে অংশগ্রহণ করতে পারে না; তাই হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের একটি অণুতে কমপক্ষে 1টি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং 1টি ক্লোরিন পরমাণু থাকবে। অর্থাৎ হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের 2টি অণুতে কমপক্ষে 2টি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং 2টি ক্লোরিন পরমাণু থাকবে। যেহেতু পরমাণু সৃষ্টি বা ধ্বংস করা সম্ভব নয়, তাই এ দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু অবশ্যই একটি হাইড্রোজেন অণুতে বিদ্যমান। একইভাবে দুইটি ক্লোরিন পরমাণু একটি ক্লোরিন অণুতে বিদ্যমান। অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন অণুতে 2টি করে সংশ্লিষ্ট পরমাণু বিদ্যমান।

এ কারণে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সংকেত HCl । হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন গ্যাসের অণুতে দুইটি করে পরমাণু থাকায় এদের সংকেত যথাক্রমে H_2 ও Cl_2 । একইভাবে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং ক্লোরিন গ্যাসের অণুতে দুইটি করে পরমাণু থাকায় তাদের সংকেত যথাক্রমে N_2 , O_2 , F_2 ।

হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন পরমাণুকে যথাক্রমে দাগকাটা ও সাদা বল দ্বারা প্রকাশ করলে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের বিক্রিয়া চিত্রাকারে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায় :



চিত্র ৩.২ : হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সংশ্লেষণ

৩.৫ দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্তের প্রমাণ

দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্তটি হল :

যে কোনো গ্যাসের আণবিক ভর তার বাষ্প ঘনত্বের দ্বিগুণ।

বাষ্প ঘনত্ব (vapour density) : একই তাপমাত্রা ও চাপে কোনো গ্যাস বা বাষ্পের যে কোনো আয়তনের ভর এবং তার সম আয়তনের হাইড্রোজেন গ্যাসের ভরের অনুপাতকে ঐ গ্যাসের বা বাষ্পের বাষ্প ঘনত্ব বলা হয়। একে গ্যাসের আপেক্ষিক ঘনত্বও (relative density) বলা হয়। অর্থাৎ :

$$\text{কোনো গ্যাসের বাষ্প ঘনত্ব} = \frac{\text{গ্যাসটির যে কোনো আয়তনের ভর}}{\text{একই তাপমাত্রা ও চাপে সম আয়তন হাইড্রোজেন গ্যাসের ভর}}$$

গ্যাসের বাষ্প ঘনত্বকে D দ্বারা চিহ্নিত করলে

$$D = \frac{\text{গ্যাসটির } V \text{ আয়তনের ভর}}{\text{একই তাপমাত্রা ও চাপে } V \text{ আয়তনের হাইড্রোজেন গ্যাসের ভর}}$$

মনে করি উল্লিখিত তাপমাত্রা ও চাপে V আয়তনের কোনো গ্যাসে গ্যাসটির n সংখ্যক অণু বিদ্যমান। সুতরাং উপরে বিবৃত অ্যাবোগেড্রোর সূত্র অনুসারে

$$\begin{aligned} D &= \frac{\text{গ্যাসটির } n \text{ সংখ্যক অণুর ভর}}{\text{হাইড্রোজেনের } n \text{ সংখ্যক অণুর ভর}} = \frac{\text{গ্যাসটির 1টি অণুর ভর}}{\text{হাইড্রোজেনের 1টি অণুর ভর}} \\ &= \frac{\text{গ্যাসটির 1টি অণুর ভর}}{\text{হাইড্রোজেনের 2টি পরমাণুর ভর}} \quad [\text{যেহেতু হাইড্রোজেন একটি অণুতে 2টি পরমাণু বিদ্যমান}] \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{\text{গ্যাসটির 1টি অণুর ভর}}{\text{হাইড্রোজেনের 1টি পরমাণুর ভর}} \\ &= \frac{1}{2} \times \text{গ্যাসটির আণবিক ভর (হাইড্রোজেন স্কেল অনুসারে)} \\ &= \frac{1}{2} \times M \quad [M = \text{গ্যাসটির আণবিক ভর}] \end{aligned}$$

$$\therefore M = D \times 2$$

অর্থাৎ কোনো গ্যাসের আণবিক ভর = সে গ্যাসের বাষ্প ঘনত্ব $\times 2$ (প্রমাণিত)।

৩.৬ তৃতীয় অনুসিদ্ধান্তের প্রমাণ

তৃতীয় অনুসিদ্ধান্তটি হচ্ছে

একই তাপমাত্রা ও চাপে সকল গ্যাসেরই মোলার আয়তন সমান এবং প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে তা 22.4 লিটার।

মোলার আয়তন (molar volume) : 1 মোল পরিমাণ গ্যাসের আয়তনকে সেই গ্যাসের মোলার আয়তন বলা হয়। যেমন, 1 মোল অক্সিজেন বলতে 32g অক্সিজেন বুঝায়। 32g অক্সিজেনের আয়তনকে অক্সিজেনের মোলার আয়তন বলা হয়।

প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপ (standard temperature and pressure বা সংক্ষেপে S.T.P): 0°C তাপমাত্রা ও 1 atm চাপকে প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

প্রমাণ :

কোনো গ্যাসের বাষ্প ঘনত্ব, $D = \frac{\text{গ্যাসটির যে কোনো আয়তনের ভর}}{\text{একই তাপমাত্রা ও চাপে সম আয়তন হাইড্রোজেন গ্যাসের ভর}}$

$$D = \frac{\text{প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে 1 লিটার গ্যাসের ভর}}{\text{প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে 1 লিটার হাইড্রোজেন গ্যাসের ভর}}$$

পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে 1 লিটার হাইড্রোজেন গ্যাসের ভর = 0.0898g।

$$\therefore D = \frac{\text{প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে 1 লিটার গ্যাসের ভর}}{0.0898g}$$

$$\therefore \text{প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে 1 লিটার গ্যাসের ভর} = D \times 0.0898g$$

অতএব $D \times 0.0898g$ গ্যাসের আয়তন = 1 লিটার

অথবা $D \times 2 \times 0.0898g$ গ্যাসের আয়তন = 2 লিটার।

আবার $M = D \times 2$

$$\therefore M \text{ g গ্যাসের আয়তন} = \frac{2}{0.0898} = 22.4 \text{ লিটার}$$

অর্থাৎ 1 মোল গ্যাসের আয়তন = 22.4 লিটার (প্রমাণিত)।

উদাহরণ :

১। প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে অক্সিজেন গ্যাসের ঘনত্ব বের কর।

সমাধান : অক্সিজেনের আণবিক ভর = 32; সুতরাং 1 মোল অক্সিজেন = 32g। আবার 1 মোল যে কোনো গ্যাসের আয়তন প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে 22.4 লিটার।

$$\therefore 22.4 \text{ লিটার অক্সিজেন গ্যাসের ভর} = 32g \text{ (প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে)}$$

$$\therefore 1 \text{ লিটার অক্সিজেন গ্যাসের ভর} = \frac{32g}{22.4 \text{ লিটার}} = 1.43g$$

অর্থাৎ প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে অক্সিজেনের ঘনত্ব = 1.43g/L।

২। পানি হচ্ছে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের যৌগ। জলীয় বাষ্পের বাষ্প ঘনত্ব 9। পানির আণবিক সংকেত বের কর।

সমাধান : যে কোনো গ্যাসের আণবিক ভর = বাষ্প ঘনত্ব \times 2

\therefore জলীয় বাষ্প বা পানির আণবিক ভর = $9 \times 2 = 18$ ।

অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর 16, হাইড্রোজেনের 1।

সুতরাং পানির অণুতে একটি মাত্র অক্সিজেন ও দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকলে তার আণবিক ভর 18 হতে পারে।

সুতরাং পানির আণবিক সংকেত হচ্ছে H_2O ।

৩। আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে কোনো গ্যাসের ঘনত্ব হচ্ছে 3.954 g/L। তার আণবিক ভর কত?

সমাধান : কোনো গ্যাসের বাষ্প ঘনত্ব = $\frac{\text{যে কোনো আয়তনের গ্যাসের ভর}}{\text{সম আয়তনের হাইড্রোজেনের ভর}}$

$$= \frac{\text{আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে 1 লিটার গ্যাসের ভর}}{\text{আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে 1 লিটার হাইড্রোজেনের ভর}}$$

$$= \frac{3.954}{0.0898} = 44$$

আবার আণবিক ভর = বাষ্প ঘনত্ব \times 2

গ্যাসটির আণবিক ভর = $44 \times 2 = 88$ (উঃ)

বিকল্প সমাধান :

আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে 1 লিটার গ্যাসের ভর = 3.954g

\therefore আবার আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে 22.4 লিটার গ্যাসের ভর = $3.954 \times 22.4 = 88g$

আবার আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে 1 মোল গ্যাসের আয়তন = 22.4 লিটার।

\therefore গ্যাসটির 1 মোল = 88g

অর্থাৎ গ্যাসটির আণবিক ভর = 88 (উঃ)

৪। 2.7g তরল অ্যামোনিয়াকে বাষ্পীভূত হতে দিলে তা আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে 3.557 লিটার আয়তন দখল করে। অ্যামোনিয়ার আণবিক ভর বের কর।

সমাধান : 3.557 লিটার অ্যামোনিয়া গ্যাসের ভর = 2.7g

$$\therefore 22.4 \text{ লিটার অ্যামোনিয়া গ্যাসের ভর} = \frac{2.7 \times 22.4}{3.557} = 17g$$

যেহেতু আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে 1 মোল গ্যাসের আয়তন = 22.4 লিটার, তাই এক্ষেত্রে 1 মোল অ্যামোনিয়ার ভর = 17g।

অর্থাৎ অ্যামোনিয়ার আণবিক ভর = 17 (উঃ)

৫। আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে 50g কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের আয়তন কত?

সমাধান : কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)- এর আণবিক ভর = $12 + 16 \times 2 = 12 + 32 = 44$

∴ আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে 44g CO₂ এর আয়তন = 22.4 লিটার

∴ আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে 50g CO₂-এর আয়তন = $\frac{22.4 \times 50}{44} = 25.45 \text{ liter (উঃ)} \mid$

৩.৭ অ্যাভোগেড্রো সংখ্যা (Avogadro number)

দেখা যাচ্ছে যে একই তাপমাত্রা ও চাপে গ্যাসীয় অবস্থায় সকল মোলার আয়তন সমান। আবার অ্যাভোগেড্রোর সূত্র অনুসারে একই তাপমাত্রা ও চাপে সমান আয়তন সকল গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু বিদ্যমান। সুতরাং সকল গ্যাসের 1 মোল-এ সমান সংখ্যক অণু থাকে। এ সংখ্যাকে অ্যাভোগেড্রো সংখ্যা বলা হয়। অ্যাভোগেড্রো সূত্র হতে প্রাপ্ত এ সিদ্ধান্ত কঠিন ও তরল বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

অতএব কোনো বস্তুর এক মোলে যত সংখ্যক অণু থাকে সেই সংখ্যাকে অ্যাভোগেড্রো সংখ্যা বলা হয়। একে N দ্বারা প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা এর মান 6.02×10^{23} নির্ণীত হয়েছে। অর্থাৎ $N = 6.02 \times 10^{23}$ ।

মৌলের ক্ষেত্রে অ্যাভোগেড্রো সংখ্যার প্রয়োগ : আমরা একটি সাধারণ অবস্থা বিবেচনা করি। কোনো মৌলের অণুতে n সংখ্যক পরমাণু বিদ্যমান। সুতরাং মৌলটির পারমাণবিক ভর M হলে আণবিক ভর = nM। উপরের আলোচনা অনুযায়ী nM g বা 1 মোল মৌলটিতে N সংখ্যক অণু বিদ্যমান। প্রতি অণুতে n সংখ্যক পরমাণু থাকায় N সংখ্যক অণুতে nN সংখ্যক পরমাণু বিদ্যমান।

∴ nM g মৌলে N সংখ্যক অণু বা nN সংখ্যক পরমাণু বিদ্যমান।

M g মৌলে N সংখ্যক পরমাণু বিদ্যমান। আবার M g মৌল = 1 গ্রাম পরমাণু মৌল।

সুতরাং 1 গ্রাম পরমাণু মৌলে N সংখ্যক পরমাণু বিদ্যমান। অর্থাৎ সকল মৌলের 1 গ্রাম পরমাণুতে অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যার সমান সংখ্যক পরমাণু বিদ্যমান।

উদাহরণ ১। : 1 টি কার্বন পরমাণুর ভর কত? [C= 12]

সমাধান : কার্বনের পারমাণবিক ভর = 12

∴ 1 গ্রাম পরমাণু কার্বন = 12g কার্বন। এতে N সংখ্যক পরমাণু বিদ্যমান।

N সংখ্যক কার্বন পরমাণুর ভর = 12g। যেহেতু $N = 6.02 \times 10^{23}$ ।

∴ 1 টি কার্বন পরমাণুর ভর = $\frac{12g}{N} = \frac{12g}{6.02 \times 10^{23}} = 1.99 \times 10^{-23} \text{ g (উঃ)} \mid$

২। একটি পানির অণুর ভর কত?

সমাধান : পানির আণবিক ভর = 18। সুতরাং এক মোল পানি = 18g পানি।

6.02×10^{23} টি পানির অণুর ভর = 18g।

∴ 1 টি পানির অণুর ভর = $\frac{18g}{6.02 \times 10^{23}} = 2.99 \times 10^{-23} \text{ g (উঃ)} \mid$

৩। এক গ্রাম পানিতে কতটি অণু আছে?

সমাধান : পানির 1 মোল = 18g পানি।

যে কোন বস্তুর 1 মোল পরিমাণে 6.02×10^{23} সংখ্যক অণু বিদ্যমান

\therefore 18g পানিতে আছে = 6.02×10^{23} টি অণু।

\therefore 1g গ্রাম পানিতে আছে = $\frac{6.02 \times 10^{23}}{18} = 3.346 \times 10^{22}$ টি অণু (উঃ)।

৪। 1g হীরকে কয়টি কার্বন পরমাণু বিদ্যমান?

সমাধান : হীরক কার্বনের একটি রূপভেদ। কার্বনের পারমাণবিক ভর = 12।

সুতরাং 1 মোল হীরক বা কার্বন = 12g কার্বন।

12g হীরকে আছে 6.02×10^{23} টি কার্বন পরমাণু।

\therefore 1g হীরকে আছে = $\frac{6.02 \times 10^{23}}{12} = 5.02 \times 10^{22}$ টি পরমাণু।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

অ্যাভোগেড্রোর সূত্র : একই তাপমাত্রা ও চাপে সম আয়তন বিশিষ্ট সকল গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু থাকে।

অ্যাভোগেড্রোর সূত্র হতে প্রাপ্ত তিনটি অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে :

- (১) নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহ ব্যতীত সকল মৌলিক গ্যাসের অণু দ্বিপরিমাণিক।
- (২) যে কোনো গ্যাসের আণবিক ভর তার বাষ্প ঘনত্বের দ্বিগুণ।
- (৩) একই তাপমাত্রা ও চাপে সকল গ্যাসের মোলার আয়তন সমান এবং প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে তা 22.4 লিটার।

বাষ্প ঘনত্ব : একই তাপমাত্রা ও চাপে কোনো গ্যাস বা বাষ্পের যে কোনো আয়তনের ভর এবং তার সম আয়তনের হাইড্রোজেন গ্যাসের ভরের অনুপাতকে ঐ গ্যাসের বাষ্প ঘনত্ব বলা হয়।

মোলার আয়তন : 1 মোল পরিমাণ বস্তুর আয়তনকে সেই বস্তুর মোলার আয়তন বলা হয়।

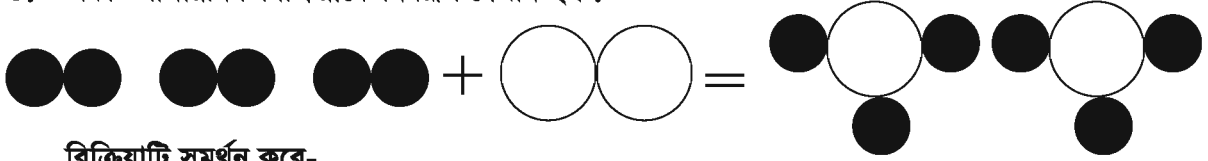
প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপ : 0°C ও 1 atm চাপকে যথাক্রমে প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপ বলা হয়।

অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যা : কোনো বস্তুর 1 মোল-এ যত সংখ্যক অণু বা কোনো মৌলের 1 মোল পরমাণুতে যত সংখ্যক পরমাণু বিদ্যমান, তাকে অ্যাভোগেড্রো সংখ্যা বলা হয়। এর মান 6.02×10^{23} ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- বার্জেলিয়াস পরমাণুবাদের সাহায্যে কোন সূত্রকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন?
ক. স্থিরানুপাত সূত্র খ. অ্যাভোগেড্রোর সূত্র
গ. গ্যাস আয়তন সূত্র ঘ. বিপরীত অনুপাত সূত্র
- প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে ২ গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাসে বিদ্যমান অণুর সংখ্যা, 25°C তাপমাত্রায় ও 1 atm চাপে ২ গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাসে বিদ্যমান অণুর সংখ্যার-
ক. দ্বিগুণ খ. সমান
গ. অর্ধেক ঘ. চারগুণ
- একটি গ্যাসের ঘনত্ব 1.43 g/L । গ্যাসটির আণবিক ভর কত?
ক. ৪ খ. ১৬
গ. ৩২ ঘ. ৬৪
- একটি রাসায়নিক বিক্রিয়াকে নিম্নরূপ দেখান হল :



বিক্রিয়াটি সমর্থন করে-

- অ্যাভোগেড্রোর প্রথম অনুসিদ্ধান্ত
- অ্যাভোগেড্রোর তৃতীয় অনুসিদ্ধান্ত
- গ্যাস আয়তন সূত্র

কোনটি সঠিক?

- i খ. i ও iii
- ii ও iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

একটি কক্ষে 0°C তাপমাত্রায় এবং 1 atm চাপে সমভরের দুইটি বেলুনের একটি হাইড্রোজেন এবং অপরটি একটি অজ্ঞাত গ্যাস X দ্বারা পূর্ণ করা হলে দুইটি বেলুনেরই আয়তন 1 লিটার এবং ভর যথাক্রমে 2.0893 গ্রাম ও 5.1696 গ্রাম হয়। হাইড্রোজেন গ্যাসের 1mL X গ্যাসের 1mL এর সাথে বিক্রিয়া করে 2 mL HX গ্যাস উৎপন্ন করে। উল্লেখ্য, সম আয়তন সকল গ্যাসে সমান সংখ্যক অণু থাকে এবং সকল গ্যাসের এক মোলে অণুর সংখ্যা ধ্রুবক।

- এক মোল গ্যাসে উপস্থিত অণুর সংখ্যা কত?
- গ্যাসের অণুর সংখ্যা ও আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশকারী সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।
- X গ্যাসের অণুতে পরমাণুর সংখ্যা নির্ণয় কর।
- X গ্যাসটিকে শনাক্ত কর।

চতুর্থ অধ্যায়

সংকেত, যোজনী ও সমীকরণ

বিষয়বস্তু : (ক) সংকেত : স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেত; শতকরা সংযুতি হতে আণবিক সংকেত নির্ণয়ের পদ্ধতি; গাঠনিক সংকেত, বিভিন্ন সরল অণুর গাঠনিক সংকেত লিখন।

(খ) যোজনী : সাধারণ মতবাদ; সুপ্ত, সক্রিয় ও পরিবর্তনশীল যোজনী, বিভিন্ন মৌল ও মূলকের যোজনীর মান ব্যবহার করে সংকেত লিখন।

(গ) রাসায়নিক সমীকরণের তাৎপর্য ও সমতাবিধান; সমীকরণ ভিত্তিক সরল হিসাব।

৪.১ মৌলের প্রতীক (Symbols of elements)

বিজ্ঞানীগণ সব মৌলের নাম ও প্রতীক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অধিকাংশ নাম ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। নতুন আবিষ্কৃত মৌলসমূহের নাম তাদের আবিষ্কারকগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়। প্রতীকসমূহ প্রধানত মৌলের ল্যাটিন, ইংরেজি এবং দুই এক ক্ষেত্রে অন্য ভাষার নাম হতে উদ্ভূত। Boron এবং Zirconium নামদ্বয় আরবি ভাষা থেকে এসেছে। প্রতীকের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়ম মানা হয় :

- (১) প্রতীক মৌলের ল্যাটিন অথবা ইংরেজি নামের আদি এক বা একাধিক বর্ণ দ্বারা লেখা হয়।
- (২) এক বর্ণ বিশিষ্ট প্রতীক হলে তা বড় হাতের অক্ষরে (capital letter) লিখতে হয়। যেমন : অক্সিজেনের প্রতীক হচ্ছে O, হাইড্রোজেনের প্রতীক H, নাইট্রোজেনের প্রতীক N, কার্বনের C, সালফারের প্রতীক হচ্ছে S।
- (৩) দুই বর্ণ বিশিষ্ট প্রতীকের ক্ষেত্রে প্রথম বর্ণ বড় হাতের এবং দ্বিতীয় বর্ণ ছোট হাতের লেখা হয়। যেমন : ক্লোরিনের প্রতীক Cl, সোডিয়াম (ল্যাটিন নাম Natrium)–এর প্রতীক Na, লোহার (ল্যাটিন নাম Ferrum) প্রতীক Fe, ম্যাগনেসিয়ামের প্রতীক Mg, ক্যালসিয়ামের প্রতীক Ca। উল্লেখ্য যে, এসব প্রতীক দ্বারা ঐ মৌলের একটি পরমাণু বুঝানো হয়।

৪.২ যৌগসমূহের সংকেত (Formula of compounds)

কোনো যৌগের একটি অণুতে বিভিন্ন মৌলের যে সংখ্যক পরমাণু বিদ্যমান, তাদের প্রতীক ও সংখ্যা উল্লেখের মাধ্যমে যৌগের অণুর (molecules of compounds) সংকেত নির্ধারিত হয়। মৌলের প্রতীক পূর্বের নিয়মেই লেখা হয়, প্রতীকের ডান দিকে নিচের কোনায় পরমাণুর সংখ্যা লেখা হয়; সংখ্যা এক হলে তা উল্লেখ করা হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ, পানির একটি অণুতে হাইড্রোজেনের দুইটি পরমাণু এবং অক্সিজেনের একটি পরমাণু বিদ্যমান। সুতরাং পানির সংকেত হচ্ছে H_2O । হাইড্রোজেন পারক্সাইডের অণুতে হাইড্রোজেনের দুইটি পরমাণু এবং অক্সিজেনের দুইটি পরমাণু বিদ্যমান। সুতরাং তার সংকেত H_2O_2 । অ্যামোনিয়ার সংকেত NH_3 । অ্যামোনিয়ার একটি অণুতে নাইট্রোজেনের একটি ও হাইড্রোজেনের তিনটি পরমাণু বিদ্যমান। সালফিউরিক এসিডের সংকেত H_2SO_4 । অর্থাৎ তার একটি অণুতে হাইড্রোজেনের দুইটি, সালফারের একটি এবং অক্সিজেনের চারটি পরমাণু বিদ্যমান।

৪.৩ মৌলসমূহের অণু (Molecules of elements)

হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন মৌলের অণুতে দুইটি করে পরমাণু বিদ্যমান। সুতরাং তাদের অণুর সংকেত হচ্ছে যথাক্রমে H_2 ও N_2 । অক্সিজেনের সাধারণ অণুতে দুইটি পরমাণু বিদ্যমান, তাই এর সংকেত O_2 । অক্সিজেনের আরেক ধরনের অণু আছে, তাতে তিনটি পরমাণু বিদ্যমান। এর নাম ওজোন এবং সংকেত O_3 । সাধারণ সালফার ও ফসফরাসের অণুতে যথাক্রমে ৪ ও ৪টি পরমাণু বিদ্যমান। সুতরাং তাদের অণুর সঠিক সংকেত হচ্ছে যথাক্রমে S_8 ও P_4 ।

৪.৪ সংকেতের তাৎপর্য

সংকেতের দুই ধরনের তাৎপর্য আছে :

- (১) গুণগত তাৎপর্য
- (২) পরিমাণগত তাৎপর্য

গুণগত তাৎপর্য

(ক) কোনো সংকেত দ্বারা একটি নির্দিষ্ট বস্তু বুঝায়। যেমন : H_2SO_4 সংকেত দ্বারা একটি নির্দিষ্ট বস্তু সালফিউরিক এসিড বুঝায়।

(খ) সংকেত দ্বারা বস্তুটি কী কী মৌল দ্বারা গঠিত, তা বুঝায়। যেমন : H_2SO_4 সংকেত দ্বারা বুঝা যায় যে বস্তুটি হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও সালফার এ তিনটি মৌল দ্বারা গঠিত।

পরিমাণগত তাৎপর্য

(ক) কোনো বস্তুর প্রতিটি অণুতে উপাদান মৌলের কয়টি পরমাণু আছে সংকেত তা নির্দেশ করে। যেমন : H_2SO_4 এর সংকেত দ্বারা বুঝা যায় যে, এর প্রতিটি অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন, একটি সালফার ও চারটি অক্সিজেন পরমাণু বিদ্যমান।

(খ) সংকেত দ্বারা বস্তুটির আণবিক ভর জানা যায়। যেমন হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর = 1.0; অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর = 16; সালফারের পারমাণবিক ভর = 32। সুতরাং সালফিউরিক এসিডের আণবিক ভর = $1 \times 2 + 32 + 16 \times 4 = 98$ ।

(গ) কোনো যৌগের সংকেত যৌগটিতে বিদ্যমান মৌলসমূহের আপেক্ষিক ভর নির্দেশ করে। যেমন : সালফিউরিক এসিডে ভর হিসেবে হাইড্রোজেনের পরিমাণ $(2 \div 98) \times 100 = 2\%$; সালফারের পরিমাণ $(32 \div 98) \times 100 = 32.7\%$; অক্সিজেনের পরিমাণ $(64 \div 98) \times 100 = 65.2\%$ ।

৪.৫ যৌগের আণবিক সংকেত হতে তার সংযুতি গণনা

কোনো যৌগের সংযুতি বলতে তাতে বিদ্যমান মৌলসমূহ কী অনুপাতে আছে, তা বুঝায়। সাধারণত ভর হিসেবে কোন কোন মৌলের পরিমাণ শতকরা কত ভাগ তাই প্রকাশ করা হয়। আণবিক সংকেত হতে শতকরা সংযুতি গণনায় দুইটি ধাপ আছে :

- (১) প্রথমত অণুতে বিদ্যমান মৌলসমূহের পারমাণবিক ভর ও পরমাণুর সংখ্যা হতে বস্তুর আণবিক ভর বের করতে হয়।
- (২) বিভিন্ন মৌলের মোট পরিমাণকে আণবিক ভর দ্বারা ভাগ করে 100 দ্বারা গুণ করে শতকরা হিসাবে মৌলসমূহের পরিমাণ হিসাব করা হয়।

উদাহরণ

১। পানি (H_2O)-এর শতকরা সংযুতি বের কর।

সমাধান : সংকেত হতে এটি স্পষ্ট যে পানির অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু বিদ্যমান। হাইড্রোজেনের ও অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে যথাক্রমে 1 ও 16 (আসন্ন বা approximate ভর উল্লেখ করা হয়েছে)।

সুতরাং পানিতে হাইড্রোজেনের শতকরা পরিমাণ = $(2 \div 18) \times 100 = 11.1\%$

অক্সিজেনের শতকরা পরিমাণ = $(16 \div 18) \times 100 = 88.9\%$ ।

সুতরাং পানির শতকরা সংযুতি (ভর হিসেবে) : H = 11.1%; O = 88.9% (উঃ)।

২। পারক্লোরিক এসিড (HClO_4)-এর শতকরা সংযুতি বের কর।

সমাধান : সংকেত হতে বুঝা যায় যে পারক্লোরিক এসিডের একটি অণুতে একটি হাইড্রোজেন, একটি ক্লোরিন এবং চারটি অক্সিজেন পরমাণু আছে। সুতরাং পারক্লোরিক এসিডের আণবিক ভর = $1 + 35.5 + 16 \times 4 = 100.5$
 100.5 ভাগ ভরের পারক্লোরিক এসিডে হাইড্রোজেন আছে = 1 ভাগ

$$\therefore 1 \quad \text{,,} \quad \text{,,} \quad \text{,,} \quad \text{,,} \quad \text{,,} \quad \text{,,} \quad \text{,,} = \frac{1}{100.5}$$

$$\therefore 100 \quad \text{,,} \quad \text{,,} \quad \text{,,} \quad \text{,,} \quad \text{,,} \quad \text{,,} \quad \text{,,} = \frac{1 \times 100}{100.5}$$

$$= 0.995 \text{ ভাগ}$$

$$\text{অনুরূপভাবে ক্লোরিনের পরিমাণ} = \frac{35.5 \times 100}{100.5} = 35.3\%$$

$$\text{অক্সিজেনের পরিমাণ} = \frac{64}{100.5} \times 100\% = 63.7\%$$

সুতরাং পারক্লোরিক এসিডের শতকরা সংযুতি : $\text{H} = 0.995\%$; $\text{Cl} = 35.3\%$; $\text{O} = 63.68\%$ (উঃ)।

৪.৬ স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেত (Empirical formula and molecular formula)

কোনো যৌগের অণুতে বিদ্যমান মৌলসমূহের পরমাণুগুলোর সংখ্যা কী ক্ষুদ্রতম পূর্ণসংখ্যার অনুপাতে আছে তার সংক্ষিপ্ত প্রকাশকে ঐ যৌগের স্থূল সংকেত বলা হয়।

অপরদিকে আণবিক সংকেত হতে অণুতে বিদ্যমান মৌলসমূহের পরমাণুর সত্যিকার সংখ্যা জানা যায়। যেমন হাইড্রোজেন পারক্সাইডের আণবিক সংকেত H_2O_2 অর্থাৎ এ যৌগের একটি অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও দুইটি অক্সিজেন পরমাণু বিদ্যমান। এ সংখ্যা দ্বয় (2 ও 2) 2 দ্বারা বিভাজ্য এবং ভাগফল 1 ও 1। সুতরাং এ যৌগের স্থূল সংকেত HO । এ স্থূল সংকেত হতে বুঝা যায় যে, এ যৌগের অণুতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিদ্যমান এবং তাদের পরমাণু সংখ্যা সমান। কিন্তু একটি অণুতে সত্যি সত্যি কয়টি করে পরমাণু আছে তা এ সংকেত হতে জানা যায় না।

বেনজিনের আণবিক সংকেত C_6H_6 অর্থাৎ এর প্রতিটি অণুতে ছয়টি কার্বন ও ছয়টি হাইড্রোজেন পরমাণু বিদ্যমান। অপরদিকে এ দুইটি সংখ্যাকে তাদের গ.সা.গু. (এ ক্ষেত্রে 6) দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 1 ও 1। সুতরাং বেনজিনের স্থূল সংকেত CH । এ সংকেত হতে বুঝার উপায় নেই বেনজিনের অণুতে প্রকৃতপক্ষে কয়টি কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণু বিদ্যমান।

অনেক ক্ষেত্রে স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেত একই রূপ হয়। যেমন : পানি H_2O , অ্যামোনিয়া NH_3 , মিথেন CH_4 , প্রভৃতি যৌগের পরমাণু সংখ্যাসমূহ এমন যে তাদের গ.সা.গু = 1।

৪.৭ স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেতের মধ্যে পার্থক্য

স্থূল সংকেত	আণবিক সংকেত
১। স্থূল সংকেত যৌগের অণুতে বিদ্যমান বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত প্রকাশ করে; প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ করে না। যেমন : বেনজিনের স্থূল সংকেত CH হতে জানা যায় যে, এর অণুতে কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যার অনুপাত 1 : 1। পরমাণু সমূহের সত্যিকার সংখ্যা জানা যায় না।	১। আণবিক সংকেত যৌগের অণুতে বিদ্যমান পরমাণুসমূহের প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ করে। যেমন: বেনজিনের আণবিক সংকেত C_6H_6 । সুতরাং বেনজিনের একটি অণুতে ছয়টি কার্বন ও ছয়টি হাইড্রোজেন পরমাণু বিদ্যমান।
২। যৌগের স্থূল সংকেত নির্ণয় করতে এর সংযুতি জানা প্রয়োজন। আণবিক ভর জানার প্রয়োজন নেই।	২। যৌগের আণবিক সংকেত নির্ণয় করতে এর সংযুতির সাথে সাথে আণবিক ভর জানতে হবে।
৩। যৌগের স্থূল সংকেত কোনো কোনো ক্ষেত্রে আণবিক সংকেতের সমান হয়।	৩। যৌগের আণবিক সংকেত হয় এর স্থূল সংকেতের সমান অথবা কোনো সরল গুণিতকের সমান।
৪। স্থূল সংকেত শুধু যৌগের হতে পারে।	৪। আণবিক সংকেত যৌগ বা মৌল, উভয় ধরনের পদার্থের হয়।
৫। একই স্থূল সংকেত একাধিক যৌগের হতে পারে। যেমন : অ্যাসিটিলিন ও বেনজিন উভয়ের স্থূল সংকেত CH।	৫। সমাণু ব্যতীত একটি আণবিক সংকেত একটি মাত্র যৌগের হয়ে থাকে। যেমন : C_2H_2 শুধুমাত্র অ্যাসিটিলিনের আণবিক সংকেত। C_6H_6 শুধুমাত্র বেনজিনের আণবিক সংকেত।

৪.৮ যৌগের শতকরা সংযুতি হতে এর স্থূল সংকেত নির্ণয়ের নিয়ম

- ১) মৌলসমূহের শতকরা পরিমাণকে নিজ নিজ পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করে যৌগের অণুতে বিদ্যমান মৌলসমূহের মোল সংখ্যার অনুপাত বের করা হয়।
- ২) এ ভাগফলসমূহ যদি সরল ও পূর্ণ সংখ্যার না হয় তবে তাদেরকে তাদের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে মৌলসমূহের পরমাণু সংখ্যার অনুপাত বের করা হয়।
- ৩) দ্বিতীয় ভাগফলগুলো যদি পূর্ণসংখ্যা না হয়, তবে সুবিধাজনক ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা এদের প্রত্যেককে গুণ করে পূর্ণসংখ্যায় রূপান্তরিত করতে হবে। যদি কোনো ভাগফল বা গুণফল পূর্ণসংখ্যার কাছাকাছি হয়, তবে তার নিকটতম পূর্ণসংখ্যাকে গ্রহণ করতে হবে। এ পূর্ণসংখ্যাসমূহ হচ্ছে যৌগের স্থূলসংকেতে বিদ্যমান মৌলসমূহের স্ব স্ব পরমাণু সংখ্যার অনুপাত।

উদাহরণ : (ক) গ্লুকোজের শতকরা সংযুতি হচ্ছে C = 40%; H = 6.67% এতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌল বিদ্যমান। এর স্থূল সংকেত বের কর।

সমাধান : যেহেতু কোনো যৌগে বিদ্যমান মৌলসমূহের শতকরা পরিমাণের যোগফল 100 হতে হবে, তাই উক্ত যৌগে অক্সিজেনের পরিমাণ = $100 - (40 + 6.67) = 100 - 46.67 = 53.33\%$

যে কোনো মৌলের পরমাণুর মোল সংখ্যা = $\frac{\text{শতকরা সংযুতি}}{\text{পারমাণবিক ভর}}$

সুতরাং C পরমাণুর মোল সংখ্যা = $40/12 = 3.33$

H পরমাণুর মোল সংখ্যা = $6.67/1 = 6.67$

O পরমাণুর মোল সংখ্যা = $53.33/16 = 3.33$

এ তিনটি সংখ্যার মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা 3.33 দ্বারা ভাগফলসমূহকে আবাবো ভাগ করলে পাওয়া যায় যথাক্রমে 1, 2 (প্রায়) ও 1।

সুতরাং যেকোনো C, H ও O-এর পরমাণু সংখ্যার অনুপাত = 1 : 2 : 1।

অর্থাৎ এর স্থূল সংকেত : CH_2O

খ) একটি যৌগে 32.4% সোডিয়াম, 22.5% সালফার ও 45.1% অক্সিজেন বিদ্যমান। এর সরল সংকেত বা স্থূল সংকেত বের কর।

সমাধান : এখানে, $32.4 + 22.5 + 45.1 = 100$

প্রত্যেক মৌলের শতকরা পরিমাণকে তার পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করে পাই :

$\text{Na} = 32.4/23 = 1.409$; $\text{S} = 22.5/32 = 0.703$; $\text{O} = 45.1/16 = 2.81$

প্রাপ্ত ভাগফলসমূহকে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = 0.703 দ্বারা ভাগ করে পাই :

$\text{Na} = 1.409/0.703 = 1.992 \approx 2$; $\text{S} = 0.703/0.703 = 1$; $\text{O} = 2.81/0.703 = 3.997 \approx 4$

Na এবং O-এর ক্ষেত্রে সংখ্যাসমূহ যথাক্রমে 2 ও 4 খুবই নিকটে, সুতরাং এ পূর্ণসংখ্যা দ্বয়কে গ্রহণ করতে হবে।

সুতরাং যৌগের সরল বা স্থূল সংকেত = Na_2SO_4

গ) একটি যৌগে হাইড্রোজেন 1.61%; অক্সিজেন 76.16% এবং নাইট্রোজেন 22.23%। যৌগটির সরল সংকেত বের কর।

সমাধান : এখানে মৌলসমূহের মোট পরিমাণ = $1.61 + 76.16 + 22.23 = 100$ । সুতরাং এতে অন্য কোনো মৌল নেই। প্রত্যেক মৌলের শতকরা পরিমাণকে নিজ নিজ পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যায় :

$\text{H} : 1.6/1 = 1.6$; $\text{N} : 22.23/14 = 1.59$; $\text{O} : 76.16/16 = 4.76$

প্রাপ্ত ভাগফলসমূহকে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা 1.59 দ্বারা ভাগ করে পাওয়া যায়

$\text{H} : 1.6/1.59 = 1$; $\text{N} : 1.59/1.59 = 1$; $\text{O} : 4.76/1.59 = 3$

সুতরাং যৌগটির সরলতম সংকেত HNO_3 ।

৪.৯ আণবিক সংকেত নির্ণয়ের নিয়ম

আণবিক সংকেত নির্ণয়ের জন্য যৌগের শতকরা সংযুতির সাথে সাথে আণবিক ভর জানা প্রয়োজন। প্রথম শতকরা পরিমাণ হতে স্থূল সংকেত নির্ণয় করতে হয়। অতঃপর আণবিক ভর ও স্থূল সংকেত হতে আণবিক সংকেত বের করতে হয়। এক্ষেত্রে নিম্নের নিয়ম প্রযোজ্য। কারণ কোনো যৌগের সঠিক আণবিক সংকেত এর স্থূল সংকেতের গুণিতক।

যেমন : গ্লুকোজের স্থূল সংকেত CH_2O হলে এর আণবিক সংকেত $(\text{CH}_2\text{O})_n$ হবে। যদি গ্লুকোজের আণবিক ভর 180 হয়, তবে

$$(\text{CH}_2\text{O} \text{ এর আণবিক ভর}) n = 180$$

$$\text{বা, } (12 + 1 \times 2 + 16)n = 180$$

$$\therefore n = \frac{180}{30} = 6$$

$$\text{সুতরাং গ্লুকোজের আণবিক সংকেত} = (\text{CH}_2\text{O})_6 = \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$$

উদাহরণ

ক) একটি যৌগে $\text{C} = 92.3\%$; $\text{H} = 7.7\%$ । এর আণবিক ভর = 78। যৌগটির আণবিক সংকেত বের কর।

সমাধান : কার্বন ও হাইড্রোজেনের সর্বমোট শতকরা পরিমাণ = $92.3 + 7.7 = 100$; সুতরাং এতে অন্য কোনো মৌল নেই। প্রতিটি মৌলের শতকরা পরিমাণকে নিজ নিজ পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যায় :

$$\text{C} = 92.3/12 = 7.7; \text{H} = 7.7/1 = 7.7$$

প্রাপ্ত ভাগফলকে 7.7 দ্বারা ভাগ করে পাওয়া যায় :

$$\text{C} = 7.7/7.7 = 1; \text{H} = 7.7/7.7 = 1$$

অতএব, যৌগটির স্থূল সংকেত CH । সুতরাং এর আণবিক সংকেত $(\text{CH})_n$ ।

$$\text{স্থূল সংকেতের আণবিক ভর} = 12 + 1 = 13$$

$$\text{যৌগটির প্রকৃত আণবিক ভর} = 78$$

$$\text{সুতরাং } n = 78/13 = 6$$

$$\text{সুতরাং যৌগটির আণবিক সংকেত} = (\text{CH})_6 = \text{C}_6\text{H}_6$$

খ) পূর্বোক্ত উদাহরণে আণবিক ভর 26 হলে যৌগটির আণবিক সংকেত কী?

সমাধান : পূর্বোক্ত হিসাব অনুযায়ী যৌগটির স্থূল সংকেত CH ; সুতরাং আণবিক সংকেত $(\text{CH})_n$ ।

$$\text{স্থূল সংকেতের আণবিক ভর} = 12 + 1 = 13$$

$$\text{যৌগটির আণবিক ভর} = 26$$

$$\text{সুতরাং } n = 26/13 = 2$$

$$\text{অতএব, যৌগটির আণবিক সংকেত} = (\text{CH})_2 = \text{C}_2\text{H}_2$$

গ) একটি যৌগের শতকরা সংযুতি হচ্ছে $\text{N} = 36.8\%$; $\text{O} = 63.2\%$ । এর বাষ্প ঘনত্ব 38। যৌগটির আণবিক সংকেত বের কর।

সমাধান : নাইট্রোজেনের ও অক্সিজেনের সর্বমোট শতকরা পরিমাণ = $36.8 + 63.2 = 100$ । মৌলদ্বয়ের শতকরা পরিমাণকে তাদের পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করে পাওয়া যায় :

$$\text{N} = 36.8/14 = 2.63; \text{O} = 63.2/16 = 3.94$$

ভাগফলদ্বয়কে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা 2.63 দ্বারা ভাগ করে পাওয়া যায়।

$$\text{N} = 2.63/2.63 = 1; \text{O} = 3.94/2.63 = 1.5$$

কাজেই যৌগটির স্থূল সংকেত হওয়ার কথা $\text{NO}_{1.5}$ । কিন্তু পরমাণুর সংখ্যা ভগ্নাংশ হতে পারে না। সুতরাং উভয় সংখ্যাকে দুই দ্বারা গুণ করে পাওয়া যায়।

$$\text{N} = 1 \times 2 = 2; \text{O} = 1.5 \times 2 = 3।$$

অতএব, যৌগটির স্থূল সংকেত হচ্ছে N_2O_3 এবং আণবিক সংকেত হচ্ছে $(\text{N}_2\text{O}_3)_n$

$$\text{আবার যৌগটির আণবিক ভর} = \text{বাম্প ঘনত্ব} \times 2 = 38 \times 2 = 76।$$

$$\text{স্থূল সংকেত } \text{N}_2\text{O}_3 \text{ এর আণবিক ভর} = 14 \times 2 + 16 \times 3 = 28 + 48 = 76।$$

$$\text{সুতরাং } n = \text{প্রকৃত আণবিক ভর} \div \text{স্থূল সংকেতের আণবিক ভর} = 76 / 76 = 1।$$

$$\text{সুতরাং যৌগটির আণবিক সংকেত} = \text{N}_2\text{O}_3 \text{ (উঃ)।}$$

৪.১০ যোজনী (Valency)

দুই বা ততোধিক ভিন্ন মৌলের পরমাণু পরস্পরের সাথে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে যৌগের অণু সৃষ্টি করে। এ সংযোগ কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে হয়।

যেমন -

- (১) ক্লোরিনের একটি পরমাণু হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর সাথে সংযুক্ত হয়ে এক অণু হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) সৃষ্টি করে।
- (২) অক্সিজেনের একটি পরমাণু হাইড্রোজেনের দুইটি পরমাণুর সাথে সংযুক্ত হয়ে এক অণু পানি (H_2O) সৃষ্টি করে।
- (৩) নাইট্রোজেনের একটি পরমাণু হাইড্রোজেনের তিনটি পরমাণুর সাথে সংযুক্ত হয়ে এক অণু অ্যামোনিয়া (NH_3) সৃষ্টি করে।
- (৪) কার্বনের একটি পরমাণু হাইড্রোজেনের চারটি পরমাণুর সাথে সংযুক্ত হয়ে এক অণু মিথেন (CH_4) সৃষ্টি হয়।

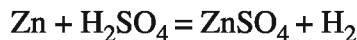
এ সকল উদাহরণ হতে এটা স্পষ্ট যে, বিভিন্ন মৌলের একটি পরমাণু হাইড্রোজেনের বিভিন্ন সংখ্যক পরমাণুর সাথে সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা এক নয়, বিভিন্ন।

বিভিন্ন মৌলের পরমাণুসমূহের পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা মাপার জন্য একটি মাপকাঠি প্রয়োজন। উপরের উদাহরণসমূহে দেখা যায় যে, হাইড্রোজেনের পরমাণু সংযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা সবচেয়ে কম। অন্যান্য বহু যৌগ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হাইড্রোজেনের একটি পরমাণু অন্য মৌলের একাধিক পরমাণুর সাথে সংযুক্ত হতে পারে না; যদিও অনেক মৌলের একটি মাত্র পরমাণু হাইড্রোজেনের একাধিক পরমাণুর সাথে সংযুক্ত হয়। এ কারণে রসায়নবিদগণ বিভিন্ন মৌলের একটি মাত্র পরমাণু সংযুক্ত হওয়ার ক্ষমতাকে মাত্রিকভাবে প্রকাশের জন্য হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর সংযুক্ত হওয়ার ক্ষমতাকে একক বা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষমতার মাত্রিক পরিমাণকে যোজনী বলা হয়। সংজ্ঞা অনুযায়ী হাইড্রোজেনের যোজনী এক।

১নং উদাহরণে হাইড্রোজেনের একটি পরমাণু ক্লোরিনের একটি পরমাণুর সাথে সংযুক্ত হয়। সুতরাং হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের যোজনী সমান। হাইড্রোজেনের যোজনী এক; সুতরাং ক্লোরিনের যোজনীও এক। ২নং উদাহরণে অক্সিজেনের একটি পরমাণু হাইড্রোজেনের দুইটি পরমাণুর সাথে সংযুক্ত হয়। সুতরাং অক্সিজেনের পরমাণুর সংযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা হাইড্রোজেনের পরমাণুর দ্বিগুণ। অতএব, অক্সিজেনের যোজনী হাইড্রোজেনের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২।

অনুরূপভাবে ৩নং ও ৪নং উদাহরণ হতে দেখা যায় যে, নাইট্রোজেন ও কার্বনের যোজনী যথাক্রমে ৩ ও ৪। কিছু মৌল আছে যারা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয় না, কিন্তু তারা হাইড্রোজেনকে বিভিন্ন যৌগ হতে অপসারণ করে তার স্থান

দখল করে। এ সকল মৌলের একটি পরমাণু হাইড্রোজেনের কয়টি পরমাণুকে অপসারিত করে, তা দ্বারা সেই মৌলের যোজনী জানা যায়। যেমন : জিংকের পরমাণু সালফিউরিক এসিডের সহিত বিক্রিয়ার সময় তা হতে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে প্রতিস্থাপিত করে :



যেহেতু জিংকের একটি পরমাণু হাইড্রোজেনের দুইটি পরমাণুর সমতুল্য, সুতরাং জিংকের যোজনী দুই।

কিছু মৌল হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয় না, অন্য যৌগ হতে হাইড্রোজেনকে সরাসরি অপসারিত করতে পারে না। কিন্তু তারা হাইড্রোজেনের সমতুল্য অন্যান্য মৌল, যেমন ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়। এ সকল মৌলের একটি পরমাণু ক্লোরিন (অথবা সমতুল্য অন্য মৌল)—এর যতটি পরমাণুর সাথে সংযুক্ত হয় তা সেই মৌলের যোজনী। যেমন : গোল্ড হাইড্রোজেনের সাথে সংযুক্ত হয় না এবং অন্য যৌগ হতে হাইড্রোজেনকে সরাসরি অপসারণও করতে পারে না। কিন্তু গোল্ডের একটি পরমাণু ক্লোরিনের তিনটি পরমাণুর সাথে সংযুক্ত হয়ে AuCl_3 যৌগ গঠন করে। অতএব, গোল্ড—এর যোজনী তিন।

৪.১১ যোজনীর সংজ্ঞা

কোনো মৌলের একটি পরমাণু হাইড্রোজেন অথবা তার সমতুল্য অন্য মৌলের যত সংখ্যক পরমাণুর সাথে সংযুক্ত হয় অথবা কোনো যৌগ হতে হাইড্রোজেনের যত সংখ্যক পরমাণু প্রতিস্থাপিত করতে পারে সেই সংখ্যাকে সেই মৌলের যোজনী বলে।

যে সকল মৌলের যোজনী এক, সে সকল মৌলকে একযোজী মৌল বলা হয়। যেমন হাইড্রোজেন, ক্লোরিন, ফ্লোরিন, সোডিয়াম প্রভৃতি। যে সকল মৌলের যোজনী দুই, তাদেরকে দ্বিযোজী মৌল বলা হয়। যেমন : অক্সিজেন, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম। একইভাবে ত্রিযোজী, চতুর্যোজী মৌলসমূহ সংজ্ঞায়িত করা হয়।

৪.১২ পরিবর্তনশীল যোজনী (Variable valency)

কোনো কোনো মৌলের যোজনী অবস্থাভেদে বিভিন্ন হয়। যে মৌলের একাধিক যোজনী আছে, তার যোজনীকে পরিবর্তনশীল যোজনী বলা হয়। যেমন :

(১) আয়রনের দুই ধরনের যৌগ আছে। এক ধরনের যৌগে আয়রনের যোজনী ২, এ যৌগসমূহকে ফেরাস যৌগ বলা হয়। অন্য ধরনের যৌগে আয়রনের যোজনী ৩, এ যৌগসমূহকে ফেরিক যৌগ বলা হয়।

যেমন : FeCl_2 = ফেরাস ক্লোরাইড (আয়রনের যোজনী ২)

FeCl_3 = ফেরিক ক্লোরাইড (আয়রনের যোজনী ৩)

ধাতুসমূহের ক্ষেত্রে নিম্নতম যোজনী অবস্থাকে ‘আস’ এবং উচ্চতর যোজনী অবস্থাকে ‘ইক’ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। আধুনিক নিয়মে এধরনের যৌগের নাম লেখার সময় যোজনীকে রোমান হরফে প্রথম বন্ধনীর ভিতর লেখা হয়। যেমন :

FeCl_2 = আয়রন (II) ক্লোরাইড;

FeCl_3 = আয়রন (III) ক্লোরাইড।

পরিবর্তনশীল যোজনীর অনেক উদাহরণ বিদ্যমান। যেমন : ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড (PCl_3) এবং ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড (PCl_5)—এ ফসফরাসের যোজনী যথাক্রমে ৩ ও ৫। হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) এবং সালফার ট্রাইঅক্সাইড (SO_3)—এ সালফারের এর যোজনী যথাক্রমে ২, ৪ ও ৬।

৪.১৩ সক্রিয় যোজনী ও সুস্থ যোজনী

কোনো যৌগে মৌলের কার্যকরী যোজনীকে সক্রিয় যোজনী বলা হয়। যেমন : CO_2 —এ কার্বনের সক্রিয় যোজনী ৪।

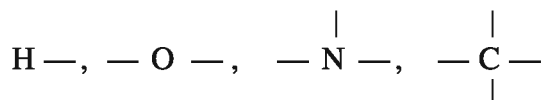
কোনো মৌলের সর্বোচ্চ যোজনী ও কোনো যৌগে মৌলটির সক্রিয় যোজনীর মধ্যে পার্থক্যকে সেই যৌগে সেই মৌলের সুস্থ যোজনী বলা হয়। যেমন : কার্বনের সর্বোচ্চ যোজনী ৪; কার্বন মনোক্সাইডে (CO) কার্বনের সক্রিয় যোজনী ২।

সর্বোচ্চ যোজনী এবং সক্রিয় যোজনীর পার্থক্য $4-2 = 2$ । ২ কে এ যৌগে কার্বনের সুস্থ যোজনী বলা হয়। ফসফরাসের সর্বোচ্চ যোজনী ৫; ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইডে (PCl_3) ফসফরাসের যোজনী ৩। সর্বোচ্চ যোজনী ও সক্রিয় যোজনীর পার্থক্য $5-3 = 2$; ২ কে PCl_3 যৌগে ফসফরাসের সুস্থ যোজনী বলা হয়।

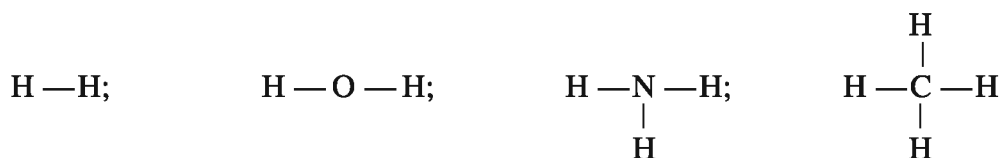
৪.১৪ গাঠনিক সংকেত (Structural formula)

যৌগের আণবিক সংকেত হতে জানা যায় সেই যৌগের একটি অণুতে কী কী মৌলের কয়টি পরমাণু আছে; কিন্তু কোন পরমাণুর সাথে কোন পরমাণু সংযুক্ত তা বুঝা যায় না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য গাঠনিক সংকেত ব্যবহৃত হয়। কোনো বস্তুর অণুতে তার উপাদান পরমাণুসমূহ পরস্পরের সাথে কীভাবে সংযুক্ত আছে, তা দেখানোর জন্য যে সংকেত ব্যবহৃত হয়, তাকে বস্তুটির গাঠনিক সংকেত বলা হয়।

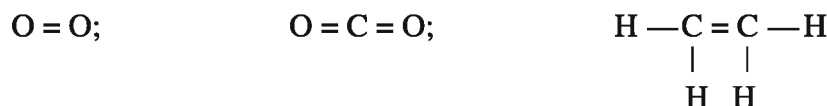
এ উদ্দেশ্যে মৌলের প্রতীকের পাশে মৌলের যোজনীর সমান সংখ্যক ক্ষুদ্র রেখা স্থাপন করা হয়। এ সকল ক্ষুদ্র রেখাকে বন্ধন বলা হয়। যেমন : একযোজী হাইড্রোজেন, দ্বিযোজী অক্সিজেন, ত্রিযোজী নাইট্রোজেন ও চতুর্যোজী কার্বন নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায় :



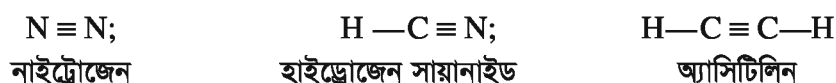
যখন বিভিন্ন পরমাণু পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে অণু গঠন করে, তখন তাদের যোজনী রেখাসমূহ একটির সাথে একটি সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ একটি পরমাণুর একটি রেখা অন্য পরমাণুর একটি রেখার সাথে সংযুক্ত হয়ে একটি একক বন্ধন সৃষ্টি হয়। যেমন : হাইড্রোজেন গ্যাস, পানি, অ্যামোনিয়া ও মিথেনের গঠন নিম্নরূপ :



অবশ্য একটি পরমাণুর মাত্র একটি রেখা অন্য পরমাণুর একটি রেখার সাথে যুক্ত হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। একটি পরমাণুর দুইটি রেখা অন্য পরমাণুর দুইটি রেখার সাথে যুক্ত হতে পারে, সেক্ষেত্রে দ্বিবন্ধন সৃষ্টি হয়। যেমন : অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ও ইথিলিনের গাঠনিক সংকেত নিম্নরূপ :

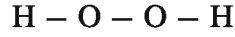


যখন একটি পরমাণুর তিনটি রেখা বা যোজনী অন্য পরমাণুর তিনটি রেখা বা যোজনীর সাথে যুক্ত হয়, তখন ত্রিবন্ধন সৃষ্টি হয়। নাইট্রোজেন গ্যাস, হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাস এবং অ্যাসিটিলিনের গাঠনিক সংকেত নিম্নরূপ :



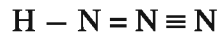
শেষ দুইটি উদাহরণ হতে স্পষ্ট হয় যে, একই অণুতে বিভিন্ন মাত্রার বন্ধন থাকতে পারে।

অনেক যৌগের ক্ষেত্রে আণবিক সংকেত উদ্ভট মনে হয়, কিন্তু গাঠনিক সংকেত লিখলে বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন মৌলের যোজনী ঠিকই আছে, গঠনের কারণে এ ধরনের আণবিক সংকেত হয়েছে। যেমন : হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের (H_2O_2) আণবিক সংকেত হতে মনে হয় যে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যোজনী সমান; গাঠনিক সংকেত হতে বুঝা যায় যে প্রকৃতপক্ষে তা নয়; একযোজী হাইড্রোজেন এবং দ্বিযোজী অক্সিজেন থেকেই এ যৌগ গঠিত হয়েছে।



হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড

হাইড্রোজেনিক এসিড (N_3H)-এর আণবিক সংকেত হতে মনে হয় নাইট্রোজেনের যোজনী 1, হাইড্রোজেনের 3। প্রকৃতপক্ষে এ যৌগের গাঠনিক সংকেত হতে বুঝা যায় যে, হাইড্রোজেনের যোজনী 1, একটি নাইট্রোজেন পরমাণুর যোজনী 3, এবং অন্যটির যোজনী 5।

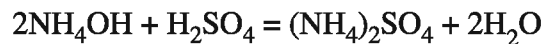
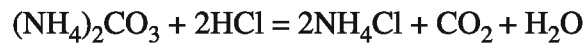
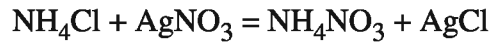


হাইড্রোজেনিক এসিড

৪.১৫ যৌগমূলকসমূহ ও তাদের যোজনী (Radicals and their valencies)

অনেক সময় দুই বা ততোধিক মৌলের একাধিক পরমাণু একত্রে সংযুক্ত হয়ে একটি গ্রুপ গঠন করে যা বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সময় অপরিবর্তিত থেকে একটি মাত্র পরমাণুর ন্যায় আচরণ করে, ঐ গ্রুপটিকে যৌগমূলক বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ NH_4^+ একটি যৌগমূলক, এর নাম অ্যামোনিয়াম। এটি বিভিন্ন বিক্রিয়ায় অপরিবর্তিত থাকে, যেমন :



অ্যামোনিয়াম গ্রুপ একযোজী ধাতুসমূহ যেমন সোডিয়ামের ন্যায় আচরণ করে এবং অনুরূপ যৌগ গঠন করে।

উদাহরণ :

$NaCl$ = সোডিয়াম ক্লোরাইড;

NH_4Cl = অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড

$NaOH$ = সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড;

NH_4OH = অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড

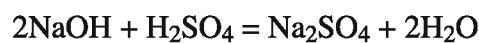
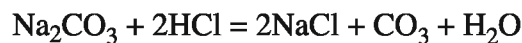
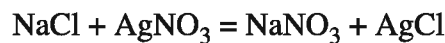
Na_2SO_4 = সোডিয়াম সালফেট;

$(NH_4)_2SO_4$ = অ্যামোনিয়াম সালফেট

$NaNO_3$ = সোডিয়াম নাইট্রেট;

NH_4NO_3 = অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট।

আরো উল্লেখ করা যায় যে, ইতিপূর্বে উল্লেখিত বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম যৌগের অনুরূপ সোডিয়াম যৌগ ব্যবহার করলে একই ধরনের বিক্রিয়া হয়। যেমন :



অবশ্য কোনো কোনো বিক্রিয়া একইরূপ নয়।

অন্যান্য যৌগমূলকের উদাহরণ হচ্ছে

নাইট্রেট NO_3^{1-} ; কার্বনেট CO_3^{2-} ; ফসফেট PO_4^{3-} ; হাইড্রোক্সিল OH^{1-} ; সালফাইট SO_3^{2-} প্রভৃতি।

উল্লেখ্য যে, অ্যামোনিয়াম মূলক ধাতুর ন্যায় আচরণ করে এবং এ কারণে এটি ধনাত্মক যৌগমূলক। উল্লেখিত অন্যান্য মূলক অধাতুর ন্যায় আচরণ করে এবং এ কারণে এরা ঋণাত্মক যৌগমূলক।

যেহেতু যৌগমূলকসমূহ একটি পরমাণুর ন্যায় আচরণ করে তাই তাদের যোজনী বিদ্যমান। অ্যামোনিয়াম, নাইট্রেট, হাইড্রোক্সিল প্রভৃতি যৌগমূলকের যোজনী এক। সালফেট, সালফাইট, কার্বনেট প্রভৃতি যৌগমূলকের যোজনী ২। ফসফেট মূলকের যোজনী ৩। সারণি ৪.১-এ কিছু সাধারণ মূলকের যোজনী উল্লিখিত হয়েছে। ছাত্রদেরকে এ তালিকা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কেননা যোজনী জানা না থাকলে বিভিন্ন যৌগের সংকেত লেখা সম্ভব নয়।

৪.১৬ মৌল বা যৌগমূলকসমূহের যোজনী হতে যৌগের আণবিক সংকেত লিখন

কোনো যৌগ গঠনকারী মৌল বা মূলকসমূহের যোজনী হতে সহজেই যৌগের আণবিক সংকেত লেখা যায়। যৌগের সংকেত লেখার জন্য নিম্নোক্ত নিয়মদ্বয় ব্যবহার করা হয় :

১) A ও B মৌল বা মূলকসমূহের যোজনী যথাক্রমে x ও y হলে এবং x ও y উভয়েই কোনো সাধারণ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য না হলে যৌগের সংকেত হবে A_yB_x যেমন :

ক) ক্যালসিয়ামের যোজনী ২, ক্লোরিনের যোজনী ১। সুতরাং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত CaCl_2 ।

খ) ম্যাগনেসিয়ামের যোজনী ২, ফসফেটের যোজনী ৩। সুতরাং ম্যাগনেসিয়াম ফসফেটের সংকেত $\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$ ।
উল্লেখ্য যে, কোনো মূলক একাধিক সংখ্যক থাকলে আগে পিছে প্রথম বন্ধনী দিয়ে তারপর সংখ্যা লিখতে হবে।

গ) ফেরিক আয়রনের যোজনী ৩, সালফেটের যোজনী ২। সুতরাং ফেরিক সালফেটের সংকেত $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ ।

২) A ও B মৌল বা যৌগমূলকসমূহের যোজনী যথাক্রমে x ও y হলে এবং x ও y কোনো সাধারণ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হলে উভয়কে তাদের গ. সা. গু. দ্বারা ভাগ করে ভাগফল a ও b পাওয়া গেলে যৌগের সংকেত হবে A_bB_a । যেমন :

ক) অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী ৩, ফসফেট যৌগমূলকের যোজনী ৩। এ সংখ্যাদ্বয়কে তাদের গ. সা. গু. ৩ দ্বারা ভাগ করলে যথাক্রমে ১ ও ১ পাওয়া যায়। অতএব অ্যালুমিনিয়াম ফসফেটের সংকেত AlPO_4 ।

খ) ফেরাস আয়রনের যোজনী ২, সালফেট যৌগমূলকের যোজনী ২। এ সংখ্যাদ্বয়কে তাদের গ. সা. গু. দ্বারা ভাগ করে যথাক্রমে ১ ও ১ পাওয়া যায়।

অতএব, ফেরাস সালফেটের সংকেত FeSO_4 ।

গ) কার্বনের যোজনী ৪, সালফারের যোজনী ২। এ সংখ্যাদ্বয়কে গ. সা. গু. ২ দ্বারা ভাগ করে পাওয়া যায় যথাক্রমে ২ ও ১। অতএব, কার্বন ও সালফার সমন্বয়ে গঠিত যৌগের সংকেত CS_2 ।

ঘ) বোরন ও নাইট্রোজেন উভয়ের যোজনী ৩। সুতরাং উভয়ক্ষেত্রে ৩ দ্বারা ভাগ করে ১ পাওয়া যায়। অতএব, বোরন নাইট্রাইডের সংকেত BN ।

৪.১ বিভিন্ন মৌলের যোজনী

একযোজী	দ্বিযোজী	ত্রিযোজী	চতুর্যোজী	পঞ্চযোজী	ষড়যোজী
হাইড্রোজেন, H	অক্সিজেন, O	বোরন, B	কার্বন, C	নাইট্রোজেন, N	সালফার, S
ফ্লোরিন, F	সালফার, S	নাইট্রোজেন, N	সিলিকন, Si	ফসফরাস, P	
ক্লোরিন, Cl		ফসফরাস, P	সালফার, S		
ব্রোমিন, Br					
আয়োডিন, I					
	ম্যাগনেসিয়াম, Mg	অ্যালুমিনিয়াম, Al	টিন (ইক), Sn		
সোডিয়াম, Na	ক্যালসিয়াম, Ca		লেড (ইক), Pb		
পটাসিয়াম, K					
কপার (আস), Cu		ক্রোমিয়াম, Cr			
	জিংক, Zn				
		আয়রন (ইক), Fe			
সিলভার, Ag					
	কপার (ইক), Cu				
	আয়রন (আস), Fe				
	টিন (আস), Sn				
	লেড (আস), Pb				
	বেরিয়াম, Ba				

৪.২ বিভিন্ন যৌগমূলকসমূহের যোজনী

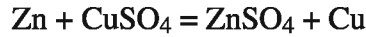
একযোজী	দ্বিযোজী	ত্রিযোজী
অ্যামোনিয়াম, NH_4^+	সালফাইট, SO_3^{2-}	ফসফেট, PO_4^{3-}
নাইট্রেট, NO_3^-	সালফেট, SO_4^{2-}	
	থাইোসালফেট, $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	
হাইড্রোক্সাইড, OH^-	ক্রোমেট, CrO_4^{2-}	
নাইট্রাইট, NO_2^-		
হাইড্রোজেন সালফেট, HSO_4^-	ডাইক্রোমেট, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	
সায়ানাইড, CN^-	সিলিকেট, SiO_3^{2-}	

৪.১৭ রাসায়নিক সমীকরণ (Chemical equations)

রাসায়নিক সমীকরণের সংজ্ঞা

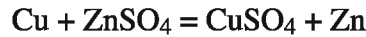
একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যা ঘটে তা সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহের সংকেত ও অন্যান্য সংকেতের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশের পদ্ধতিকে ঐ বিক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণ বলা হয়।

যেমন : জিংক কপার সালফেটের সাথে বিক্রিয়া করে জিংক সালফেট ও কপার উৎপন্ন করে। এ বিক্রিয়াকে নিম্নোক্ত সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় :



৪.১৮ সমীকরণ লেখার নিয়ম

(১) একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যা ঘটে তাই সমীকরণে দেখাতে হবে। যেমন : সাধারণ অবস্থায় কপার জিংক সালফেটের সাথে বিক্রিয়া করে কপার সালফেট ও জিংক উৎপন্ন করে না। সুতরাং নিম্নোক্ত সমীকরণ লেখা যাবে না।



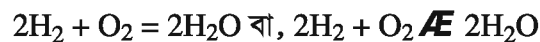
(২) যে সকল বস্তু কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, তাদেরকে বিক্রিয়ক (reactants) বলা হয় এবং বিক্রিয়ার ফলে যা উৎপন্ন হয়, তাদেরকে উৎপাদ বা উৎপন্ন দ্রব্য (products) বলা হয়। সমীকরণ লেখার সময় বাম দিকে বিক্রিয়কসমূহ এবং ডান দিকে উৎপাদসমূহ লিখতে হবে।

(৩) বিক্রিয়ক ও উৎপাদসমূহ লেখার সময় তাদের আণবিক সংকেত ব্যবহার করা হয়। অবশ্য যদি কোনো পরমাণু বা আয়ন সরাসরি বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে বা উৎপন্ন হয় তবে তাদের সংকেত ব্যবহার করতে হবে। সমীকরণের কোনো পার্শ্বে একাধিক বস্তু থাকলে তাদের মধ্যে যোগ চিহ্ন (+) বসাতে হবে।

(৪) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোনো মৌলের পরমাণু সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না। সুতরাং সমীকরণের উভয় দিকে প্রত্যেক মৌলের পরমাণু সংখ্যা সমান হতে হবে।

অর্থাৎ, সমীকরণে অবশ্যই সমতা সাধন (balance) করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বিক্রিয়ক ও উৎপাদ অণুসমূহের ক্ষুদ্রতম অখণ্ড সংখ্যা নিয়ে হিসাব করতে হবে।

(৫) যখন সমীকরণ সমতা প্রাপ্ত হয়, তখন বিক্রিয়ক ও উৎপাদসমূহের মাঝখানে সমান চিহ্ন বা তীর চিহ্ন (= বা \rightleftharpoons) দেওয়া হয়। যেমন -



৪.১৯ সমীকরণের সমতাসাধনের প্রক্রিয়া

সমতাসাধনের প্রক্রিয়া কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হল :

উদাহরণ : ১) উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প লোহার গুঁড়ার সাথে বিক্রিয়া করে ফেরাসোফেরিক অক্সাইড ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াটির সমীকরণ লিখ।

সমাধান : জলীয় বাষ্পের সংকেত H_2O , লোহার সংকেত Fe , ফেরাসোফেরিক অক্সাইডের সংকেত Fe_3O_4 এবং হাইড্রোজেনের আণবিক সংকেত H_2 ।

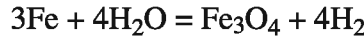
সুতরাং বিক্রিয়কসমূহ বাম পার্শ্বে এবং উৎপাদসমূহকে ডান পার্শ্বে রেখে নিম্নোক্ত সমীকরণ পাওয়া যায় :



এ সমীকরণের সমতা বিধান করা হয়নি। এ উদ্দেশ্যে প্রথমেই সবচেয়ে জটিল অণুর দিকে নজর দিতে হবে। যেহেতু Fe_3O_4 অণুতে তিনটি আয়রন পরমাণু এবং চারটি অক্সিজেন পরমাণু বিদ্যমান, সেহেতু বামদিকে তিনটি আয়রন পরমাণু ও চারটি পানি অণু নিতে হবে।



সমীকরণের কিছু অংশ সমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। এখনও বামদিকে আট (৪)টি হাইড্রোজেন পরমাণু বিদ্যমান, কিন্তু ডানদিকে দুইটি মাত্র হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। সুতরাং ডানদিকে চারটি হাইড্রোজেন অণু নিলে প্রত্যেক মৌলের পরমাণু সংখ্যা উভয় দিকে সমান হয়। এটিই সঠিক সমীকরণ।



২) অ্যালুমিনিয়াম পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। বিক্রিয়ার সমীকরণ লিখ।

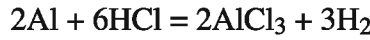
সমাধান : বিক্রিয়কসমূহের আণবিক সংকেত বামদিকে এবং উৎপাদসমূহের আণবিক সংকেত ডানদিকে বসিয়ে পাওয়া যায়—



এ সমীকরণের সর্ববৃহৎ সংকেত AlCl_3 -এ তিনটি ক্লোরিন পরমাণু বিদ্যমান। অপরদিকে বামদিকে HCl -এ একটি ক্লোরিন আছে। বামদিকে তিনটি HCl অণু নিলে পাওয়া যায়।



পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত নির্ণয়ের জন্য সমগ্র সমীকরণকে ২ দ্বারা গুণ করে সঠিক সমীকরণ পাওয়া যায়।



৪.২০ রাসায়নিক সমীকরণের তাৎপর্য

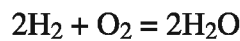
প্রতিটি রাসায়নিক সমীকরণের দুই ধরনের তাৎপর্য আছে—

(১) গুণগত তাৎপর্য ও (২) পরিমাণগত তাৎপর্য।

গুণগত তাৎপর্য : একটি সমীকরণ বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক এবং উৎপাদসমূহের নাম প্রকাশ করে।

পরিমাণগত তাৎপর্য : একটি সমীকরণ হতে জানা যায় প্রতিটি বিক্রিয়কের কয়টি অণু পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে কোনো উৎপাদের কয়টি অণু উৎপন্ন করে। তা হতে এ সকল দ্রব্যের আনুপাতিক ভর এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে আয়তনও জানা যায়।

যেমন নিম্নোক্ত সমীকরণটি বিবেচনা করা যায়—



এ সমীকরণের গুণগত তাৎপর্য হচ্ছে যে, তা হতে জানা যায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে পানি উৎপন্ন করে। পরিমাণগত তাৎপর্য হচ্ছে যে,

১) দুই অণু হাইড্রোজেন এক অণু অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে দুই অণু পানি উৎপন্ন করে।

২) হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও পানির আণবিক ভর যথাক্রমে ২, ৩২ ও ১৮। সুতরাং উক্ত সমীকরণ হতে জানা যায় যে $2 \times 2 = 4\text{g}$ হাইড্রোজেন, 32g অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে $2 \times 18 = 36\text{g}$ পানি উৎপন্ন করে। শুধু গ্রাম হিসেবে নয়, একই অনুপাতে অর্থাৎ যে কোনো পরিমাণ হাইড্রোজেন তার ৪ গুণ ভরের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ৯ গুণ ভরের পানি উৎপন্ন করবে।

৩) বিক্রিয়ক ও উৎপাদ গ্যাস হওয়ায় অন্যভাবে বলা যায় যে, দুই আয়তনের হাইড্রোজেন গ্যাস এক আয়তনের অক্সিজেন গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করে দুই আয়তন জলীয় বাষ্প বা স্টিম উৎপন্ন করে।

৪) দুই মোল হাইড্রোজেন এক মোল অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে দুই মোল পানি উৎপন্ন করে।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

প্রতীক : কোনো মৌলের পূর্ণ নামের সংক্ষিপ্ত প্রকাশকে ঐ মৌলের প্রতীক বলা হয়। কোনো কোনো মৌলের প্রতীক এক অক্ষরে লেখা হয়। সেক্ষেত্রে তা ইংরেজি বড় হাতের অক্ষরে লিখতে হয়। অন্যান্য মৌলের প্রতীক দুই অক্ষরে লেখা হয়। সেক্ষেত্রে প্রথম অক্ষর ইংরেজিতে বড় হাতের এবং দ্বিতীয় অক্ষর ইংরেজিতে ছোট হাতের হয়। বিভিন্ন মৌলের প্রতীক আন্তর্জাতিকভাবে নির্দিষ্ট করা।

সংকেত : কোনো বস্তুর অণুর সংক্ষিপ্ত প্রকাশকে বস্তুর আণবিক সংকেত বা শুধু সংকেত বলা হয়।

সংযুতি : কোনো যৌগের সংযুতি বলতে তাতে বিদ্যমান মৌলসমূহ কী অনুপাতে আছে তা বুঝায়। সাধারণত ভর হিসেবে কোনো মৌলের পরিমাণ শতকরা কত ভাগ তাই প্রকাশ করা হয়।

স্থূল সংকেত : কোনো যৌগের অণুতে বিদ্যমান মৌলসমূহের পরমাণুগুলোর সংখ্যা যে ক্ষুদ্রতম পূর্ণসংখ্যা অনুপাতে আছে, তার সংক্ষিপ্ত প্রকাশকে যৌগের স্থূল সংকেত বলা হয়। স্থূল সংকেত হতে অণুতে কোনো মৌলের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায় না। কিন্তু আণবিক সংকেত হতে জানা যায়।

যোজনী : কোনো মৌলের একটি পরমাণু হাইড্রোজেন বা এর সমতুল্য অন্য মৌলের যত সংখ্যক পরমাণুর সাথে সংযুক্ত হয়, অথবা কোনো যৌগ হতে হাইড্রোজেনের যত সংখ্যক পরমাণু প্রতিস্থাপিত করতে পারে সেই সংখ্যাকে সেই মৌলের যোজনী বলা হয়।

পরিবর্তনশীল যোজনী : যে মৌলের একাধিক যোজনী বিদ্যমান, তার যোজনীকে পরিবর্তনশীল যোজনী বলা হয়।

সক্রিয় যোজনী : কোনো যৌগে কোনো মৌলের যে যোজনী কার্যকর অবস্থায় থাকে, সেই যোজনীকে সেই যৌগে সেই মৌলের সক্রিয় যোজনী বলা হয়।

সুস্ত যোজনী : কোনো মৌলের সর্বোচ্চ যোজনী এবং কোনো যৌগে মৌলটির সক্রিয় যোজনীর মধ্যে পার্থক্যকে সেই যৌগে সেই মৌলের সুস্ত যোজনী বলা হয়।

গাঠনিক সংকেত : কোনো বস্তুর অণুতে তার উপাদান পরমাণুসমূহ পরস্পরের সাথে কীভাবে যুক্ত আছে, তা দেখানোর জন্য যে সংকেত ব্যবহৃত হয়, তাকে বস্তুর গাঠনিক সংকেত বলা হয়।

যৌগমূলক : অনেক সময় দুই বা ততোধিক মৌলের একাধিক পরমাণু একত্রে সংযুক্ত হয়ে একটি গ্রুপ গঠন করে, যা বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সময় অপরিবর্তিত থেকে পরমাণুর ন্যায় আচরণ করে, ঐ গুলোকে যৌগমূলক বলা হয়।

রাসায়নিক সমীকরণ : একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যা ঘটে, তা সর্বাঙ্গীর্ণ বস্তুসমূহের সংকেত ও অন্যান্য সংকেতের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশের পদ্ধতিকে ঐ বিক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণ বলা হয়।

রাসায়নিক সমীকরণ লেখার নিয়মাবলি

- (১) একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যা ঘটে সমীকরণে তাই উপস্থাপন করতে হবে।
- (২) সমীকরণের বাম দিকে বিক্রিয়কসমূহের সংকেত এবং ডান দিকে উৎপাদসমূহের সংকেত লিখতে হবে। কোনো পার্শ্বে একাধিক বস্তু থাকলে তাদের মধ্যে যোগ চিহ্ন দিতে হবে।
- (৩) ডান ও বাম দিকে যেন প্রতিটি মৌলের পরমাণু সংখ্যা সমান থাকে, সেদিকে লক্ষ রেখে বিভিন্ন বস্তুর অণু সংখ্যা লিখতে হবে। এ সংখ্যাসমূহ অখণ্ড সংখ্যা হতে হবে।

অনুশীলনী

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন :

১. 'টিন'-এর প্রতীক কোনটি?

- | | |
|-------|-------|
| ক. Al | খ. Cr |
| গ. Sn | ঘ. Cu |

২. SO_2 -এ সালফারের যোজনী কত?

- | | |
|------|------|
| ক. 2 | খ. 3 |
| গ. 4 | ঘ. 6 |

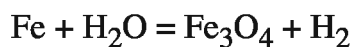
৩. সুষ্ঠু যোজনী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জানা প্রয়োজন-

- মৌলের সর্বোচ্চ যোজনী
- যৌগে মৌলটির সক্রিয় যোজনী
- মৌলের সর্বনিম্ন যোজনী।

কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের বিক্রিয়াটি ব্যবহার করে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।



৪. প্রদত্ত সমীকরণের সমতা বিধানের কোন সমন্বয়টি প্রযোজ্য হবে-

- | | |
|---------------|---------------|
| ক. 1, 2 এবং 2 | খ. 1, 3 এবং 3 |
| গ. 3, 4 এবং 4 | ঘ. 4, 5 এবং 5 |

৫. Fe_3O_4 এ Fe-এর যোজনী কত?

- | | |
|------|------|
| ক. 2 | খ. 3 |
| গ. 4 | ঘ. 6 |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

সালফিউরিক এসিডের সংকেত (H_2SO_4) লেখার জন্য হাইড্রোজেন, সালফার ও অক্সিজেনের প্রতীক দরকার হয়। সালফিউরিক এসিডে সালফার মৌলের সক্রিয় যোজনী এবং এর সর্বোচ্চ যোজনী থেকে সালফারের সুপ্ত যোজনী হিসাব করা হয়। তা ছাড়া এ যৌগের স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেত নির্ণয়ের জন্য উপাদান মৌলগুলোর শতকরা সংযুতি ও এর আণবিক ভর জানা প্রয়োজন।

- ক. সালফিউরিক এসিডের সংকেত লিখ?
- খ. প্রতীক ও সংকেতের মধ্যে দুটি প্রধান পার্থক্য লিখ?
- গ. সালফিউরিক এসিডে সালফারের সুপ্ত যোজনী নির্ণয় কর?
- ঘ. উপাদান মৌলের শতকরা সংযুতি জানা ছাড়া সালফিউরিক এসিডের আণবিক সংকেত নির্ণয় করা সম্ভব হবে কিনা তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

পরমাণুর গঠন

বিষয়বস্তু : মৌলিক কণিকা, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পারমাণবিক সংখ্যা, আইসোটোপ, রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল, বোরের পরমাণু মডেল, পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস।

৫.১ মৌলিক কণিকা (Fundamental particles)

আধুনিক রসায়নের ভিত্তি বলে পরিচিত ডাল্টনের পরমাণুবাদে পরমাণুকে অবিভাজ্য ধরা হয়েছে। কিন্তু এ তত্ত্ব এখন অচল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রমাণিত হয় যে, পরমাণুকে আরো সূক্ষ্ম কণায় বিভক্ত করা যায়। যে সব সূক্ষ্ম কণিকা দ্বারা পরমাণু গঠিত, তাদেরকে মৌলিক কণিকা বলা হয়। এরা হচ্ছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। এ তিনটি কণিকা বিভিন্ন সংখ্যায় একত্রিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু সৃষ্টি করে। এ কারণে এ তিনটি মৌলিক কণিকা সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন।

এখানে উল্লেখ্য যে, মৌলিক কণিকাগুলোর আধান এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভর এত সামান্য যে, কাজের সুবিধার জন্য বেশির ভাগ সময় এদের আসল মানের (absolute value) পরিবর্তে তুলনামূলক বা আপেক্ষিক মান^১ (relative value) ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ সময় আপেক্ষিক ভর এবং আধানকে শুধু ভর এবং আধান বলে উল্লেখ করা হয়।

৫.২ মৌলিক কণিকাসমূহ

১। **ইলেকট্রন (Electron) :** পরমাণুর ক্ষুদ্রতম কণিকা ইলেকট্রন। একটি ইলেকট্রনের আসল ভর অতি সামান্য^২। একটি ইলেকট্রন একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর তুলনায় 1838 গুণ হালকা। ইলেকট্রনের আধান ঋণাত্মক, এর পরিমাণও অতি সামান্য। ক্ষুদ্রতম বলে পরিমাণটিকে আধানের একক হিসেবে ধরা হয়েছে। আপেক্ষিকভাবে এই আধানকে -1 ধরা হয়। ইলেকট্রনের সংকেত e^- ।

২। **প্রোটন (Proton) :** একটি হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন সরিয়ে নিলে যা থাকে তা একটি প্রোটন। এ কারণে প্রোটনের সংকেত H^+ । প্রোটনের আধান ধনাত্মক, এর পরিমাণ ইলেকট্রনের আধানের সমান। আপেক্ষিকভাবে এই আধানকে $+1$ ধরা হয়। প্রোটনের ভর প্রায় হাইড্রোজেন ভরের সমান^৩। আপেক্ষিকভাবে এই ভরকে 1 ধরা হয়। প্রোটনের আরেকটি সংকেত P ।

৩। **নিউট্রন (Neutron) :** নিউট্রনের কোনো আধান নেই। আধানবিহীন (neutral) হওয়ার কারণেই এর এ নামকরণ করা হয়। ১৯৩২ সালে চ্যাডউইক (James Chadwick) নিউট্রন আবিষ্কার করেন। এর আসল ভর^৪ প্রোটন অপেক্ষা সামান্য বেশি হলেও আপেক্ষিকভাবে তা 1 ধরা হয়। এর প্রতীক হচ্ছে n ।

৫.৩ পরমাণুর গঠন (Structure of Atoms)

প্রশ্ন হচ্ছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন পরমাণুর ভেতরে কীভাবে থাকে। ১৯১১ সালে রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford) প্রমাণ করেন যে, পরমাণুর একটি কেন্দ্র আছে, যার নাম তিনি রাখেন নিউক্লিয়াস (nucleus)। এ নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রন অবস্থান করে। সুতরাং পরমাণুর সকল ধনাত্মক আধান এবং প্রায় সম্পূর্ণ ভরই নিউক্লিয়াসে কেন্দ্রীভূত। ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের বাইরে থাকে এবং তার চারিদিকে ভ্রমণ করে। আমরা জানি পরমাণু

১. একটি পাথরের আসল ভর ৪০ কেজি এবং অন্য একটির ৮০ কেজি। প্রথম ভরকে প্রমাণ (standard) ভর ধরলে দ্বিতীয় পাথরের তুলনামূলক বা আপেক্ষিক ভর ২ হয়। আপেক্ষিক মানের কোনো একক থাকে না। কারণ ভাগ করার সময় উপর ও নিচের একক কাটা যায়। ভাগফল হয় শুধু একটি সংখ্যা।

২. ইলেকট্রনের আসল ভর ও আধান যথাক্রমে $9.11 \times 10^{-28} \text{ g}$ ও $-1.60 \times 10^{-19} \text{ Coulomb}$ ।

অতিশয় ক্ষুদ্র। নিউক্লিয়াস পরমাণুর তুলনায় আরো অনেক ক্ষুদ্র। একটি পরমাণুর ব্যাস 10^{-8} cm এবং একটি নিউক্লিয়াসের ব্যাস 10^{-15} m। অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ পরমাণুর ব্যাসার্ধের এক লক্ষ ভাগ ছোট।

পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic number) : নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যাকে মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয়। একে Z দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যে কোনো মৌলের স্বাতন্ত্র্য এই সংখ্যার ওপর নির্ভর করে। এটি যে কোনো মৌলের মৌলিক ধর্ম (fundamental property)। কার্বনের পরমাণুতে ৬টি প্রোটন আছে, সুতরাং কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা ৬। অক্সিজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ৮টি প্রোটন আছে, সুতরাং অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৮। একইভাবে সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ১১, ম্যাগনেসিয়ামের ১২।

পরমাণু বৈদ্যুতিকভাবে নিরপেক্ষ, তাই একটি পরমাণুতে যতটি প্রোটন আছে, ততটি ইলেকট্রনও আছে। অর্থাৎ পরমাণুতে পারমাণবিক সংখ্যার সমান সংখ্যক ইলেকট্রন আছে। অবশ্য পরমাণু হতে সহজে ইলেকট্রন বের করে আনা যায় এবং বাহির থেকে পরমাণুতে অতিরিক্ত ইলেকট্রন যোগও করা যায়। তখন আর বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ পরমাণু থাকে না; আধানযুক্ত আয়নের সৃষ্টি হয়।

ভর সংখ্যা (Mass number) : নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যাকে একটি পরমাণুর ভর সংখ্যা বলা হয়। ভর সংখ্যাকে A দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ক্লোরিনের একটি পরমাণুতে প্রোটন আছে ১৭টি, নিউট্রন আছে ১৮টি। সুতরাং ক্লোরিন পরমাণুর ভর সংখ্যা ৩৫।

আইসোটোপ (Isotope) : ডাল্টনের মতবাদ অনুসারে, কোনো মৌলের সকল পরমাণুর ভর ও অন্যান্য ধর্ম একই। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয় যে, একই মৌলের পরমাণুর ভর সংখ্যার ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন ভর হতে পারে। বিভিন্ন ভর সংখ্যা বিশিষ্ট একই মৌলের পরমাণুকে ঐ মৌলের আইসোটোপ বলা হয়। আইসোটোপসমূহের রাসায়নিক ধর্ম একই থাকে। হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপ আছে। এদের নাম হাইড্রোজেন, ডিউটেরিয়াম (Deuterium) ও ট্রিটিয়াম (Tritium)। প্রথমটির ভর সংখ্যা ১, দ্বিতীয়টির ২, এবং তৃতীয়টির ৩। বলা বাহুল্য, তিনটিতেই পারমাণবিক সংখ্যা ১। সুতরাং প্রথমটাকে কোনো নিউট্রন নেই, দ্বিতীয়টিতে আছে ১টি এবং তৃতীয়টিতে আছে ২টি।



চিত্র ৫.১ : হাইড্রোজেনের আইসোটোপ (p = proton, n = neutron)

প্রকৃতিতে বিভিন্ন আইসোটোপ বিভিন্ন পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। যেমন এক লক্ষ হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে ৯৯৯৮৫টি থাকে হাইড্রোজেন এবং ১৫টি থাকে ডিউটেরিয়াম পরমাণু। ট্রিটিয়ামের পরিমাণ অতি নগণ্য। ভিন্ন ভর সংখ্যার সাথে আইসোটোপের ভরও ভিন্ন হয়। নিম্নে পরমাণুতে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা নিরূপণের ধারা দেখানো হল :

৫.৪ পারমাণবিক সংখ্যা ও ভর সংখ্যা লেখার নিয়ম

পরমাণুতে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সহজেই বের করা যায়। যদি কোনো পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা Z হয়, তবে সেই পরমাণুতে Z সংখ্যক প্রোটন ও Z সংখ্যক ইলেকট্রন আছে। ভর সংখ্যা A হলে, নিউট্রনের সংখ্যা $A - Z$ । আধানের চিহ্ন অনুসারে ইলেকট্রন যোগ বা বিয়োগ করতে হয়।

৩. প্রোটনের আসল ভর ও আধান যথাক্রমে 1.67×10^{-24} গ্রাম ও 1.60×10^{-19} কুলম্ব। প্রোটনের আসল ভর ও আধানকে প্রমাণ ভর ও আধান ধরা হয়।

৪. নিউট্রনের আসল ভর 1.675×10^{-24} গ্রাম।

কোনো পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা, ভর সংখ্যা, আধানের পরিমাণ এবং কোনো অণু বা আয়নে পরমাণুর সংখ্যা প্রভৃতি দেখানোর রীতি নিম্নরূপ :



এখানে X = মৌলের প্রতীক।

Z = মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা। এটি প্রতীকের বাম পার্শ্বে পাদবিন্দুতে বসে।

A = পরমাণুর ভর সংখ্যা। এটি প্রতীকের বাম পার্শ্বে শীর্ষবিন্দুতে বসে। এটি প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যা। একে নিউক্লিয়ন সংখ্যাও বলা হয়।

m^{\pm} = আধানের পরিমাণ। এটি প্রতীকের ডান পার্শ্বে শীর্ষবিন্দুতে বসে। সংখ্যার পর চিহ্ন দিতে হয়।

সারণি ৫.১ : Z , A এবং $(A-Z)$ এর হিসাব

পরমাণু	পারমাণবিক সংখ্যা Z	ভর সংখ্যা A	পরমাণুতে বিদ্যমান কণিকাসমূহের সংখ্যা		
			প্রোটন (Z)	ইলেকট্রন (Z)	নিউট্রন ($A-Z$)
${}_1^1\text{H}^+$	1	1	1	0	0
${}_1^2\text{H}$	1	2	1	1	1
${}_1^3\text{H}$	1	3	1	1	2
${}_6^{12}\text{C}$	6	12	6	6	6
${}_6^{13}\text{C}$	6	13	6	6	7
${}_8^{16}\text{O}^{2-}$	8	16	8	10	8
${}_8^{17}\text{O}$	8	17	8	8	9
${}_8^{18}\text{O}$	8	18	8	8	10
${}_{11}^{23}\text{Na}^+$	11	23	11	10	12

উদাহরণ

${}_{17}^{35}\text{Cl}^-$ লেখার অর্থ হচ্ছে এ পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা 17, ভর সংখ্যা 35।

Cl^- লেখার অর্থ হচ্ছে এতে একটি ঋণাত্মক আধান বিদ্যমান।

উদাহরণ : একটি সংকেত দেওয়া আছে ${}_8^{16}\text{O}^{2-}$ । এ থেকে তুমি কী বুঝবে?

সমাধান : O হচ্ছে অক্সিজেনের প্রতীক। এর ডানদিকে শীর্ষবিন্দুতে $2-$ থাকায় বুঝা যায় যে, এটি $2-$ আধান বিশিষ্ট একটি অ্যানায়ন।

বাম দিকের পাদবিন্দুতে ৪ লেখা থাকায় বুঝা যায় যে, অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৪। বাম দিকের শীর্ষবিন্দুতে ১৬ লেখা থাকায় বুঝা যায় যে, এ আয়নের প্রত্যেক অক্সিজেন পরমাণুর ভর সংখ্যা ১৬।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সাধারণত প্রয়োজন ছাড়া প্রতীকের সাথে পারমাণবিক সংখ্যা ও ভর সংখ্যা উল্লেখ করা হয় না।

৫.৫ রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল (Rutherford's atom model)

বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠনকে একটি ক্ষুদ্র সৌরজগতের সাথে তুলনা করেন। এ কারণে তাঁর প্রস্তাবিত পরমাণু মডেলকে পরমাণুর সৌর মডেল বলা হয়। এর মূল বক্তব্য হল :

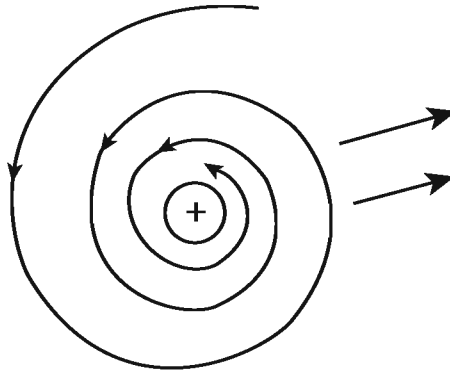
- (১) পরমাণুর কেন্দ্র ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট। এ কেন্দ্র পরমাণুর প্রায় সকল ভর বহন করে। এর নাম নিউক্লিয়াস। পরমাণুর মোট আয়তনের তুলনায় নিউক্লিয়াসের আয়তন অত্যন্ত নগণ্য।
- (২) পরমাণু বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ। অতএব নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক আধানের সমান সংখ্যক ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের বাহিরে অবস্থান করে।
- (৩) সৌরজগতে সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহের মত ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে সর্বদা ঘূর্ণায়মান। ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস এবং ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট ইলেকট্রনের মধ্যে পারস্পরিক স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল এবং ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের কেন্দ্রাতিগ বল পরস্পর সমান।

৫.৬ রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা

একথা অনস্বীকার্য যে, রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের মূল বক্তব্য পরমাণুর গঠন সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করে; কিন্তু এর সীমাবদ্ধতার কারণে এটি গ্রহণযোগ্য হয় না।

সীমাবদ্ধতা :

গ্রহগুলো তড়িৎ-নিরপেক্ষ। কিন্তু ইলেকট্রন ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট। ম্যাক্সওয়েলের (James Clerk Maxwell) তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব অনুযায়ী কোন আধান বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান থাকলে তা লাগাতার (continuous) শক্তি বিকিরণ করে এবং ক্রমাগত ক্ষুদ্রতম ব্যাসার্ধের পথে পরিভ্রমণ করে অবশেষে কেন্দ্রে পতিত হয় (চিত্র ৫.২)। বিজ্ঞানের বিতর্কে তাই রাদারফোর্ডের এ মডেল টিকে না। কারণ ইলেকট্রন কুণ্ডলিত পথে (চিত্র ৫.২) ঘুরে শেষ পর্যন্ত নিউক্লিয়াসে মিশে যাবে। পরিণামে নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনকে আলাদা করে রাখা মডেলের পতন ঘটবে। একথা অনস্বীকার্য যে, রাদারফোর্ডের নিউক্লিয়াস এবং কক্ষপথে পরিভ্রমণরত ইলেকট্রনের ধারণা পরমাণু জগতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।



চিত্র ৫.২ : কুণ্ডলিত পথে ইলেকট্রনের নিউক্লিয়াসে পতন।

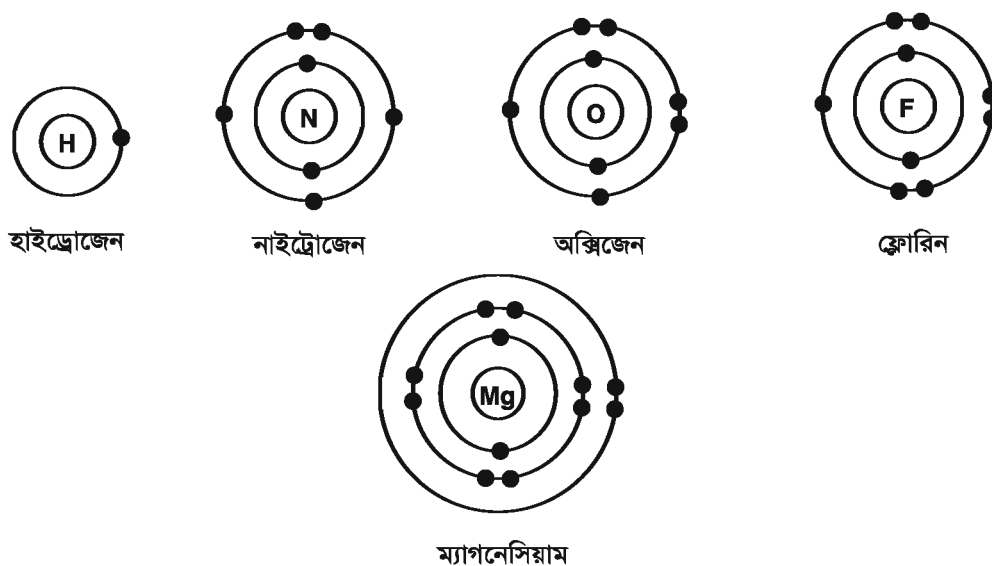
৫.৭ বোর-এর পরমাণু মডেল (Bohr's atom model)

১৯১৩ সালে নীলস বোর (Niels Bohr) পরমাণু গঠনের উন্নত একটি মডেল প্রদান করেন। বোর তত্ত্বের মূল প্রস্তাবনা (postulates বা assumptions)–

- (১) ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারদিকে কতকগুলো অনুমোদিত বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান থাকে। একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে অবস্থান কালে কোনো ইলেকট্রন শক্তি শোষণও করে না, বিকিরণও করে না। এসব কক্ষপথকে শক্তিস্তর (energy level) বলা হয়।
- (২) ইলেকট্রন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি শোষণ করে লাফ দিয়ে উপরের স্তরে অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে নিচের স্তরে গমন করতে পারে।

৫.৮ পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস (Electronic configuration of atoms)

আমরা জানি হাইড্রোজেন পরমাণুতে ১টি ইলেকট্রন আছে, হিলিয়াম পরমাণুতে আছে ২টি, আবার এমনও পরমাণু আছে যার মধ্যে ইলেকট্রন আছে ১০৭টি। প্রশ্ন ওঠে, পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলো কীভাবে সজ্জিত বা বিন্যস্ত থাকে।



চিত্র ৫.৬৩ কয়েকটি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস।

ইতোমধ্যে বোর তত্ত্বে তোমরা জেনেছ, একটি ইলেকট্রন একটি স্থিরশক্তি অবস্থান থেকে নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করে। এরূপ শক্তিস্তরকে প্রধান স্তরও বলা হয়। বোর তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ইলেকট্রন বিন্যাসের মূল বক্তব্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল :

- ১। প্রত্যেক পরমাণুতে একাধিক প্রধান শক্তিস্তর বিদ্যমান। প্রত্যেক প্রধান শক্তিস্তর একটি সংখ্যা n দ্বারা চিহ্নিত হয়। n -এর মান পূর্ণ সংখ্যা হয়, যেমন : ১, ২, ৩, ইত্যাদি।
- ২। একটি প্রধান শক্তিস্তর সাধারণত একটি শেল (Shell) নামে পরিচিত। শেলগুলোকে n -এর মান অথবা বিভিন্ন ইংরেজি বর্ণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যেমন প্রথম প্রধান শক্তিস্তরকে ($n = 1$) K শেল, দ্বিতীয় প্রধান শক্তিস্তরকে ($n = 2$) L শেল এভাবে লেখা হয়। পরবর্তী শেল M, N, O, P প্রভৃতি বর্ণ দ্বারা চিহ্নিত হয়। $n = 1$ শেলটি নিউক্লিয়াসের নিকটে। n -এর মান বৃদ্ধির সাথে নিউক্লিয়াস থেকে শেলের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়।
- ৩। নিউক্লিয়াসের নিকটতম শেলটি সবচেয়ে কম শক্তিসম্পন্ন। দূরত্ব যত বাড়ে, শেল তত বেশি শক্তিসম্পন্ন হয়। ইলেকট্রন সাধারণত কম শক্তিসম্পন্ন স্তরে অবস্থান করে। যদি আরো শক্তি অর্জন করে তবে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন স্তরে যেতে পারে।

৪। প্রথম শেলে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা	2টি
২য় " " " " "	8টি
৩য় " " " " "	18টি
৪র্থ " " " " "	32টি

সারণি ৫.২ : কয়েকটি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস

বিভিন্ন শেলে ইলেকট্রনের সংখ্যা					
পারমাণবিক সংখ্যা	মৌল	K	L	M	N
1	H	1			
2	He	2			
3	Li	2	1		
4	Be	2	2		
5	B	2	3		
6	C	2	4		
7	N	2	5		
8	O	2	6		
9	F	2	7		
10	Ne	2	8		
11	Na	2	8	1	
12	Mg	2	8	2	
13	Al	2	8	3	
14	Si	2	8	4	
15	P	2	8	5	
16	S	2	8	6	
17	Cl	2	8	7	
18	Ar	2	8	8	
19	K	2	8	8	1
20	Ca	2	8	8	2

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

মৌলিক কণিকা : যে সকল অতি সূক্ষ্ম কণিকা দ্বারা পরমাণু গঠিত, তাদেরকে মৌলিক কণিকা বলা হয়। এরা হচ্ছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন।

ইলেকট্রন : পরমাণুর মধ্যকার সবচেয়ে হালকা কণিকা ইলেকট্রন। এটি ঋণাত্মক আধানযুক্ত এবং এর আপেক্ষিক আধানকে -1 ধরা হয়। ইলেকট্রন পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘূর্ণায়মান।

প্রোটন : পরমাণুর অন্য মৌলিক কণিকা প্রোটন। এটি ধনাত্মক আধানযুক্ত এবং এর আপেক্ষিক আধানের পরিমাণ $+1$ । প্রোটন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে।

নিউট্রন : পরমাণুর আরেকটি মৌলিক কণিকা নিউট্রন। এটি তড়িৎ নিরপেক্ষ। এর আপেক্ষিক ভর 1। নিউট্রন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে।

পারমাণবিক সংখ্যা : কোনো মৌলের পরমাণুর অন্তর্গত প্রোটনের সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয়।

ভর সংখ্যা : কোনো পরমাণুর অন্তর্গত প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যাকে ভর সংখ্যা বলা হয়।

আইসোটোপ : একই মৌলের বিভিন্ন ভর সংখ্যা বিশিষ্ট পরমাণুকে পরস্পরের আইসোটোপ বলা হয়।

অথবা, যে সকল পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন, তাদেরকে পরস্পরের আইসোটোপ বলা হয়।

পরমাণুতে বিভিন্ন মূল কণিকার সংখ্যা : যে কোনো পরমাণুতে Z সংখ্যক প্রোটন, Z সংখ্যক ইলেকট্রন ও $(A-Z)$ সংখ্যক নিউট্রন বিদ্যমান। Z পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা, A ভর সংখ্যা।

পারমাণবিক সংখ্যা প্রভৃতি লেখার নিয়ম : কোনো মৌলের প্রতীকের বাম পার্শ্বে পাদবিন্দুতে মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা, বাম পার্শ্বে শীর্ষবিন্দুতে ভর সংখ্যা, প্রতীকের ডান পার্শ্বে শীর্ষবিন্দুতে আধানের পরিমাণ (যদি থাকে) লেখা হয়।

রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল : রাদারফোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত পরমাণুর গঠন সংক্রান্ত মতবাদকে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল বলা হয়। এ তত্ত্ব অনুযায়ী পরমাণুর দুইটি অংশ আছে, যেমন, সকল ধণাত্মক আধান ও প্রায় সম্পূর্ণ ভরবিশিষ্ট নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসের চারদিকে পরিভ্রমণরত ইলেকট্রনসমূহ।

বোর-এর পরমাণু মডেল : রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলকে আরো উন্নত করে বোর পরমাণুর গঠন সংক্রান্ত যে মতবাদ প্রদান করে, তাকে বোর-এর পরমাণু মডেল বলা হয়। এ তত্ত্ব অনুযায়ী কতকগুলো অনুমোদিত বৃত্তাকার কক্ষপথে নিউক্লিয়াসের চারদিকে ইলেকট্রনগুলো পরিভ্রমণ করে। কক্ষপথে অবস্থান করার সময় এদের শক্তির শোষণ বা বিকিরণ ঘটে না। ইলেকট্রনগুলো এক কক্ষপথে হতে লাফ দিয়ে অন্য কক্ষপথে যাওয়ার সময় শক্তি শোষণ বা বিকিরণ করে। ইলেকট্রনের শক্তিস্তর বদলানোর কারণেই বর্ণালির সৃষ্টি হয়।

ইলেকট্রন বিন্যাস : আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী ইলেকট্রন বিভিন্ন শক্তিস্তরে অবস্থান করে নিউক্লিয়াসের চারদিকে পরিভ্রমণ করে। কোনো পরমাণুর বিভিন্ন স্তরে কয়টি ইলেকট্রন কীভাবে আছে তার প্রকাশকে ইলেকট্রন বিন্যাস বলা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. ভর সংখ্যার ভিন্নতার কারণে কোনটি সৃষ্টি হয়?

- | | |
|------------|------------|
| ক. আইসোবার | খ. আইসোটোপ |
| গ. আইসোটোন | ঘ. আইসোমার |

২. ${}^{39}_{19}\text{K}^+$ আয়নে ইলেকট্রন সংখ্যা কত?

- | | |
|-------|-------|
| ক. 18 | খ. 19 |
| গ. 20 | ঘ. 39 |

৩. কোন মৌলের পরমাণুতে a টি প্রোটন, b টি ইলেকট্রন ও c টি নিউট্রন বিদ্যমান। মৌলের পরমাণুর ভর সংখ্যা কত?

ক. $a + b$

খ. $a + c$

গ. $b + c$

ঘ. $a + b + c$

৪. নিচের যে যে আয়নের ইলেকট্রন সংখ্যা আর্গন পরমাণুর সমান—

i. Ca^{2+}

ii. Al^{3+}

iii. Cl

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii

খ. ii এবং iii

গ. i এবং iii

ঘ. i, ii এবং iii

সৃজনশীল প্রশ্ন :

প্রতিটি মৌলের পরমাণু মৌলিক কণিকা দ্বারা গঠিত। কণিকাসমূহের মধ্যে কোনোটি ধনাত্মক, কোনোটি ঋণাত্মক আবার কোনোটি চার্জ নিরপেক্ষ। একটি মৌলিক কণিকা নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে নিয়ত ঘূর্ণায়মান। পরমাণুতে ঐ মৌলিক কণিকার বিন্যাস থেকে মৌলের ধর্ম সম্বন্ধে জানা যায়। এ কণিকার গ্রহণ ও বর্জনের ফলে মৌল আধানগ্রস্ত হয়। অবশিষ্ট কণিকাগুলো মৌলের নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে।

ক. নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান কণিকার নাম কী?

খ. পরমাণু কেন আধানগ্রস্ত হয়?

গ. Cu পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখিয়ে এর যোজনী নির্ণয় কর।

ঘ. মৌলের নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তা নির্ধারণে এর ইলেকট্রন বিন্যাস প্রধান ভূমিকা পালন করে— ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাসায়নিক বন্ধন

বিষয়বস্তু : রাসায়নিক বন্ধন কেন গঠিত হয়? নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাসের ভিত্তিতে রাসায়নিক বন্ধন গঠন। আয়নিক বন্ধন, সমযোজী বন্ধন, ধাতব বন্ধন, কয়েকটি সরল অণুর আকৃতি। আয়নিক যৌগ ও সমযোজী যৌগের বৈশিষ্ট্য।

৬.১ রাসায়নিক বন্ধন (Chemical bond)

নিষ্ক্রিয় গ্যাস ছাড়া সকল বস্তুর অণুতে একাধিক পরমাণু থাকে। নাইট্রোজেনের একটি অণুতে দুইটি পরমাণু বিদ্যমান, পানির একটি অণুতে হাইড্রোজেনের দুইটি এবং অক্সিজেনের একটি পরমাণু নিয়ে মোট তিনটি পরমাণু আছে। সালফিউরিক এসিডের একটি অণুতে মোট সাতটি পরমাণু বিদ্যমান। কীভাবে এ সকল পরমাণু একত্রে আবদ্ধ থাকে? একটি বিষয় স্পষ্ট যে, অণুতে বিভিন্ন পরমাণু মোটামুটি দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে। কেননা অণু হতে পরমাণুসমূহকে সহজে পৃথক করা যায় না। যে শক্তি বলে অণুতে পরমাণুগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে, তাকে বন্ধন বা রাসায়নিক বন্ধন বলা হয়।

৬.২ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস (Electronic configuration of inert gases)

পর্যায় সারণির ডানদিকে শূন্য গ্রুপে আমরা ৬টি মৌল দেখতে পাই। এগুলো হচ্ছে হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন ও রেডন। এরা সাধারণ অবস্থায় গ্যাস। এদেরকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয়। কারণ, এরা রাসায়নিকভাবে সক্রিয় নয়। এরা কোনো মৌলের সাথে সংযুক্ত হতে চায় না, এমনকি নিজেরা নিজেদের সাথেও নয়। তাই নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহ পরমাণুতে বিভক্ত হয়ে থাকে। অন্যান্য মৌলিক গ্যাসের অণু প্রধানত দ্বিপরমাণুক। নিষ্ক্রিয় গ্যাসের এ নিষ্ক্রিয়তার কারণ কী? শূন্য গ্রুপের ইলেকট্রন বিন্যাস নিচে দেওয়া হল :

সারণি ৬.১ : কয়েকটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস

নিষ্ক্রিয় মৌল	পারমাণবিক সংখ্যা	K	L	M	N
হিলিয়াম	2	2			
নিয়ন	10	2	8		
আর্গন	18	2	8	8	
ক্রিপ্টন	36	2	8	18	8

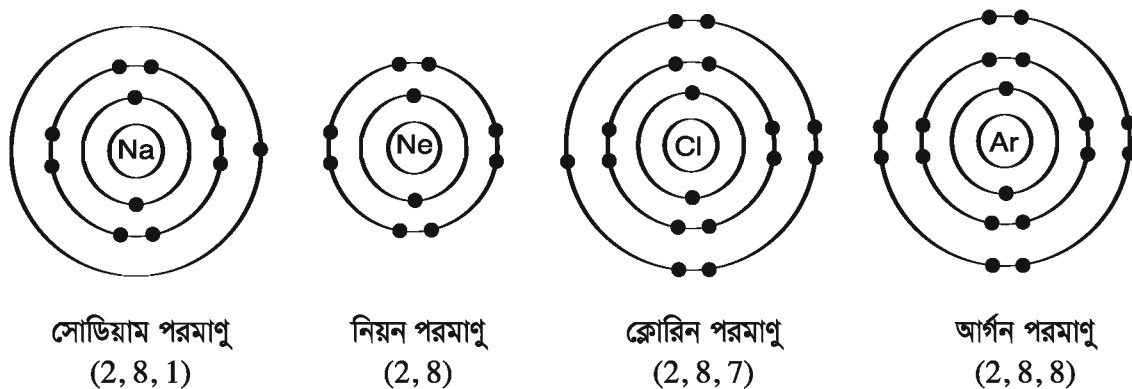
নিষ্ক্রিয় মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখা যায় যে, হিলিয়ামের একমাত্র কক্ষপথে দুইটি ইলেকট্রন আছে। এর সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণক্ষমতাও দুই। হিলিয়ামের ক্ষেত্রে এ ইলেকট্রন বিন্যাস অত্যন্ত স্থিতিশীল। এ গ্রুপের অন্যান্য মৌলের শেষ কক্ষপথে আটটি করে ইলেকট্রন আছে। এরূপ ইলেকট্রন বিন্যাসই নিষ্ক্রিয় মৌলকে স্থিতিশীল অবস্থা প্রদান করে। একটি পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ স্তরে (outermost level) সুস্থিত আটটি ইলেকট্রনের সেটকে অষ্টক (octet) বলে। অন্যান্য পরমাণুতে এ ধরনের ইলেকট্রন বিন্যাস নেই। নেই বলেই অন্যান্য পরমাণু কমবেশি সক্রিয়। একটি পরমাণু অন্য পরমাণুর সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে ইলেকট্রন বর্জন, গ্রহণ বা শেয়ার করে নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে। এর ফলেই রাসায়নিক বন্ধন সৃষ্টি হয়। বন্ধনে আবদ্ধ পরমাণু সমষ্টি সাধারণত স্থিতিশীল হয়।

রাসায়নিক বন্ধন বিভিন্ন ধরনের হয়। প্রধান দুইটি হচ্ছে আয়নিক বা তড়িৎ-যোজী বন্ধন (ionic or electrovalent bond) এবং সমযোজী বন্ধন (covalent bond)।

৬.৩ আয়নিক বন্ধন (Ionic bond)

কোনো কোনো মৌলের পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ কক্ষপথে 1, 2 অথবা 3টি ইলেকট্রন থাকে, যা পরমাণুগুলো সহজে ত্যাগ করতে পারে। এ ধরনের মৌল হচ্ছে ধাতু। অপরদিকে কোনো কোনো মৌলের সর্ববহিঃস্থ কক্ষপথে 5, 6 অথবা 7টি ইলেকট্রন বিদ্যমান। তারা সহজে 3, 2 বা 1টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে অষ্টক পূরণ করতে পারে। এ ধরনের মৌল হচ্ছে অধাতু। ১৯১৬ সালে কোসেল (Walther Kossel) মত প্রকাশ করেন যে, ধাতু ও অধাতুর মধ্যে বিক্রিয়ার সময় ধাতু পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আধানযুক্ত আয়নে পরিণত হয় এবং অধাতু পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আধানযুক্ত আয়নে পরিণত হয়। বিপরীত আধানের মধ্যে আকর্ষণ ঘটে, তাই এভাবে সৃষ্ট ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণের ফলে যে বন্ধনের সৃষ্টি হয়, তাকে আয়নিক বন্ধন বলে। যে যৌগে আয়নিক বন্ধন বিদ্যমান, তাকে আয়নিক যৌগ বলা হয়।

উদাহরণ : সোডিয়াম ধাতুর পরমাণুতে 11টি ইলেকট্রন আছে। এর ইলেকট্রন বিন্যাস 2, 8, 1 অর্থাৎ এর শেষ কক্ষপথে একটি মাত্র ইলেকট্রন আছে। নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস 2, 8।

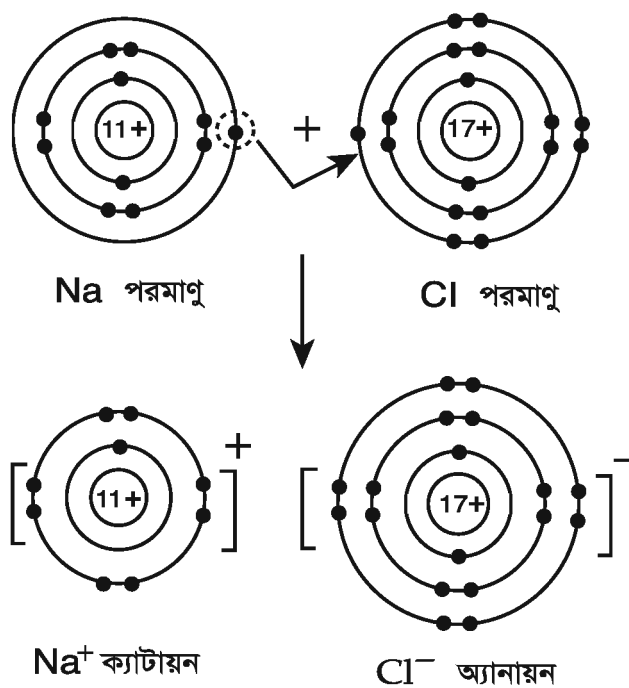


চিত্র ৬.১ : কয়েকটি পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস

সোডিয়াম পরমাণু তার শেষ কক্ষপথের ইলেকট্রনটি ত্যাগ করলে নিয়ন গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে পারে। পরমাণুটি পরিবর্তিত অবস্থায় যথেষ্ট স্থিতিশীলতা অর্জন করে। একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করায় একটি ধনাত্মক আধানযুক্ত Na^+ আয়নের উৎপত্তি হয়।

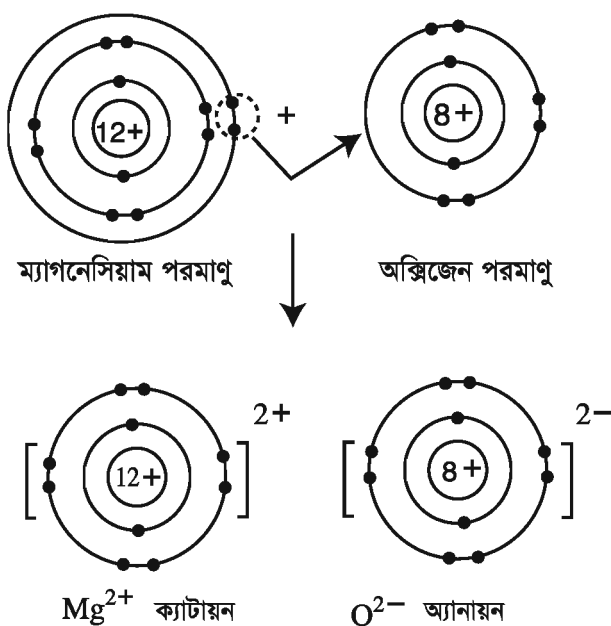
অপরদিকে ক্লোরিন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে 2, 8, 7; তার সর্বশেষ কক্ষপথে 7টি ইলেকট্রন আছে। নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর্গনের ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে 2, 8, 8। ক্লোরিন পরমাণু একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করলে তার ইলেকট্রন বিন্যাস হয় 2, 8, 8, যেটা আর্গনের অনুরূপ। এ অবস্থায় তার ইলেকট্রন বিন্যাস যথেষ্ট স্থিতিশীলতা অর্জন করে। একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করার কারণে ক্লোরিন পরমাণু একটি ঋণাত্মক আধানযুক্ত Cl^- আয়নে রূপান্তরিত হয়। এ বিপরীত আধানযুক্ত আয়নদ্বয় পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং এভাবে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) যৌগের সৃষ্টি হয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড একটি আয়নিক যৌগ।

ম্যাগনেসিয়াম যখন বাতাসে জ্বলে তখন ম্যাগনেসিয়াম ধাতু অক্সিজেন গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে। এ সময়ও একইভাবে ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে। ম্যাগনেসিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা 12, এর ইলেকট্রন বিন্যাস 2, 8, 2। এর শেষ কক্ষপথে 2টি ইলেকট্রন আছে। এ 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ করলে Mg^{2+} আয়নের সৃষ্টি হয়, যার ইলেকট্রন বিন্যাস (2, 8), নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের অনুরূপ। অপরদিকে অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা 8 এবং ইলেকট্রন বিন্যাস 2, 6। ম্যাগনেসিয়াম পরমাণু কর্তৃক ত্যাগকৃত 2টি ইলেকট্রন গ্রহণ করলে O^{2-} আয়নের সৃষ্টি হয়, যার ইলেকট্রন বিন্যাস হয় 2, 8। অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়ন এর অনুরূপ। সৃষ্ট Mg^{2+} ও O^{2-} আয়নদ্বয় বিপরীত আধানযুক্ত হওয়ায়



চিত্র ৬.২ : সোডিয়াম ক্লোরাইডের গঠন (NaCl)

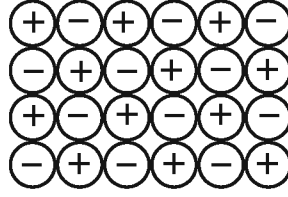
পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (MgO) এর সৃষ্টি হয়। সুতরাং এটি একটি আয়নিক যৌগ।



চিত্র ৬.৩ : ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের গঠন (MgO)

উল্লেখ্য যে, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এভাবে ইলেকট্রনের আদান-প্রদান বা পুনর্বিন্যাস ঘটে কিন্তু এতে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না। আয়নিক বন্ধন খুব শক্তিশালী বন্ধন। এ বন্ধন ছিন্ন করতে প্রচুর শক্তি ব্যয় করতে হয়। যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইডকে 1465°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে এ বন্ধন পুরোপুরি ছিন্ন হয় এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড বাষ্পীভূত হয়। 801°C তাপমাত্রায় আয়নসমূহের কম্পন এত বৃদ্ধি পায় যে, এক জোড়া আয়ন (Na^+Cl^-) পার্শ্ববর্তী আয়নের আকর্ষণ ছিন্ন করে পরস্পরের নিকটে থেকে

মুক্তভাবে বিচরণ করে। কঠিন অবস্থায় অসংখ্য আয়ন একত্রিত হয়ে বিশেষ ধরনের জালিক (crystal lattice) তৈরি করে। তাতে বিপরীতধর্মী আয়ন যথাসম্ভব পরস্পরের নিকটে এবং সমধর্মী আয়ন যথাসম্ভব পরস্পর হতে দূরে অবস্থান করে।



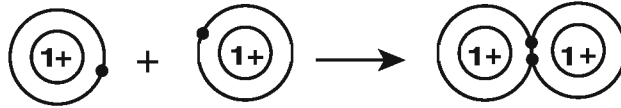
(+) Na আয়ন

(-) Cl আয়ন

চিত্র ৬.৪ : সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্বিমাত্রিক জালিকা

৬.৪ সমযোজী বন্ধন (Covalent bond)

যখন দুইটি অধাতু পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়, তখন কোনো পরমাণুর পক্ষে ইলেকট্রন ত্যাগ করা সহজ হয় না। কারণ সর্ববহিঃস্থ স্তরে অধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর ইলেকট্রন ত্যাগ করতে অনেক শক্তির প্রয়োজন। এ সব ক্ষেত্রে পরমাণুসমূহ তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ইলেকট্রন শেয়ার করে। এ শেয়ারকৃত ইলেকট্রন উভয় নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী স্থানে পরিভ্রমণ করে এবং উভয় পরমাণু কার্যকরভাবে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে। শেয়ার করা ইলেকট্রন উভয় নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী স্থানে পরিভ্রমণ করার ফলে পরমাণু দুইটি পরস্পরের সাথে



চিত্র ৬.৫ : (ক) হাইড্রোজেন অণুর গঠন



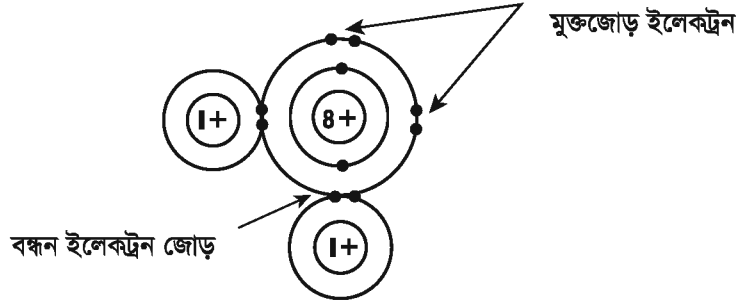
চিত্র ৬.৫ : (খ) সমযোজী বন্ধন সৃষ্টিকারী দুইটি ইলেকট্রন জোড়াকে একটি দাগ (-) বা বন্ধন দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

সমযোজী বন্ধন সৃষ্টি করে।

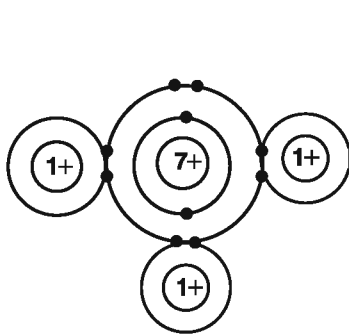
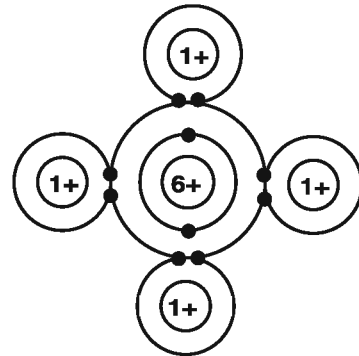
উদাহরণ : হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি মাত্র ইলেকট্রন আছে। হাইড্রোজেন পরমাণুর হিলিয়াম পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করার ক্ষমতা আছে। সেজন্য কক্ষপথে আরো একটি ইলেকট্রন প্রয়োজন। যখন দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু পরস্পরের সন্নিহনে আসে, তখন পরমাণুদ্বয়ের ইলেকট্রন দুইটি উভয় পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী স্থানে পরিভ্রমণ করে।

অক্সিজেন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে 2, 6। নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে এর আরো 2টি ইলেকট্রন প্রয়োজন। অপরদিকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রয়োজন 1টি ইলেকট্রন। সুতরাং একটি অক্সিজেন পরমাণু দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন শেয়ার করে। ফলে অক্সিজেনের শেষ কক্ষপথে সর্বমোট আটটি ইলেকট্রন হয় এবং প্রতিটি হাইড্রোজেনের কক্ষপথে দুইটি করে ইলেকট্রন হয়। এভাবেই পানির অণু সৃষ্টি হয়।

নাইট্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস 2, 5 অর্থাৎ অষ্টক গঠনের জন্য এর আরো তিনটি ইলেকট্রন প্রয়োজন। একটি নাইট্রোজেন পরমাণু তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে ইলেকট্রন শেয়ার করে শেষ কক্ষপথে ৪টি ইলেকট্রন অর্জন করে। এভাবে অ্যামোনিয়া অণুর (NH₃) সৃষ্টি হয়।

চিত্র ৬.৬ : পানি অণু (H_2O)

কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা ৬, ইলেকট্রন বিন্যাস ২, ৪। আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জনের জন্য একে চারটি ইলেকট্রন গ্রহণ অথবা চারটি ইলেকট্রন বর্জন করতে হয়। কিন্তু এত অধিক সংখ্যক ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন সম্ভব হয় না। এ কারণে কার্বন সাধারণত কোনো আয়নিক যৌগ গঠন করে না। কার্বন চারটি ইলেকট্রন শেয়ার করে। কার্বনের অসংখ্য যৌগ বিদ্যমান, তারা প্রায় সকলেই ইলেকট্রন শেয়ার করা সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে সৃষ্টি। উদাহরণস্বরূপ একটি কার্বন পরমাণু চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে সর্বমোট চার জোড়া ইলেকট্রন শেয়ার করে চারটি C-H বন্ধন সৃষ্টি করে। এভাবেই মিথেন (CH_4) অণুর সৃষ্টি হয়, যেখানে কার্বন পরমাণুর শেষ কক্ষপথে ৪টি ইলেকট্রন এবং প্রতিটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কক্ষপথে ২টি করে ইলেকট্রন বিদ্যমান।

চিত্র ৬.৭ : অ্যামোনিয়া (NH_3) অণুচিত্র ৬.৮ : মিথেন (CH_4) অণু

৬.৫ যোজনী ইলেকট্রন (Valence electron)

কোনো পরমাণুর শেষ কক্ষপথের ইলেকট্রনকে যোজনী ইলেকট্রন বলা হয়। শেষ কক্ষপথকে যোজনী শেল বলা হয়। তোমরা নিশ্চয় লক্ষ করেছ, যোজনী ইলেকট্রনের সংখ্যা হতে সহজেই কোনো মৌলের যোজনী বের করা যায়। সাধারণত মৌলের যোজনী তার যোজনী ইলেকট্রনের সংখ্যার সমান হয় অথবা ৪ হতে যোজনী ইলেকট্রনের সংখ্যা বাদ দিলে যে সংখ্যা থাকে তার সমান হয়। এর কারণ হচ্ছে যৌগ গঠন করার সময় নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে যে কয়টি ইলেকট্রন বর্জন, গ্রহণ বা শেয়ার করে সেই সংখ্যা ঐ মৌলের যোজনী নির্দেশ করে। মৌলের পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ স্তরে ইলেকট্রনের সংখ্যা ৩, ৪ বা ৫ হলে মৌলসমূহের ইলেকট্রন ত্যাগের প্রবণতা সাধারণত হ্রাস পায়। কারণ ইলেকট্রন ত্যাগের জন্য অধিক শক্তির প্রয়োজন। তাই এরা সাধারণত সমযোজী বন্ধন গঠন করে। নিচের ছকটি হতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হবে :

সারণি ৬.২ : কয়েকটি মৌলের যোজনী ইলেকট্রন

মৌলের নাম	যোজনী	সর্ববহিঃস্থ স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা	সমযোজী বন্ধন সৃষ্টির সময় যতগুলো ইলেকট্রন অংশ নেয়	আয়নিক বন্ধন সৃষ্টির সময় যতগুলো ইলেকট্রন বর্জন বা গ্রহণ করা হয়
হাইড্রোজেন	1	1	1	1
লিথিয়াম	1	1	—	1
বেরিলিয়াম	2	2	—	2
বোরন	3	3	3	—
কার্বন	4	4	4	—
নাইট্রোজেন	3	5	3 বা 5	—
অক্সিজেন	2	6	2	2
ফ্লোরিন	1	7	1	1
সোডিয়াম	1	1	—	1
ম্যাগনেসিয়াম	2	2	—	2
ক্লোরিন	1	7	1	1

৬.৬ আয়নিক যৌগের বৈশিষ্ট্য (Properties of ionic compounds)

আয়নিক যৌগে প্রতিটি আয়ন তার চতুর্দিকে বিপরীত আধানযুক্ত আয়ন দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে (চিত্র ৬.৪)। আয়নিক যৌগকে তরল করতে হলে অনেক বেশি তাপের প্রয়োজন। অধিক তাপে আয়নগুলো অতিরিক্ত কম্পন দ্বারা বিপরীত আধানযুক্ত আয়নের আকর্ষণকে অতিক্রম করে মোটামুটি মুক্তভাবে বিচরণ করতে পারে। এদের বাষ্পীভূত করতে হলে বিপরীত আধানযুক্ত আয়নের আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করতে হয়। এ কারণে আয়নিক যৌগসমূহের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক খুব বেশি। উদাহরণস্বরূপ সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলনাঙ্ক 801°C এবং স্ফুটনাঙ্ক 1465°C ।

আয়নিক যৌগ কঠিন অবস্থায় তড়িৎ পরিবহণ করে না। কেননা, তড়িৎ পরিবহণের জন্য আয়নসমূহের যে চলাচল দরকার তা কঠিন অবস্থায় সম্ভব হয় না। কিন্তু গলিত এবং দ্রবীভূত অবস্থায় আয়নগুলো চলাচল করে, ফলে তড়িৎ পরিবহণ সম্ভব হয়। অধিকাংশ আয়নিক যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হয়।

৬.৭ সমযোজী যৌগের বৈশিষ্ট্য (Properties of covalent compounds)

সমযোজী যৌগ সাধারণত নিম্ন গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট। সমযোজী বন্ধনও শক্তিশালী; কিন্তু সমযোজী যৌগের অণুসমূহ একে অন্যের সাথে দুর্বল ভ্যান ডার ওয়ালস (Van der Waals) শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট থাকে। কোনো সমযোজী বস্তু কঠিন অবস্থা হতে তরল বা বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার সময় কেবল এ ভ্যান ডার ওয়ালস শক্তিকে ছিন্ন করে। মনে রাখতে হবে যে, গলনের বা স্ফুটনের সময় কোনো সমযোজী বন্ধন ছিন্ন হয় না। এ কারণে কম তাপমাত্রাতেই তা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ মিথেনের গলনাঙ্ক -183°C ও স্ফুটনাঙ্ক -162°C ।

সমযোজী যৌগসমূহ বিদ্যুৎ পরিবাহী হয় না। বিদ্যুৎ পরিবহণের জন্য যে আয়ন প্রয়োজন তা সমযোজী যৌগে নেই।

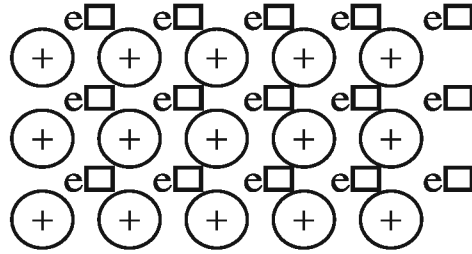
সমযোজী যৌগসমূহ সাধারণত পানিতে দ্রবীভূত হয় না। তবে কিছু সমযোজী যৌগ যেমন চিনি, গ্লুকোজ, অ্যালকোহল প্রভৃতি পানিতে দ্রবীভূত হয়।

৬.৮ ধাতব বন্ধন (Metallic bond)

এক টুকরা ধাতুর মধ্যে পরমাণুগুলো যে আকর্ষণ দ্বারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ থাকে, তাকে ধাতব বন্ধন বলা হয়।

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী ধাতুর পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ স্তরের ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের সাথে দুর্বলভাবে আবদ্ধ থাকে।

ধাতব খণ্ডে এ ইলেকট্রনগুলো পরমাণুর কক্ষপথ হতে বের হয়ে সমগ্র খণ্ডে মুক্তভাবে চলাচল করে। বিমুক্ত ইলেকট্রনগুলো কোনো নির্দিষ্ট পরমাণুর অধীনে থাকে না। বরং সমগ্র ধাতব খণ্ডের হয়ে যায়। ইলেকট্রন হারিয়ে ধাতুর পরমাণুগুলো আয়নে পরিণত হয়ে এক ত্রিমাত্রিক জালকে (three dimensional lattice) অবস্থান করে। এক ইলেকট্রন সাগরে ধাতব আয়নগুলো নিমজ্জিত আছে বলে মনে করা হয়। বিমুক্ত ইলেকট্রনের কারণে ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বেশি। একই কারণে ধাতব দ্যুতি, উচ্চ তাপ পরিবাহিতা, নমনীয়তা, ঘাতসহতা, অস্বচ্ছতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়।



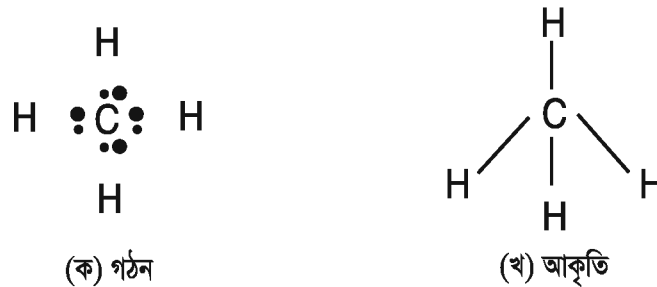
চিত্র ৬.৯ : ধাতুখণ্ডে আয়ন ও ইলেকট্রন

৬.৯ সমযোজী যৌগের অণুর আকৃতি (Shapes of covalent molecules)

অণুর আকৃতি বলতে অণুতে পরমাণুগুলো পরস্পর কীভাবে বিন্যস্ত তা বুঝায়। রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে অনেক অণুর আকৃতি নির্ধারণ করা হয়েছে। দেখা যায় CO_2 অণুর আকৃতি সরলরৈখিক অর্থাৎ অণুতে কার্বন ও অক্সিজেন পরমাণু একই সরল রেখায় অবস্থিত। আবার H_2O অণুতে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণুর অবস্থান 'V' আকৃতির। এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে নিম্নোক্তভাবে ;

কোনো অণুর কেন্দ্রস্থ পরমাণুর চারদিকে বিদ্যমান ইলেকট্রন জোড় (বন্ধনজোড় এবং মুক্তজোড় উভয়ই) এমনভাবে অবস্থান নিতে চায় যাতে তাদের মধ্যে বিকর্ষণ হয় সবচেয়ে কম হয়। এ জন্য কেন্দ্রস্থ পরমাণুর সঙ্গে বন্ধনযুক্ত পরমাণুগুলো এবং মুক্তজোড় ইলেকট্রন পরস্পর থেকে যথাসম্ভব কৌণিক দূরত্বে অবস্থান নেয়। কয়েকটি যৌগের অণুতে ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে ব্যাপারটি আলোচনা করা যায়। মিথেন CH_4 অণুর গঠন নিম্নরূপ।

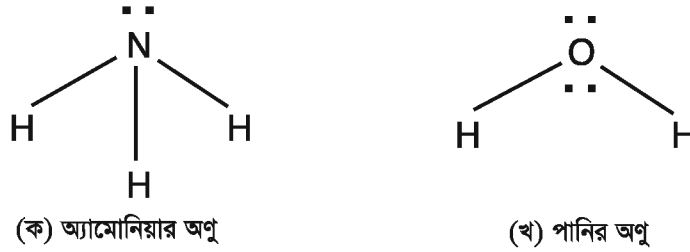
মিথেন অণুতে কার্বন পরমাণুর চারদিকে হাইড্রোজেন পরমাণু চারজোড়া ইলেকট্রন দ্বারা বন্ধনে আবদ্ধ। দেখা গেছে কার্বন-হাইড্রোজেন বন্ধন সৃষ্টিকারী ইলেকট্রন জোড়গুলো চতুষ্তলকীয়ভাবে কার্বন পরমাণুর চারদিকে বিন্যস্ত থাকলেই একমাত্র এরা পরস্পর থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে। তাই মিথেনের আকৃতি চতুষ্তলকীয়।



চিত্র ৬.১০ : মিথেন অণুর গঠন ও আকৃতি

চিত্র ৬.১০ : মিথেন অণুর গঠন ও আকৃতি

অনুরূপভাবে অ্যামোনিয়া অণুতে নাইট্রোজেন পরমাণুর চারদিকে তিনটি নাইট্রোজেন-হাইড্রোজেন বন্ধন সৃষ্টিকারী বন্ধনজোড় এবং একটি মুক্তজোড় ইলেকট্রন আছে। এদের বিন্যাসও চতুষ্তলকীয় হবে। যেহেতু মুক্তজোড় ইলেকট্রন

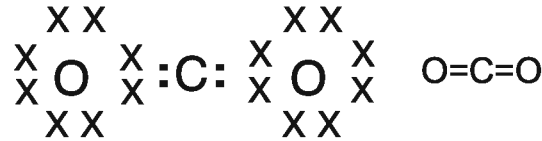


চিত্র ৬.১১ : অ্যামোনিয়া ও পানি অণুর গঠন

কোনো বন্ধন সৃষ্টি করেছে না তাই অ্যামোনিয়া অণুর গঠনকে বলা হয় ত্রিকোণ ভূমি বিশিষ্ট পিরামিড।

পানির অণুতে অক্সিজেন পরমাণুর চারদিকে হাইড্রোজেন-অক্সিজেন বন্ধন সৃষ্টিকারী দুইজোড়া এবং দুইটি মুক্তজোড়া ইলেকট্রন আছে। এ চারজোড়া ইলেকট্রন অক্সিজেন পরমাণুর চারদিকে চতুষ্তলকীয়ভাবে অবস্থান নেয়। দুইটি মুক্তজোড়া ইলেকট্রন বন্ধন সৃষ্টি করেছে না বিধায় পানির অণুকে ‘ V ’ আকৃতির দেখান হয়।

CO_2 অণুতে ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ :



কার্বন পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেন পরমাণুদ্বয়ের প্রতিটি দ্বিবন্ধনে যুক্ত। উপরিউক্ত বিবেচনায় দ্বিবন্ধনকে একজোড়া ইলেকট্রন হিসেবে ধরে কার্বন পরমাণুর চারদিকে দুইজোড়া ইলেকট্রন বিদ্যমান। তাই CO_2 অণুর গঠন হয় সরলরৈখিক।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

বন্ধন : যে শক্তির বলে অণুতে পরমাণুসমূহ একে অন্যের সাথে যুক্ত থাকে, তাকে বন্ধন বা রাসায়নিক বন্ধন বলা হয়।

নিষ্ক্রিয় গ্যাস : হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন ও রেডনকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয়। কেননা, তারা সাধারণত কোনো মৌলের সাথে যৌগ গঠন করে না। হিলিয়ামের কক্ষপথে দুইটি এবং অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাসের শেষ কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রন আছে। এ ইলেকট্রন বিন্যাস অত্যন্ত স্থিতিশীল অবস্থার প্রতীক। অন্যান্য মৌল এ ধরনের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে যৌগ গঠন করে।

আয়নিক বন্ধন : পরমাণুর ইলেকট্রন প্রদান ও গ্রহণের ফলে সৃষ্ট আয়নের যে বন্ধনের সৃষ্টি হয়, তাকে আয়নিক বন্ধন বলা হয়। যে যৌগে আয়নিক বন্ধন উপস্থিত, তাকে আয়নিক যৌগ বলা হয়। আয়নিক যৌগ উচ্চ গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট, গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় তড়িৎ-পরিবাহী, সাধারণত পানিতে দ্রবণীয়, কিন্তু জৈব দ্রাবকে অদ্রবণীয়।

সমযোজী বন্ধন : ইলেকট্রনের শেয়ারের মাধ্যমে দুইটি পরমাণুর মধ্যে যে বন্ধনের সৃষ্টি হয়, তাকে সমযোজী বন্ধন বলা হয়। সমযোজী বন্ধনবিশিষ্ট যৌগকে সমযোজী যৌগ বলা হয়। সমযোজী যৌগ নিম্ন গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট, বিদ্যুৎ কুপরিবাহী, সাধারণত পানিতে অদ্রবণীয়, কিন্তু জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়।

ধাতব বন্ধন : ধাতু খণ্ডে তার পরমাণুসমূহ যে আকর্ষণের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে আবদ্ধ থাকে, তাকে ধাতব বন্ধন

বলা হয়। ধাতু পরমাণুসমূহ সর্ববহিঃস্থ কক্ষের ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয় এবং ইলেকট্রনগুলো মুক্ত হয়ে সমগ্র ধাতুখণ্ডে বিচরণ করে। এর ফলে ধাতুর বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, তাপ পরিবাহিতা, দ্যুতি, নমনীয়তা, ঘাতসহতা, অস্বচ্ছতা প্রভৃতি।

সমযোজী যৌগের অণুর আকৃতি : অণুর কেন্দ্রস্থ পরমাণুর চারদিকে বিদ্যমান ইলেকট্রন জোড়ের পরস্পর থেকে যথাসম্ভব অধিক কৌণিক দূরত্বে অবস্থান নেওয়ার জন্য অণুর আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইডের আকৃতি রৈখিক, পানির অণুর আকৃতি কৌণিক, মিথেনের আকৃতি চতুষ্তলকীয় ও অ্যামোনিয়ার আকৃতি পিরামিডের মতো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. নিম্নের কোন মৌলটি শুধুমাত্র সমযোজী যৌগ গঠন করে?

- | | |
|-------------|------------------|
| ক. সোডিয়াম | খ. ম্যাগনেসিয়াম |
| গ. অক্সিজেন | ঘ. কার্বন |

২. $\text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{MgO}$

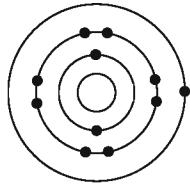
উৎপন্ন যৌগটি—

- পানিতে দ্রবণীয়
- কেরোসিনে দ্রবণীয়
- অ্যালকোহলে দ্রবণীয়

সঠিক উত্তর কোনটি?

- | | |
|-----------|------------------|
| ক. i | খ. iii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii এবং iii |

নিচের চিত্র ব্যবহার করে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩. চিত্রে কোন মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখানো হয়েছে?

- | | |
|----------------|--------------------|
| ক. সোডিয়াম | খ. ম্যাগনেসিয়াম |
| গ. ক্যালসিয়াম | ঘ. অ্যালুমিনিয়াম। |

৪. চিত্রের মৌলটি যৌগ গঠনে যে বন্ধনে আবদ্ধ হয়—

- সমযোজী
- আয়নিক
- সন্নিবেশ সমযোজী

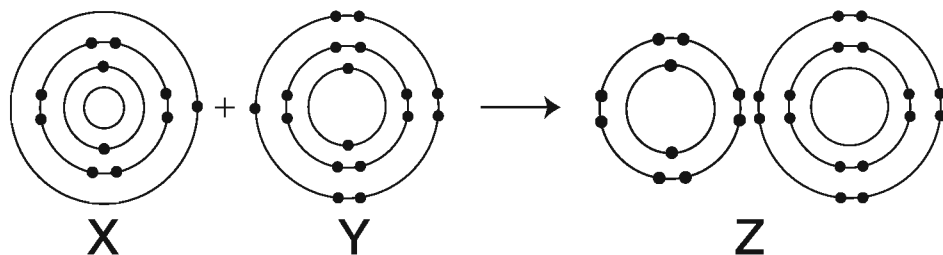
সঠিক উত্তর কোনটি?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i, ii এবং iii



উপরের চিত্রটি ব্যবহার করে ৫ থেকে ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৫. উৎপন্ন Z যৌগটির নাম কী?

ক. $MgCl_2$

খ. $CaCl_2$

গ. $NaCl$

ঘ. $FeCl_2$

৬. উৎপন্ন যৌগে কোন ধরনের বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে?

ক. ধাতব বন্ধন

খ. আয়নিক বন্ধন

গ. সমযোজী বন্ধন

ঘ. সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন।

৭. $X = C$, $Y = H$ হলে বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন যৌগের বন্ধন প্রকৃতি কী হবে?

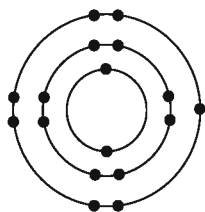
ক. সন্নিবেশ সমযোজী

খ. আয়নিক

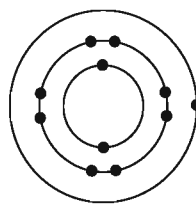
গ. সমযোজী

ঘ. ধাতব

সৃজনশীল প্রশ্ন :



চিত্র - ক



চিত্র - খ

ক. 'ক' চিত্রের মৌলটির নাম কী?

খ. 'ক' এবং 'খ' চিত্রের মৌল দুইটি পরস্পরের মধ্যে বিক্রিয়ায় গঠিত যৌগে কোন ধরনের বন্ধন গঠন করে? ব্যাখ্যা কর।

গ. 'ক' চিত্রের মৌলটির সজো পারমাণবিক সংখ্যা ১৯ বিশিষ্ট মৌলের বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখাও।

ঘ. চিত্রে প্রদত্ত মৌল দুইটির পরিবর্তে যদি নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন নেওয়া হয়, তবে যে ধরনের বন্ধন সৃষ্টি হবে তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

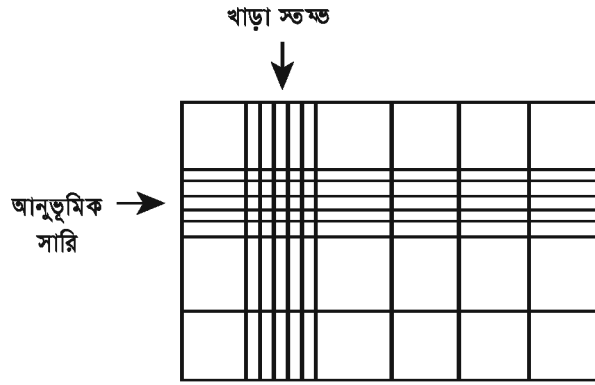
সপ্তম অধ্যায়

পর্যায় সারণি

বিষয়বস্তু : পর্যায় সারণির উৎপত্তি ও বিবর্তন, বৈশিষ্ট্যসমূহ, মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস ও মৌলের শ্রেণীকরণ, ক্রিয়াশীলতার অনুক্রম।

৭.১ পর্যায় সারণির (Periodic Table) উৎপত্তি ও বিবর্তন

আধুনিক রসায়নের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন মৌলের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ করেন। যেমন : সোডিয়াম এবং পটাসিয়ামের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম প্রায় একই ধরনের। একইভাবে ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিনের ধর্মাবলির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। এ কারণে বিজ্ঞানীগণ একই ধর্ম বিশিষ্ট বিভিন্ন মৌলকে সম-শ্রেণীভুক্ত করার চেষ্টা করেন। কেননা, তাহলে একটি মৌল কোন শ্রেণীভুক্ত তা জানলে তার বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে ধারণা করা সহজ হবে। রুশ বিজ্ঞানী মেন্ডেলিফের (Dimitri Ivanovich Mendeleev) অবদান এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি। ১৮৬৯ সালে তিনি সর্বপ্রথম মৌলসমূহের একটি বিশেষ তালিকা প্রকাশ করেন, যা রসায়ন বিজ্ঞানে পর্যায় সারণি নামে খ্যাত। মেন্ডেলিফকে পর্যায় সারণি উদ্ভাবকের সম্মান দেওয়া হয়। সারণি ৭.১-এ একটি সরল পর্যায় সারণি দেখানো হল :



সারণি ৭.১ : সারি ও স্তম্ভ

পর্যায় সারণি কতকগুলো আনুভূমিক সারি (horizontal row) এবং খাড়া স্তম্ভ (vertical column) বিভক্ত আছে। সারিগুলোকে পর্যায় (period) এবং স্তম্ভগুলোকে গ্রুপ (group) বলা হয়।

৭.২ পর্যায় সারণির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়

- (১) পর্যায় সারণিতে ৭টি পর্যায় এবং ৮টি গ্রুপ বিদ্যমান।
- (২) প্রতিটি পর্যায় বামদিকের গ্রুপ I থেকে আরম্ভ করে ডানদিকে গ্রুপ VIII পর্যন্ত বিস্তৃত।
- (৩) প্রথম পর্যায় মাত্র দুইটি মৌল বিদ্যমান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় ৮টি করে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায় ১৮টি করে মৌল আছে। ঊষ্ঠ পর্যায়ের আছে ৩২টি। সপ্তম পর্যায় এখনও অসম্পূর্ণ।
- (৪) মৌলসমূহের ধর্ম তাদের গ্রুপের ওপর নির্ভর করে। একই গ্রুপভুক্ত মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে যথেষ্ট মিল থাকে, যদিও ধর্মগুলো বিভিন্ন অনুক্রমে উপর থেকে নিচের দিকে পরিবর্তিত হয়।
- (৫) একটি পর্যায়ের বামদিক থেকে ডানদিকে মৌলসমূহের ধর্মের ক্রমবিকাশ লক্ষ করা যায়।
- (৬) কোনো গ্রুপে একটি মৌলের সর্বশেষ স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা তার গ্রুপ সংখ্যার সমমানের হয়।
- (৭) গ্রুপ-II এবং গ্রুপ-III এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানকারী মৌলগুলোকে অবস্থান্তর মৌল বলা হয়।

৭.৩ পর্যায় সারণির ভিত্তি

পর্যায় সারণি তৈরি করার সময় প্রথম অবস্থায় মৌলগুলোর পারমাণবিক ভর অনুসারে তাদেরকে সাজানোর চেষ্টা করা হয়। কেননা, তখনও পারমাণবিক সংখ্যা বিজ্ঞানীদের জানা ছিল না। সে সময় মেন্ডেলিফ নিম্নোক্ত সূত্র প্রণয়ন করেন, যা পর্যায় সূত্র নামে খ্যাত :

যদি মৌলসমূহকে ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ভর অনুসারে সাজানো হয়, তবে তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়।

কিন্তু একই ধরনের মৌলিক পদার্থকে একটি গ্রুপে স্থান দিতে গিয়ে কয়েকটি মৌলকে তাদের পারমাণবিক ভর হিসেবে সাজানো সম্ভব হয়নি। যেমন : পটাসিয়ামের পারমাণবিক ভর 39, আর্গনের পারমাণবিক ভর 40। পারমাণবিক ভর অনুসারে সাজালে পটাসিয়ামকে আর্গনের পূর্বে স্থান দিতে হয়, সে ক্ষেত্রে তার অবস্থান হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহের সাথে এবং আর্গনের স্থান হয় সোডিয়াম প্রভৃতি ক্ষারধাতুর সাথে। এতে পর্যায় সারণির মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। কারণ আর্গন একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং পটাসিয়াম একটি ক্ষারধাতু। ফলে এ দুইটি মৌলকে পারমাণবিক ভর-ক্রমের বিপরীতে সাজানো হয়। একইভাবে আয়োডিনের পারমাণবিক ভর 127 এবং টেলুরিয়ামের ভর 127.6 হওয়া সত্ত্বেও ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের সামঞ্জস্যের কারণে আয়োডিনকে টেলুরিয়ামের পরে স্থান দেওয়া হয়, যেন আয়োডিন, ক্লোরিন ও ব্রোমিনের সাথে এবং টেলুরিয়াম, সালফার ও সেলেনিয়ামের সাথে একই গ্রুপভুক্ত হয়। এ সকল উদাহরণ হতে বুঝা যায় যে, পারমাণবিক ভর পর্যায় সারণির মূল ভিত্তি হতে পারে না।

১৯১৩ সালে মোসলে (Henry G. J. Moseley) কর্তৃক পারমাণবিক সংখ্যা আবিষ্কৃত হয়। তখন এর তাৎপর্য বুঝা না গেলেও পরে দেখা যায় যে, এ সংখ্যা পর্যায় সারণিতে মৌলের ক্রমিক সংখ্যার সাথে মিলে যায়। এ কারণে পারমাণবিক সংখ্যাকে পর্যায় সারণির মূল ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় এবং পর্যায় সূত্র নিম্নরূপে সংশোধিত হয় :

মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি তাদের পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়।

পারমাণবিক সংখ্যাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার পরে আর্গন-পটাসিয়াম, আয়োডিন, টেলুরিয়াম প্রভৃতির স্থান নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকে না। কিন্তু সহসা বিজ্ঞানীগণ অনুধাবন করেন যে, মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে ধর্মাবলি পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হওয়ার মূল ভিত্তি। উল্লেখ্য যে, একটি মৌলের ইলেকট্রন সংখ্যা তার পারমাণবিক সংখ্যার সমান।

মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস দ্বারা তাদের সমধর্মী হওয়ার কারণ সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। গ্রুপ I মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করা যাক :

প্রতীক	পারমাণবিক সংখ্যা	K	L	M	N	O	P	Q
H	1	1						
Li	3	2	1					
Na	11	2	8	1				
K	19	2	8	8	1			
Rb	37	2	8	18	8	1		
Cs	55	2	8	18	18	8	1	
Fr	87	2	8	18	32	18	8	1

দেখা যায় যে, এসব মৌলের প্রত্যেকটির সর্বশেষ স্তরে 1টি ইলেকট্রন আছে। একাধিক মৌলের সর্বশেষ স্তরে একই ধরনের ইলেকট্রন বিন্যাস হলে একই ধরনের ধর্ম পরিলক্ষিত হয়। ফলে এগুলো একই গ্রুপের সদস্য হয়। একথা শুধু গ্রুপ I এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং সকল গ্রুপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আরো লক্ষণীয় যে, কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক মৌলের সর্বশেষ স্তরে যতটি ইলেকট্রন বিদ্যমান, সেই মৌলের অবস্থান তত নম্বর গ্রুপে। যেমন : ক্যালসিয়ামের (2, 8, 8, 2) সর্বশেষ স্তরে 2টি ইলেকট্রন থাকায় এটি গ্রুপ II এর সদস্য। সর্বশেষ স্তরে অষ্টক পূর্ণ হলে অবশ্য শূন্য গ্রুপ হয়।

সারণি ৭.২ : মৌলের প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা ও পারমাণবিক ভর।

Element	Symbol	Atomic Number	Atomic Mass	Element	Symbol	Atomic Number	Atomic Mass	Element	Symbol	Atomic Number	Atomic Mass
Actinium	Ac	89	(227) +	Hafnium	Hf	72	178.5	Promethium	Pm	61	(145)
Aluminium	Al	13	26.98	Helium	He	2	4.003	Protoactinium	Pa	91	(231)
Americium	Am	95	(243)	Holmium	Ho	67	164.9	Radium	Ra	88	226
Antimony	Sb	51	121.8	Hydrogen	H	1	1.008	Radon	Rn	86	(222)
Argon	Ar	18	39.95	Iodine	I	49	114.8	Rhenium	Re	75	186.2
Arsenic	As	33	74.92	Iridium	Ir	53	126.9	Rhodium	Rh	45	102.9
Astatine	At	85	(210)	Iron	Fe	26	55.85	Rubidium	Rb	37	85.47
Barium	Ba	56	137.3	Krypton	Kr	36	83.80	Ruthenium	Ru	44	101.1
Berkelium	Bk	97	(247)	Lanthanum	La	57	138.9	Samarium	Sm	62	150.4
Beryllium	Be	4	9.012	Lanthanum	Lr	103	(262)	Scandium	Sc	21	44.96
Bismuth	Bi	83	209.0	Lawrencium	Lr	103	(262)	Selenium	Se	34	78.96
Boron	B	5	10.81	Lead	Pb	82	207.2	Silicon	Si	14	28.09
Bromine	Br	35	79.90	Lithium	Li	3	6.941	Silver	Ag	47	107.9
Cadmium	Cd	48	112.4	Lutecium	Lu	71	175.0	Sodium	Na	11	22.99
Calcium	Ca	20	40.08	Magnesium	Mg	12	24.31	Strontium	Sr	38	87.62
Californium	Cf	98	(251)	Manganese	Mn	25	54.94	Sulfur	S	16	32.07
Carbon	C	6	12.01	Mendelevium	Md	101	(258)	Tantalum	Ta	73	180.9
Cerium	Ce	58	140.1	Mercury	Hg	80	200.6	Technetium	Tc	43	(98)
Cesium	Cs	55	132.9	Molybdenum	Mo	42	95.94	Tellurium	Te	52	127.6
Chlorine	Cl	17	35.45	Neodymium	Nd	60	144.2	Terbium	Tb	65	158.9
Chromium	Cr	24	52.00	Neon	Ne	10	20.18	Thallium	Tl	81	204.4
Cobalt	Co	27	58.93	Neptunium	Np	93	237	Thorium	Th	90	232.0
Copper	Cu	29	63.55	Nickel	Ni	28	58.69	Thulium	Tm	69	168.9
Curium	Cm	96	(247)	Niobium	Nb	41	92.91	Tin	Sn	50	118.7
Dysprosium	Dy	66	162.5	Nitrogen	N	7	14.01	Titanium	Ti	22	47.88
Einsteinium	Es	99	(252)	Nobelium	No	102	(259)	Tungsten	W	74	183.9
Erbium	Er	68	167.3	Osmium	Os	76	190.2	Uranium	U	92	238.0
Europium	Eu	63	152.0	Oxygen	O	8	16.00	Vanadium	V	23	50.94
Fermium	Fm	100	(257)	Palladium	Pd	46	106.4	Xenon	Xe	54	131.3
Fluorine	F	9	19.00	Phosphorus	P	15	30.97	Ytterbium	Yb	70	173.0
Francium	Fr	87	(223)	Platinum	Pt	78	195.1	Yttrium	Y	39	88.91
Gadolinium	Gd	64	157.3	Plutonium	Pu	94	(244)	Zinc	Zn	30	65.38
Gallium	Ga	31	69.72	Polonium	Po	84	(209)	Zirconium	Zr	40	91.22
Germanium	Ge	32	72.59	Potassium	K	19	39.10				
Gold	Au	79	197.0	Praseodymium	Pr	59	140.9				

পর্যায় সংখ্যাও মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। একটি মৌলের পরমাণুতে ইলেকট্রনসমূহ যত সংখ্যক স্তর দখল করে, তার অবস্থান তত নম্বর পর্যায়ে হয়। যেমন : পটাসিয়াম (ইলেকট্রন বিন্যাস 2, 8, 8, 1) পরমাণুতে ইলেকট্রনসমূহ চারটি স্তরে বিস্তৃত। সুতরাং পটাসিয়ামের অবস্থান চতুর্থ পর্যায়ে।

এ সকল তথ্য হতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পর্যায় সারণির মূল ভিত্তি হচ্ছে মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস।

৭.৪ মৌলসমূহের কতিপয় পর্যায়বৃত্তিক ধর্ম (Periodic properties of elements)

(ক) ভৌত ধর্ম : যে কোনো গ্রুপে মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ধীরে ধীরে এবং অনেকটা নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয়। যেমন : গ্রুপ I এর ক্ষারধাতুসমূহ প্রত্যেকেই নরম ধাতু, নিম্ন গলনাঙ্ক বিশিষ্ট। এ গ্রুপের ধাতুসমূহের গলনাঙ্ক পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ধীরে ধীরে কমে।

গ্রুপ VII অর্থাৎ হ্যালোজেনসমূহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভৌতধর্মে একই রূপে ধারাবাহিক পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন : এসব মৌলের গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক ও ঘনত্ব পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ে।

(খ) রাসায়নিক ধর্ম : রাসায়নিক ধর্ম বিচার করলে একই গ্রুপের মৌলসমূহের মধ্যে বেশ মিল দেখা যায়। এ মিলের উৎস হচ্ছে একই ধরনের ইলেকট্রন বিন্যাস। যেমন ক্ষার ধাতুসমূহের পরমাণুর সর্ববহিঃস্তরে একটি করে ইলেকট্রন আছে। তারা সেই ইলেকট্রন দান করে সহজেই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে পারে। যেহেতু একটি ইলেকট্রন দান করা হয়, তাই সকল ক্ষারধাতুর যোজনী 1। যেহেতু এরা ইলেকট্রন দান করতে সক্ষম, তাই এদের যৌগগুলো আয়নিক যৌগ (যেখানে ক্ষারধাতু ধনাত্মক আয়ন বা ক্যাটায়ন হিসেবে বিদ্যমান) হয়ে থাকে। এ সকল যৌগ উচ্চ গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট। কঠিন অবস্থায় তড়িৎ অপরিবাহী, কিন্তু তরল অবস্থায় ও দ্রবণে তড়িৎ পরিবাহী। আয়নিক যৌগ হওয়ার কারণে সব ক্ষারধাতুর অধিকাংশ যৌগ পানিতে দ্রবণীয়, কিন্তু জৈব দ্রাবকে অদ্রবণীয়।

গ্রুপ II এর মৌলসমূহের ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহ মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য। তবে গ্রুপ II মৌলসমূহের পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ স্তরে দুইটি ইলেকট্রন থাকে, সুতরাং তারা দুইটি ইলেকট্রন দান করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করে। এ সকল মৌলের যোজনী 2।

গ্রুপ VII মৌলসমূহের সর্বশেষ স্তরে 7টি ইলেকট্রন বিদ্যমান। নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জনের জন্য তাদের একটি ইলেকট্রন প্রয়োজন। সুতরাং গ্রুপ VII মৌলসমূহের সাধারণ যোজনী 1। ইলেকট্রন গ্রহণ বা শেয়ারের মাধ্যমে অষ্টক পূরণ করা সম্ভব। যখন একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করা হয়, তখন এক একক ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট হ্যালাইড আয়ন উৎপন্ন হয়, ফলে সেক্ষেত্রে যৌগসমূহ আয়নিক হয় এবং আয়নিক যৌগের সকল ধর্ম প্রদর্শন করে। যেমন , NaF, NaCl, NaBr, NaI উচ্চগলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট কঠিন পদার্থ, যা পানিতে দ্রবণীয়।

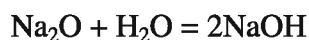
যে সকল ক্ষেত্রে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে অষ্টক পূরণ হয়, সেক্ষেত্রে তাদের সমযোজী যৌগের সৃষ্টি হয়, তারা সমযোজী যৌগের ধর্ম প্রদর্শন করে। যেমন- HF, HCl, HBr, HI প্রত্যেকেই কক্ষ তাপমাত্রায় গ্যাসীয়।

(গ) একই পর্যায়ে মৌলসমূহের ধর্মের ক্রমবিকাশ : একই পর্যায়ে একই ধরনের রাসায়নিক ধর্ম দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে ক্রমাগত পরিবর্তন দেখা যায়, যেমন তৃতীয় পর্যায়ের মৌলসমূহের যোজনী হাইড্রোজেনের সাথে সংযুক্তির ক্ষেত্রে 1 হতে ক্রমাগত বেড়ে 4 হয় এবং তারপর ক্রমশ কমে শূন্য হয়। অক্সিজেনের সাথে সংযুক্তির ক্ষেত্রে সর্বাধিক যোজনী 1 হতে ক্রমাগত বেড়ে 7 হয়। যতই ডানদিকে যাওয়া যায়, অক্সাইডসমূহের অম্লত্ব ততই বৃদ্ধি পায়।

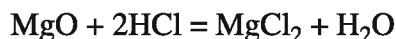
গ্রুপ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
মৌল	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
হাইড্রাইড	NaH	MgH ₂	AlH ₃	SiH ₄	PH ₃	H ₂ S	HCl	
অক্সাইড	Na ₂ O	MgO	Al ₂ O ₃	SiO ₂	P ₂ O ₅	SO ₃	Cl ₂ O ₇	

(১) পানির সাথে একই পর্যায়ভুক্ত মৌলের অক্সাইডসমূহের বিক্রিয়া

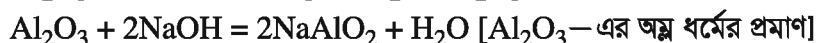
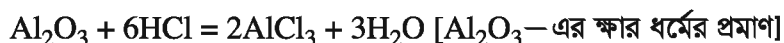
পানির সাথে একই পর্যায়ের বিভিন্ন মৌলের বিক্রিয়া হতে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন : Na_2O পানির সাথে বিক্রিয়া করে NaOH উৎপন্ন করে, যা তীব্র ক্ষার।



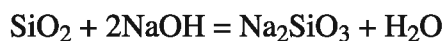
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষার উৎপন্ন করে না, কিন্তু এটি ক্ষারক। এটি অম্লের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।



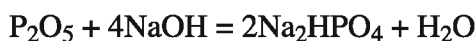
অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে না, কিন্তু এটি অম্ল ও ক্ষার উভয়ের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। অর্থাৎ এটি উভধর্মী।



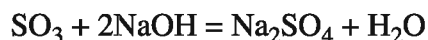
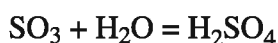
সিলিকন ডাইঅক্সাইড পানি বা অম্লের সাথে বিক্রিয়া করে না; কিন্তু এটি ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। অর্থাৎ এটি অম্লধর্মী।



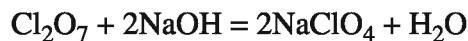
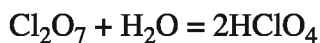
ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে দুর্বল অম্ল ফসফরিক এসিড উৎপন্ন করে। ক্ষারের সাথে বিক্রিয়ায় ফসফেট লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়।



সালফার ট্রাইঅক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে শক্তিশালী অম্ল সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন করে। ক্ষারের সাথে বিক্রিয়ায় সালফেট লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়।



ক্লোরিন হেপ্টাঅক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে শক্তিশালী অম্ল পারক্লোরিক এসিড উৎপন্ন করে। ক্ষারের সাথে বিক্রিয়ায় পারক্লোরেট লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়।



উল্লেখ্য যে, ধাতুর অক্সাইড ক্ষারধর্মী, অধাতুর অক্সাইড অম্লধর্মী। সুতরাং তৃতীয় পর্যায়ের মৌলসমূহের অক্সাইডসমূহের ধর্ম হতে বুঝা যায় যে, একই পর্যায়ে যতই ডানদিকে যাওয়া যায়, ততই মৌলসমূহের ধাতু ধর্ম হ্রাস পায়। একই কারণে হ্যালাইডসমূহ আয়নিক হতে ক্রমশ সমযোজী হয়।

মৌল	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
	ধাতু	ধাতু	ধাতু	অধাতু	অধাতু	অধাতু	অধাতু	অধাতু
ক্লোরাইড	NaCl	MgCl_2	AlCl_3	SiCl_4	PCl_3	SCl_2	Cl_2	
	আয়নিক	আয়নিক	সমযোজী	সমযোজী	সমযোজী	সমযোজী	সমযোজী	

অপরদিকে যে কোনো গ্রুপে যতই নিচের দিকে যাওয়া যায়, মৌলসমূহের ধাতু ধর্ম তত বৃদ্ধি পায়। গ্রুপ IV এর মৌলসমূহ হতে এ বক্তব্যের পক্ষে ভালো প্রমাণ পাওয়া যায়।

C	Si	Ge	Sn	Pb
অধাতু	অধাতু	অধাতু	ধাতু	ধাতু

(ঘ) পরমাণুর আকার : পরমাণুর আকারও পর্যায়বৃত্ত ধর্ম। যে কোনো পর্যায়ে যতই ডানদিকে যাওয়া যায়, অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যা যতই বাড়ে, পরমাণুর আকার ততই হ্রাস পায়। এর কারণ হচ্ছে একই পর্যায় পরমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে একটি করে ইলেকট্রন যুক্ত হয়, কিন্তু ইলেকট্রনের স্তর সংখ্যা বাড়ে না। পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক আধানের বৃদ্ধি। ফলে ইলেকট্রনসমূহ নিউক্লিয়াস কর্তৃক আরো জোরে আকৃষ্ট হয়। ফলে পরমাণুর ব্যাসার্ধ হ্রাস পায়। যেমন ৩য় পর্যায়ে বিভিন্ন মৌলের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ দেওয়া হল, সাথে দেওয়া হল এদের ইলেকট্রন বিন্যাস।

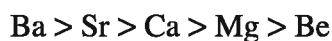
মৌল	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
ইলেকট্রন বিন্যাস	2,8,1	2,8,2	2,8,3	2,8,4	2,8,5	2,8,6	2,8,7
পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (Å)	2.23	1.82	1.72	1.46	1.23	1.09	0.97
1 Å = 10 ⁻⁸ cm							

অপরদিকে একই গ্রুপে যতই নিচের দিকে যাওয়া যায়, ততই ইলেকট্রনের এক একটি নতুন স্তর যুক্ত হয়, ফলে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পায়। যেমন গ্রুপ I মৌলসমূহের ক্ষেত্রে :

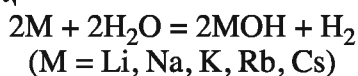
মৌল	ইলেকট্রন বিন্যাস	পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (Å)
Li	2,1	2.05
Na	2,8,1	2.23
K	2,8,8,1	2.77
Rb	2,8,18,8,1	2.98
Cs	2,8,18,18,8,1	3.34

(ঙ) ক্রিয়াশীলতা : ক্রিয়াশীলতার ক্ষেত্রেও একই গ্রুপে ধারাবাহিক পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন গ্রুপ I ও গ্রুপ II মৌলসমূহের ক্ষেত্রে যতই নিচের দিকে যাওয়া যায় (অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে), ততই মৌলসমূহ সক্রিয় হয়।

যেমন ক্ষারধাতু ও মৃৎ ক্ষারধাতুসমূহের ক্ষেত্রে সক্রিয়তার ক্রম হচ্ছে -

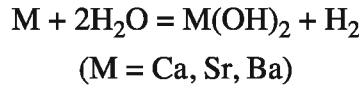


পানির সাথে এ সকল মৌলের বিক্রিয়া হতে এটা বুঝা যায়। গ্রুপ I মৌলসমূহ পানির সাথে তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে ধাতুর হাইড্রোক্সাইড ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।

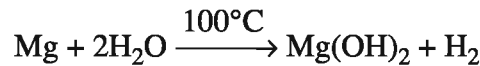


লিথিয়াম অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা কিছুটা ধীরে ধীরে বিক্রিয়া করে। অন্যান্য ধাতু এত তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে যে, এতে আগুন ধরে যায়।

গ্রুপ II ধাতুসমূহ গ্রুপ I ধাতুসমূহ অপেক্ষা অনেক কম সক্রিয়। তাই দেখা যায় যে ক্যালসিয়াম, স্ট্রনসিয়াম ও বেরিয়াম ঠান্ডা পানির সাথে বিক্রিয়া করে ধাতুর হাইড্রোক্সাইড ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।



কিন্তু ম্যাগনেসিয়াম ঠান্ডা পানির সাথে বিক্রিয়া করে না, উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে।

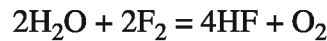


আবার গ্রুপ VII অর্থাৎ হ্যালোজেনসমূহের ক্রিয়াশীলতার ক্রম সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ যতই নিচের দিকে যাওয়া যায়, ততই মৌলসমূহ কম সক্রিয় হয়।

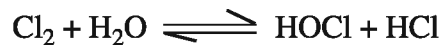
সক্রিয়তা : ফ্লোরিন > ক্লোরিন > ব্রোমিন > আয়োডিন।

পানির সাথে বিক্রিয়া হতে এ সক্রিয়তার ক্রম কিছুটা বুঝা যায়।

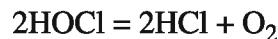
ফ্লোরিন পানির সাথে প্রচণ্ডভাবে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে।



ক্লোরিন পানিতে দ্রবীভূত হয়ে নিম্নোক্ত উভমুখী বিক্রিয়া করে।

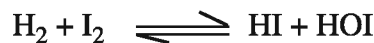
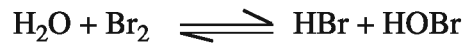


দীর্ঘ সময় রেখে দিলে নিম্নোক্ত বিক্রিয়াটি ঘটে :

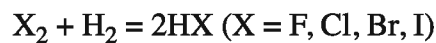


অর্থাৎ সর্বমোট বিক্রিয়া হচ্ছে, $2Cl_2 + 2H_2O = 4HCl + O_2$

ব্রোমিন ও আয়োডিন পানিতে দ্রবীভূত হয়ে নিম্নোক্ত উভমুখী বিক্রিয়া করে, যা আর অগ্রসর হয় না।



হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া হতে হ্যালোজেনের ক্রিয়াশীলতার ক্রম আরো ভালোভাবে বুঝা যায়। সকল হ্যালোজেনের সাথে হাইড্রোজেনের নিম্ন ধরনের বিক্রিয়া হয় :



কিন্তু ফ্লোরিন নিম্ন তাপমাত্রায় এবং অন্ধকারেও হাইড্রোজেনের সাথে বিস্ফোরণ সহকারে যুক্ত হয়। অপরদিকে ক্লোরিন সূর্যালোকে অথবা একটু উচ্চ তাপমাত্রায় তীব্রভাবে হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়। অথচ হাইড্রোজেনের সাথে আয়োডিনের বিক্রিয়ায় তাপ ও প্রভাবক উভয়ের প্রয়োজন হয় এবং বিক্রিয়াটি উভমুখী।

এ অধ্যায়ে যা শিখলাম

পর্যায় সারণি : বিভিন্ন মৌলের মধ্যে ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের মিল এবং এ সকল ধর্মের ক্রমপরিবর্তন দেখানোর জন্য সকল মৌল যে সারণিতে সাজানো হয়েছে, তাকে পর্যায় সারণি বলা হয়। পর্যায় সারণি তৈরিতে অনেক বিজ্ঞানীর অবদান আছে, তবে মেন্ডেলিফের অবদান খুব বেশি বলে তাকেই পর্যায় সারণির জনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পর্যায় সারণির অনেক বিবর্তন হয়েছে।

শ্রেণী ও পর্যায় : পর্যায় সারণিতে আনুভূমিক সারিগুলোকে পর্যায় এবং লম্ব স্তম্ভগুলোকে গ্রুপ বা শ্রেণী বলা হয়। একই গ্রুপে অবস্থিত মৌলসমূহের মধ্যে গভীর মিল বিদ্যমান। একই পর্যায়ে অবস্থিত মৌলসমূহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মে ক্রমাগত পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন একই পর্যায়ে যতই ডান দিক যাওয়া যায়, ততই মৌলসমূহের মধ্যে ধাতুধর্ম হ্রাস পায়, পরমাণুর আকার ছোট হয়। যে কোনো গ্রুপে মৌলের সাধারণ যোজনী গ্রুপ নম্বরের সমান অথবা আট হতে গ্রুপ নম্বর বাদ দিলে যে সংখ্যা হয়, তার সমান। যে কোনো গ্রুপে মৌলের সর্বোচ্চ যোজনী গ্রুপ নম্বরের সমান।

পর্যায় সারণির ভিত্তি : পর্যায় সারণি সৃষ্টির সময় মৌলসমূহের পারমাণবিক ভরকে ভিত্তি ধরা হয়েছিল। পরবর্তীতে পারমাণবিক সংখ্যাকে ভিত্তি ধরা হয়। বর্তমানে একথা স্বীকৃত যে পর্যায় সারণির সত্যিকার ভিত্তি হচ্ছে মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস। প্রতিনিধিত্বমূলক মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ স্তরে যতটি ইলেকট্রন বিদ্যমান, পর্যায় সারণিতে মৌলটির অবস্থান তত নম্বর গ্রুপে। ইলেকট্রন বিন্যাসে যতটি স্তর আছে, মৌলটির অবস্থান তত নম্বর পর্যায়ে।

মৌলসমূহের ধাতু ধর্মে ক্রম পরিবর্তন : একই পর্যায়ে যতই বাম হতে ডান দিকে যাওয়া যায়, মৌলসমূহের ধাতু ধর্ম তত হ্রাস পায়। অপরদিকে একই গ্রুপে যত উপর হতে নিচে যাওয়া যায়, মৌলসমূহের ধাতু ধর্ম তত বৃদ্ধি পায়।

মৌলসমূহের ক্রিয়াশীলতার ক্রম পরিবর্তন : গ্রুপ I ও গ্রুপ II মৌলসমূহের ক্ষেত্রে যতই নিচের দিকে যাওয়া যায়, ততই ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে গ্রুপ VII মৌলসমূহের ক্ষেত্রে যতই উপরদিকে যাওয়া যায়, ততই ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পায়।

পর্যায়বৃত্তিক ধর্মসমূহ : মৌলসমূহের কতিপয় ধর্ম পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়, তাদেরকে পর্যায়বৃত্তিক ধর্ম বলা হয়। পরমাণুর আকার, ধাতব বৈশিষ্ট্য, যোজনী প্রভৃতি এ ধর্মের উদাহরণ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

ঘ. পর্যায় 4, গ্রুপ 0

iii এর সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তরে দুইটি ইলেকট্রন বিদ্যমান

ঘ. i, ii ও iii

Li	Be	B	C	N	O	F
2, 1	2, 2	2, 3	2, 4	2, 5	2, 6	2, 7

ঘ. ৬ষ্ঠ পর্যায়ে

iii. পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পায়

ঘ. i, ii ও iii

৫. পর্যায় সারণিতে গ্রুপ II এর মৌলসমূহের যতই নিচের দিকে যাওয়া যায় ততই—

- ইলেকট্রনের একটি নতুন স্তর যুক্ত হয়;
- আণবিক ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পায়;
- মৌলসমূহের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়

কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

পর্যায় সারণির একটি গ্রুপের মৌলগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাস ও পারমাণবিক ব্যাসার্ধ নিম্নে দেওয়া হল :

মৌল	ইলেকট্রন বিন্যাস	পারমাণবিক ব্যাসার্ধ
Li	2, 1	2.05
Na	2, 8, 1	2.23
K	2, 8, 8, 1	2.77
Rb	2, 8, 18, 8, 1	2.98
Cs	2, 8, 18, 18, 8, 1	3.34

উপরের ছক ব্যবহার করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- প্রদত্ত মৌলগুলো পর্যায় সারণির কোন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত?
- প্রদত্ত মৌলগুলোকে ঐ গ্রুপে রাখা হয়েছে কেন?
- 24 পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলটির ইলেকট্রন বিন্যাস দেখিয়ে পর্যায় সারণিতে এর অবস্থান নির্ণয় কর।
- ছকে প্রদত্ত মৌলগুলোর রাসায়নিক সক্রিয়তা পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়ে যায়—
উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

অষ্টম অধ্যায়

রাসায়নিক ক্রিয়া

বিষয়বস্তু : রাসায়নিক ক্রিয়া, এর বৈশিষ্ট্য ও কারণ।

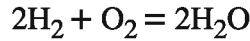
রাসায়নিক ক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগ : সংযোজন, বিয়োজন, প্রতিস্থাপন, দ্বিবিয়োজন, পানিযোজন, প্রশমন, সমাণুকরণ, জারণ-বিজারণ, পলিমারকরণ।

রাসায়নিক ক্রিয়া সংগঠনে বিভিন্ন বিষয়ের ভূমিকা : সংস্পর্শ, দ্রবণ, তাপমাত্রা, আলোক, বিদ্যুৎ প্রবাহ, চাপ ও আঘাত, শব্দ কম্পন, প্রভাবক ও প্রভাবন, প্রভাবকের শ্রেণীবিভাগ।

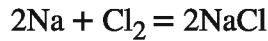
৮.১ রাসায়নিক ক্রিয়া বা বিক্রিয়া (Chemical action or reaction)

সংজ্ঞা : যে প্রক্রিয়ায় এক বা একাধিক বস্তু এক বা একাধিক নতুন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, তাকে রাসায়নিক ক্রিয়া বা বিক্রিয়া বলা হয়।

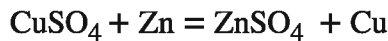
যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে পানি উৎপাদন করে। এক্ষেত্রে পানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। সুতরাং এ প্রক্রিয়া একটি রাসায়নিক ক্রিয়া।



বিক্রিয়ার কারণ : কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সঠিক কারণ নির্দেশ করা কঠিন। তবে রসায়নবিদগণ মনে করেন যে, বিভিন্ন মৌলের পরমাণুসমূহের পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার প্রবণতা বা আসক্তি আছে। এ আসক্তির বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন বিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। যেমন ধাতুসমূহের সাথে অধাতুসমূহের মিলিত হওয়ার বিশেষ আসক্তি আছে। তাই সোডিয়াম ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করে।

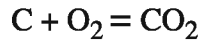


আবার কপারের চেয়ে জিংকের ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা বেশি। তাই জিংক পরমাণু ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে কপার সালফেট হতে কপার প্রতিস্থাপিত করে।



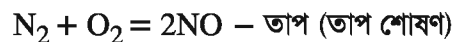
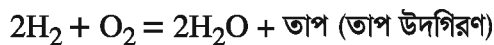
বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ : যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রদর্শন করে :

(১) বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট বস্তুসমূহের ধর্ম বিক্রিয়কসমূহের ধর্ম হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। যেমন :

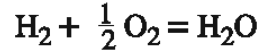
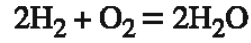


এ বিক্রিয়ায় একটি বিক্রিয়ক কার্বন হচ্ছে কৃষ্ণ বর্ণের কঠিন পদার্থ, যা কয়লার প্রধান উপাদান। আরেকটি বিক্রিয়ক অক্সিজেন গ্যাস, যা দহনে সাহায্য করে এবং যা মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য অত্যন্ত জরুরি। অপরদিকে উৎপাদিত কার্বন ডাইঅক্সাইড একটি গ্যাস, যা দহন বন্ধ করে। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শ্বাস রোধ করে। কার্বন ডাইঅক্সাইড চূনের পানিকে ঘোলা করে; কার্বন বা অক্সিজেন তা করে না।

(২) বিক্রিয়ায় অবশ্যই তাপের উদগিরণ বা শোষণ হবে। যেমন :



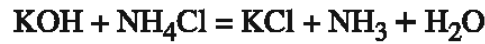
(৩) একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া সর্বদা বিক্রিয়কসমূহের একটি নির্দিষ্ট ভর অনুপাতে অনুষ্ঠিত হয়। যেমন :



এক্ষেত্রে 1 mole অণু হাইড্রোজেন $\frac{1}{2}$ mole অণু অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে 1 mole পানি উৎপন্ন করে।

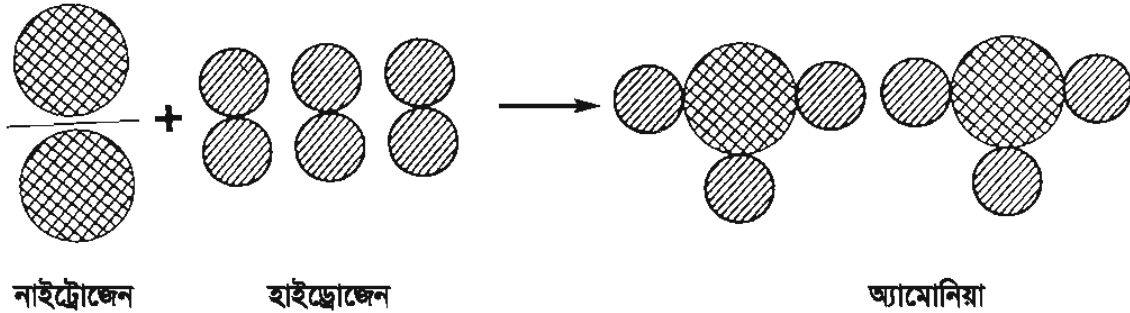
অর্থাৎ সব সময় 1 ভাগ ভরের হাইড্রোজেনের সাথে ৪ ভাগ ভরের অক্সিজেনের বিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে।

(৪) একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোনো পরমাণুর সৃষ্টি বা বিলুপ্তি ঘটে না। সুতরাং বিক্রিয়ক ও উৎপাদসমূহে বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে

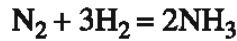


এ বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কসমূহে সর্বমোট একটি পটাশিয়াম পরমাণু, একটি অক্সিজেন পরমাণু, একটি নাইট্রোজেন পরমাণু, একটি ক্লোরিন পরমাণু এবং পাঁচটি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। উৎপাদসমূহেও সর্বমোট হিসাবে এ সকল সংখ্যা অপরিবর্তিত আছে।

(৫) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ বিক্রিয়কসমূহের মোট ভর এবং উৎপাদসমূহের মোট ভর একই হবে।



চিত্র ৮.১ : অ্যামোনিয়া সংশ্লেষণ

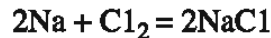


এক্ষেত্রে 1 মোল নাইট্রোজেন 3 মোল হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে 2 মোল অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে। 28g নাইট্রোজেন ও 6g হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে 34g অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করবে। বিক্রিয়কসমূহের মোট ভর $28 + 6 = 34\text{g}$ ।

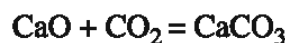
৮.২ বিক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগ

অনেক প্রকারের রাসায়নিক বিক্রিয়া আছে। তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটি আলোচিত হল :

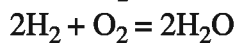
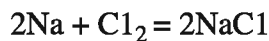
১। **সংযোজন (Addition)** : যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোনো যৌগ তার সরলতম উপাদানসমূহের প্রত্যক্ষ সংযোগে সৃষ্টি হয়, তাকে সংযোজন বলা হয়। যেমন সোডিয়াম ও ক্লোরিন পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করে।



একইভাবে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হওয়া একটি সংযোজন বিক্রিয়া।

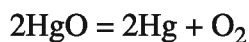
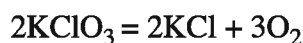
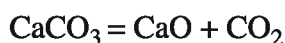


২। **সংশ্লেষণ (Synthesis)** : যে বিক্রিয়ায় কোনো যৌগ তার উপাদান মৌলসমূহের প্রত্যক্ষ সংযোগে উৎপন্ন হয় তাকে সংশ্লেষণ বলা হয়। যেমন সোডিয়াম ও ক্লোরিনের সংযোগে সোডিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হওয়া এবং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে পানি উৎপন্ন হওয়া উভয়েই সংশ্লেষণ বিক্রিয়া।

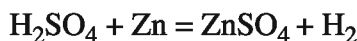


সকল সংশ্লেষণ বিক্রিয়া সংযোজন বিক্রিয়া। তবে কোনো কোনো সংযোজন বিক্রিয়া সংশ্লেষণ বিক্রিয়া নয়। যেমন ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সৃষ্টি।

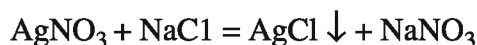
৩। **বিয়োজন (Decomposition)** : যে বিক্রিয়ায় কোনো যৌগ তার সরল উপাদানসমূহে বিভক্ত হয় তাকে বিয়োজন বলা হয়। বিয়োজন সংযোজন বিক্রিয়ার বিপরীত। যেমন ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে উত্তপ্ত করলে তা ভেঙে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে।



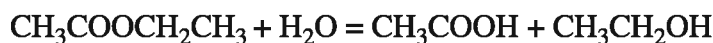
৪। **প্রতিস্থাপন (Substitution)** : যে বিক্রিয়ায় একটি মৌল বা মূলক একটি যৌগ হতে কোনো মৌলকে অপসারণ করে তার স্থান দখল করে, তাকে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলা হয়। যেমন জিংক সালফিউরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে তার অণু হতে হাইড্রোজেনকে অপসারণ করে তার স্থান দখল করে।



৫। **দ্বিবিয়োজন (Double decomposition)** : যে বিক্রিয়ায় দুইটি যৌগ পরস্পরের মধ্যে তাদের উপাদান মূলক বা পরমাণু বিনিময় করে দুইটি নতুন যৌগ উৎপন্ন করে, তাকে দ্বিবিয়োজন বলা হয়। যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড ও সিলভার নাইট্রেটের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম নাইট্রেট ও সিলভার ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।



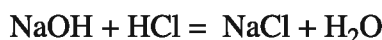
৬। **পানিযোজন (Hydrolysis)** : যে দ্বিবিয়োজন বিক্রিয়ায় পানি কোনো যৌগের সাথে বিক্রিয়া করে একাধিক নতুন যৌগ উৎপাদন করে, তাকে পানিযোজন বলা হয়। সাধারণত পানি H ও OH এ দুইটি অংশে বিভক্ত হয়। যেমন এস্টারের আর্দ্র বিশ্লেষণে এসিড ও অ্যালকোহল উৎপাদিত হয়।



বিভিন্ন লবণের আর্দ্র বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ; তবে এগুলো সাধারণত উভমুখী।



৭। **প্রশমন (Neutralisation)** : একটি ক্ষারক ও অম্লের মধ্যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে লবণ ও পানি সৃষ্টি হওয়াকে প্রশমন বলা হয়। যেমন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মধ্যে বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড ও পানি উৎপন্ন হয়।



৮। **সমাণুকরণ (Isomerisation) বিক্রিয়া** : যে বিক্রিয়ায় কোনো যৌগের অণুতে পরমাণুসমূহ পুনর্বিন্যস্ত হয়ে অন্য সমাণু (isomer) উৎপন্ন করে তাকে সমাণুকরণ বিক্রিয়া বলা হয়। যেমন অ্যামোনিয়াম সায়ানেটকে উত্তপ্ত করলে ইউরিয়ায় রূপান্তরিত হয়। একে পুনর্বিন্যাস (rearrangement) বিক্রিয়াও বলা হয়।



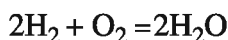
অ্যামোনিয়াম সায়ানেট

ইউরিয়া

৮। জারণ-বিজারণ (Redox) বিক্রিয়া : যে বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কে উপস্থিত কোনো মৌলের সক্রিয় যোজনীর হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তাকে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া বলা হয়। যেমন ফেরাস ক্লোরাইডের সাথে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় ফেরিক ক্লোরাইডের সৃষ্টি হয়। বিক্রিয়কে আয়রনের যোজনী +2, উৎপাদে আয়রনের যোজনী +3। আবার বিক্রিয়কে ক্লোরিনের যোজনী শূন্য, উৎপাদে -1। সুতরাং এটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া।



হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে পানি উৎপাদনও একটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া। কেননা বিক্রিয়ার পূর্বে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন উভয়ের সক্রিয় যোজনী ছিল শূন্য। বিক্রিয়ার পরে হাইড্রোজেনের সক্রিয় যোজনী হচ্ছে +1 এবং অক্সিজেনের -2। জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া সম্পর্কে নিচে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।



৯। পলিমারকরণ : যে বিক্রিয়ায় এক বা একাধিক যৌগের অনেকগুলো অণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে বড় অণু সৃষ্টি করে, তাকে পলিমারকরণ বিক্রিয়া বলা হয়। যেমন ইথিলিনের বহু সংখ্যক অণু একত্রিত হয়ে পলিইথিলিন তৈরি করে। ইথিলিন একটি গ্যাস। পলিইথিলিন হচ্ছে প্লাস্টিক, এর বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :



৮.৩ জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া (Oxidation-reduction reactions)

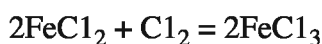
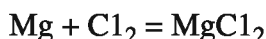
রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহের মধ্যে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে; সুতরাং তা এখানে পৃথকভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম দিককার ধারণা অনুসারে, যে বিক্রিয়ার কোনো বস্তুর সাথে অক্সিজেনের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে, তাকে জারণ বলা হয়। যেমন বিভিন্ন ধরনের দহন।

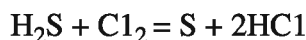


উল্লেখ্য যে, অক্সিজেন একটি তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল।

পরবর্তীতে অন্যান্য তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল বা মূলক সংযোগকেও জারণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন ম্যাগনেসিয়ামের সাথে ক্লোরিনের সংযোগ বা ফেরাস ক্লোরাইডের সাথে ক্লোরিনের সংযোগ প্রভৃতি।



একইভাবে পূর্বকার ধারণা অনুসারে, যে বিক্রিয়ায় কোনো যৌগ থেকে হাইড্রোজেনের অপসারণ ঘটে তাকে জারণ বলা হয়। যেমন হাইড্রোজেন সালফাইডের সাথে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় সালফারের সাথে যুক্ত হাইড্রোজেন অপসারিত হয় সুতরাং এটি একটি জারণ বিক্রিয়া।



উল্লেখ্য যে, হাইড্রোজেন একটি তড়িৎ ধনাত্মক মৌল।

সুতরাং জারণের ব্যাপকতর সংজ্ঞা হচ্ছে :

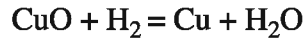
যে বিক্রিয়ায় কোনো মৌল বা যৌগে কোনো তড়িৎ ঋণাত্মক পরমাণু বা মূলক সংযুক্ত হয় বা তাদের অনুপাত বৃদ্ধি পায় অথবা কোনো তড়িৎ ধনাত্মক পরমাণু বা মূলকের অপসারণ ঘটে বা তাদের অনুপাত হ্রাস পায়, সেই বিক্রিয়াকে জারণ বলা হয়।

যে পদার্থটির জারণ ঘটে, তা জারিত হয়েছে বলা হয় এবং যা দ্বারা জারণ সংঘটিত হয়, তাকে জারক বলা হয়।

যেমন হাইড্রোজেন ও কার্বনের দহনের সময় তারা জারিত হয়েছে এবং অক্সিজেন দ্বারা জারণ সংঘটিত হয়েছে, সুতরাং অক্সিজেন একটি জারক পদার্থ। ম্যাগনেসিয়াম ও ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরিন দ্বারা জারিত হয়েছে। একইভাবে ক্লোরিন ফেরাস ক্লোরাইডকে জারিত করেছে। অর্থাৎ ক্লোরিন একটি জারক। জারণের বিপরীত প্রক্রিয়া হচ্ছে বিজারণ। অতএব বিজারণের সংজ্ঞা হচ্ছে—

যে বিক্রিয়ায় কোনো মৌল বা যৌগে কোনো তড়িৎ ধনাত্মক মৌল বা মূলকের সংযোগ ঘটে বা তাদের অনুপাত বৃদ্ধি পায় অথবা কোনো যৌগের অণু হতে তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল বা মূলকের অপসারণ ঘটে বা তাদের অনুপাত হ্রাস পায়, সেই বিক্রিয়াকে বিজারণ বলা হয়।

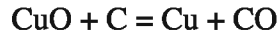
যে বস্তুটির বিজারণ ঘটে, তা বিজারিত হয়েছে বলা হয় এবং যা দ্বারা বিজারণ ঘটে তাকে বিজারক বলা হয়। পূর্বে উল্লিখিত দহন বিক্রিয়ায় অক্সিজেন বিজারিত হয়েছে এবং হাইড্রোজেন ও কার্বন বিজারক। নিচের বিক্রিয়াটি লক্ষ কর :



এ বিক্রিয়ায় বস্তুর অক্সাইড হতে তড়িৎ ঋণাত্মক অক্সিজেনের অপসারণ হয়েছে। সুতরাং কপার অক্সাইড বিজারিত হয়েছে। হাইড্রোজেন দ্বারা এ বিজারণ হওয়ায় হাইড্রোজেন একটি বিজারক। একই সাথে বলা যায় যে, হাইড্রোজেন জারিত হয়ে পানি হয়েছে এবং এ অর্থে কপার অক্সাইড জারক।

জারণ ও বিজারণ সবসময় যুগপৎ বা এক সাথে সংঘটিত হয়।

আমরা নিম্নোক্ত বিক্রিয়াটি একটু ভালোভাবে বিশ্লেষণ করি :



এ বিক্রিয়ায় কপার অক্সাইড হতে তড়িৎ ঋণাত্মক অক্সিজেন অপসারিত হয়েছে, সুতরাং কপার অক্সাইডের বিজারণ ঘটেছে। কার্বন কপার অক্সাইডকে বিজারিত করেছে, সুতরাং কার্বন বিজারক। আবার একই সাথে কার্বনের সাথে অক্সিজেনের সংযুক্তি ঘটেছে। সুতরাং কার্বনের জারণ সংঘটিত হয়েছে। কপার অক্সাইড দ্বারা এ জারণ সংঘটিত হয়েছে; সুতরাং এটি জারক।

এ সকল উদাহরণ হতে আমরা নিম্নোক্ত দুইটি সংজ্ঞা পাই :

জারক : যে বস্তু অন্য কোনো বস্তুর জারণ ঘটায় এবং নিজে বিজারিত হয়, তাকে জারক বলা হয়।

বিজারক : যে বস্তু অন্য কোনো বস্তুর বিজারণ ঘটায় এবং নিজে জারিত হয়, তাকে বিজারক বলা হয়।

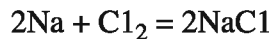
জারক পদার্থের উদাহরণ হচ্ছে অক্সিজেন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রভৃতি। বিজারক পদার্থের উদাহরণ হচ্ছে সকল ধাতু, হাইড্রোজেন, কার্বন প্রভৃতি।

৮.৪ জারণ ও বিজারণের ইলেকট্রনীয় ধারণা (Electronic concept of oxidation and reduction)

আধুনিক সংজ্ঞানুযায়ী :

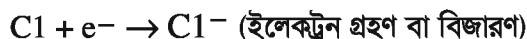
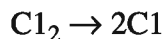
যে বিক্রিয়ায় কোনো রাসায়নিক সত্তা (অণু, পরমাণু, মূলক বা আয়ন) ইলেকট্রন প্রদান করে, তাকে জারণ এবং যে বিক্রিয়ায় কোনো রাসায়নিক সত্তা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে বিজারণ বলা হয়।

যেমন সোডিয়াম ও ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।



এ বিক্রিয়ায় সোডিয়াম পরমাণুর সাথে তড়িৎ ঋণাত্মক ক্লোরিন সংযুক্ত হয়েছে; সুতরাং সোডিয়ামের জারণ সংঘটিত হয়েছে। আবার ক্লোরিনের সাথে তড়িৎ ধনাত্মক সোডিয়াম সংযুক্ত হওয়ায় ক্লোরিনের বিজারণ হয়েছে। অপরদিকে রাসায়নিক বন্ধনের ইলেকট্রনীয় তত্ত্ব মতে সোডিয়াম পরমাণু একটি ইলেকট্রন দান করেছে এবং ক্লোরিন পরমাণু

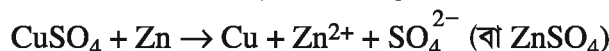
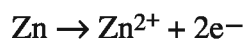
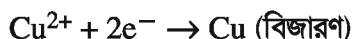
সেটিকে গ্রহণ করেছে। এ দুটো বস্তুব্যকে একত্রিত করলে জারণ বিজারণের আধুনিক সংজ্ঞা বুঝা যায়।



উপরের ২য় ও ৩য় সমীকরণকে ২ দ্বারা গুণ করার পর ১ নং সমীকরণের সাথে যোগ করার পর পাওয়া যায়।



অন্যান্য জারণ বিজারণ বিক্রিয়ায় এই একই ব্যাপারে ঘটে।



উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় সনাতন ধারণা অনুযায়ী কপার সালফেট থেকে তড়িৎ ঋণাত্মক সালফেট মূলক অপসারিত হয়েছে, তাই কপার লবণের বিজারণ হয়েছে। আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী কপার আয়নের সাথে দুইটি ইলেকট্রন সংযুক্ত হয়েছে, সুতরাং কপার আয়ন বিজারিত হয়েছে।

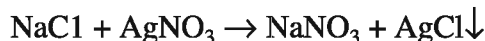
আবার সনাতন সংজ্ঞা অনুযায়ী জিংকের সাথে তড়িৎ ঋণাত্মক সালফেট মূলক যুক্ত হয়েছে, সুতরাং এর জারণ হয়েছে। আধুনিক সংজ্ঞানুযায়ী জিংক পরমাণু দুইটি ইলেকট্রন দান করেছে, অর্থাৎ তার জারণ হয়েছে। যেহেতু মুক্ত ইলেকট্রন বিরাজ করে না, তাই কোনো পরমাণু বা আয়ন ইলেকট্রন দান করলে অন্য কোনো পরমাণু বা আয়ন তা গ্রহণ করে নেয়। অর্থাৎ জারণ ও বিজারণ একত্রেই সংঘটিত হয়।

৮.৫ রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটনের বিভিন্ন উপায়

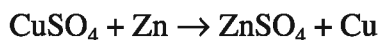
রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ নিম্নোক্ত উপায়ে সংঘটিত হয় :

১। **সংস্পর্শ** : রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত করার ক্ষেত্রে প্রধান শর্ত হচ্ছে যে বিক্রিয়কসমূহ পরস্পরের সংস্পর্শে আসতে হবে। একটি গ্যাস জারে হাইড্রোজেন এবং অন্য গ্যাস জারে অক্সিজেন নিয়ে যা কিছু করা হোক না কেন, তারা পরস্পরের সংস্পর্শে না আসা পর্যন্ত বিক্রিয়া হবে না।

২। **দ্রবণ** : বিক্রিয়কসমূহকে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে তাদের দ্রবীভূত করে এ সকল দ্রবণকে মিশ্রিত করা। যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইড ও সিলভার নাইট্রেটের শুষ্ক গুঁড়া একত্রে মিশালে কোনো বিক্রিয়া হয় না, অথচ তাদের দ্রবণ একত্রে মিশানোর সাথে সাথে বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং সিলভার ক্লোরাইডের অধঃক্ষেপ পড়ে।



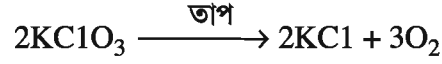
কোনো ক্ষেত্রে সকল বিক্রিয়ককে দ্রবীভূত করা সম্ভব না হলে অন্ততপক্ষে একটি বিক্রিয়ককে দ্রবণে আনা প্রয়োজন। যেমন কঠিন কপার সালফেট ও জিংক শুকনো অবস্থায় বিক্রিয়া করে না। কিন্তু কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণের সাথে কঠিন জিংক বিক্রিয়া করে।



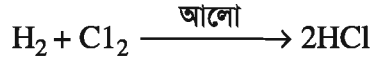
বাজারে বর্তমানে বিভিন্ন শরবতের শুকনো গুঁড়া পাওয়া যায়। তাদের পানিতে দিলেই বুদবুদ গ্যাস উৎপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে সেখানে সোডিয়াম বাইকার্বনেট ও সাইট্রিক এসিডের শুকনো গুঁড়া থাকে। মিশ্রিত অবস্থাতেও তারা বিক্রিয়া করে না; কিন্তু পানিতে দেওয়া মাত্র বিক্রিয়া করে সোডিয়াম সাইট্রেট এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে, যা বুদবুদ আকারে বের হয়।

৩। **তাপ** : সাধারণত তাপ প্রয়োগে রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। তবে অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়া সাধারণ তাপমাত্রায় অনুষ্ঠিত হয় না; উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। যেমন পটাসিয়াম ক্লোরেট সাধারণ তাপমাত্রায় বিয়োজিত

হয় না; কিন্তু উচ্চতর তাপমাত্রায় পটাসিয়াম ক্লোরাইড ও অক্সিজেনে বিয়োজিত হয়।



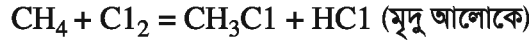
৪। আলোক : আলোক এক প্রকার শক্তি। কোনো কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া অন্ধকারে সংঘটিত হয় না। কিন্তু আলোর উপস্থিতিতে হয়। যেমন হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের মিশ্রণ অন্ধকারে রেখে দিলে কোনো বিক্রিয়া হয় না। আলোতে আনলে বিস্ফোরণসহ বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।



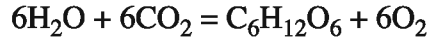
কোনো কোনো বিক্রিয়া মৃদু আলোতে একভাবে এবং প্রখর আলোতে অন্যভাবে সংঘটিত হয়। যেমন মিথেন ও ক্লোরিনের মিশ্রণ প্রখর সূর্যালোকে আনলে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।



অথচ মৃদু আলোকে এই বিক্রিয়া মিশ্রণ হতে মিথাইল ক্লোরাইড প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।



জীবজগৎ টিকে থাকার ক্ষেত্রে সালোক সংশ্লেষণ বিক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিণীম। এটি প্রাণিজগতের খাবার ও অক্সিজেন যোগায়। সূর্যালোকের প্রভাবে এ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।



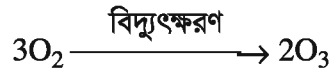
৫। বিদ্যুৎ প্রবাহ : অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। যেমন পানির মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তৈরি করা যায়।



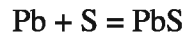
একইভাবে লবণ পানির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করে কস্টিক সোডা, হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন উৎপাদন করা হয়।



অক্সিজেনের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দ বিদ্যুৎক্ষরণের মাধ্যমে ওজোন তৈরি করা হয়।

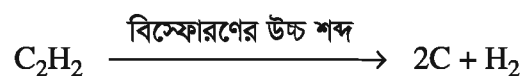


৬। চাপ ও আঘাত : কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাপ বা আঘাতের মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। লেড ও সালফারের গুঁড়াকে প্রবল চাপ দিলে তারা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে লেড সালফাইড উৎপন্ন করে।



মাটির নিচে প্রবল চাপ ও উচ্চ তাপমাত্রায় সাধারণ কয়লা দীর্ঘদিন পরে হীরকে রূপান্তরিত হয়। সাধারণ পটকাবাজি, হাতবোমা প্রভৃতি সজোরে কঠিন পদার্থের উপর নিক্ষেপ করলে বিস্ফোরিত হয়। আঘাতজনিত কম্পনের কারণে উপাদানসমূহের মধ্যে এ প্রচণ্ড বিক্রিয়া ঘটে।

৭। শব্দ কম্পন : কোনো কোনো সময় শব্দ কম্পন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। যেমন অ্যাসিটিলিন গ্যাসের নিকট মার্কারি ফিলামেন্ট বিস্ফোরিত করলে যে উচ্চ শব্দ সৃষ্টি হয়, তার প্রভাবে অ্যাসিটিলিন বিয়োজিত হয়।



এ অধ্যায় আমরা যা শিখলাম

রাসায়নিক ক্রিয়া : যে প্রক্রিয়ায় এক বা একাধিক বস্তু এক বা একাধিক নতুন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, তাকে রাসায়নিক ক্রিয়া বা বিক্রিয়া বলা হয়।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ : (১) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সৃষ্ট বস্তুসমূহের ধর্ম বিক্রিয়কসমূহ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। (২) এতে অবশ্যই তাপের উদ্গিরণ বা শোষণ হবে। (৩) একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া সর্বদা বিক্রিয়কসমূহের একটি নির্দিষ্ট ভর অনুপাতে অনুষ্ঠিত হয়। (৪) বিক্রিয়ক ও উৎপাদসমূহে বিভিন্ন মৌলের পরমাণু সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। (৫) ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগ : অনেক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া বিদ্যমান। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীসমূহ হচ্ছে : সংযোজন, বিয়োজন, প্রতিস্থাপন, দ্বিবিয়োজন, পানিযোজন, প্রশমন, সমাণুকরণ, জারণ-বিজারণ ও পলিমারকরণ।

জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া : যে বিক্রিয়ায় কোনো রাসায়নিক সত্তা (অণু পরমাণু, মূলক বা আয়ন) ইলেকট্রন প্রদান করে তাকে জারণ এবং যে বিক্রিয়ায় কোনো রাসায়নিক সত্তা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে বিজারণ বলা হয়।

রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটনের বিভিন্ন উপায় : রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটনে যে সকল বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা হচ্ছে সংস্পর্শ, দ্রবণ, তাপমাত্রা, আলোক, চাপ, আঘাত, শব্দ, বিদ্যুৎ প্রবাহ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. $2F_2 + 2H_2O = 4HF + O_2$ বিক্রিয়াটি কোন ধরনের?

- | | |
|----------------|-------------|
| ক. প্রশমন | খ. বিশ্লেষণ |
| গ. জারণ-বিজারণ | ঘ. দহন |

২. $CaSO_4 + Zn = ZnSO_4 + Ca$, এ বিক্রিয়াটির ক্ষেত্রে—

- Zn জারক হিসেবে কাজ করেছে
- $CaSO_4$ জারিত হয়েছে
- Zn জারিত হয়েছে

কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. iii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

৩। $\text{FeCl}_2 + \text{Cl}_2 = \text{FeCl}_3$ বিক্রিয়াটিতে—

- ক্লোরিন জারিত হয়েছে
- ক্লোরিন জারক হিসেবে কাজ করেছে
- আয়রন জারিত হয়েছে

কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. iii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

৪। $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} = \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ বিক্রিয়াটিতে কোনটি বিজারক হিসেবে কাজ করে?

- | | |
|---------------------|-------|
| ক. Cu^{2+} | খ. Zn |
| গ. Zn^{2+} | ঘ. Cu |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। $\text{Mg} + \text{Cl}_2 = \text{MgCl}_2$

- উপরে প্রদত্ত বিক্রিয়ার কোনটি জারক?
- বিক্রিয়াটি একটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া— ব্যাখ্যা কর।
- Mg ও O_2 এর মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়াটিও একটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া প্রমাণ কর।
- প্রশমন বিক্রিয়ার সাথে উল্লেখিত বিক্রিয়াটির পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

নবম অধ্যায়

রাসায়নিক গতিবিদ্যা ও সাম্যাবস্থা

বিষয়বস্তু : রাসায়নিক গতিবিদ্যা, বিক্রিয়ার গতির ওপর তাপমাত্রা, ঘনমাত্রা বা ঘনত্ব ও প্রভাবকের প্রভাব, উভমুখী বিক্রিয়া, রাসায়নিক সাম্যাবস্থা, সাম্যাবস্থার ওপর বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাব, লা শাতেলিয়ে নীতি, শিল্পক্ষেত্রে অ্যামোনিয়া এবং সালফার ট্রাইঅক্সাইড সংশ্লেষণে লা শাতেলিয়ে নীতির প্রয়োগ।

রাসায়নিক গতিবিদ্যা ও সাম্যাবস্থা

৯.১ রাসায়নিক গতিবিদ্যা (Chemical kinetics)

রসায়নের যে শাখায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগ সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হয় তাকে রাসায়নিক গতিবিদ্যা বলা হয়।

বিভিন্ন বিক্রিয়া সম্পন্ন হতে বিভিন্ন সময় প্রয়োজন হয়, যা নির্ভর করে বিক্রিয়ক ও উৎপাদের বৈশিষ্ট্যের ওপর এবং বিক্রিয়ার শর্তের ওপর। কোনো কোনো বিক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন আবার কোনো কোনো বিক্রিয়া অত্যন্ত ধীর গতি সম্পন্ন। যেমন এসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়া অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়। অপরদিকে লোহার উপর মরিচা পড়া খুব ধীরে ঘটে।

একক সময়ে একটি বিক্রিয়ার উৎপন্ন উৎপাদের পরিমাণ বা ব্যবহৃত বিক্রিয়কের পরিমাণকে বিক্রিয়ার হার বলে। বিক্রিয়ার হার কয়েকটি নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয় তন্মধ্যে তাপমাত্রা, চাপ (গ্যাসীয় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে), বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা এবং প্রভাবকের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।

৯.২ তাপমাত্রার প্রভাব

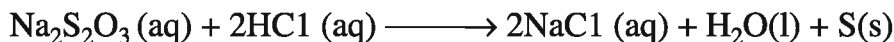
তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পায়। বিক্রিয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে বিক্রিয়কগুলোর পরস্পরের মধ্যে ধাক্কা লাগতে হবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বিক্রিয়কগুলোর গতি বৃদ্ধি পায়। ফলে তাদের মধ্যে ঘন ঘন ধাক্কা লাগে এবং বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পায়। সাধারণত প্রতি 10°C তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য বিক্রিয়ার গতি ২ গুণ বৃদ্ধি পায়।

৯.৩ বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার প্রভাব

সাধারণত বিক্রিয়ার হার বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত। বিক্রিয়কসমূহের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পায়। তবে কিছু কিছু বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়।

বিক্রিয়ার বেগের ওপর তাপমাত্রা ও ঘনমাত্রার প্রভাব নিম্নের পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝা যাবে।

সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণে হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ করলে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া ঘটে।



উক্ত বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা ও তাপমাত্রার প্রভাব পরীক্ষা করা সম্ভব।

৯.৪ বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার প্রভাবের পরীক্ষা

পাঁচটি টেস্ট টিউবে যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ mL ০.২৫ M সোডিয়াম থায়োসালফেট ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) দ্রবণ নাও এবং এদের মধ্যে যথাক্রমে ৫, ৪, ৩, ২ ও ১ mL পানি মিশাও। প্রতি টিউবে মোট দ্রবণের পরিমাণ ৬ mL, কিন্তু টেস্ট টিউবগুলোতে $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ এর ঘনমাত্রা ভিন্ন। প্রথম টিউবে সবচেয়ে কম ও শেষ টিউবে সবচেয়ে বেশি ঘনমাত্রার দ্রবণ আছে। এখন প্রতিটি টিউবে ২ mL করে ২M HCl দ্রবণ যোগ করে ঝাকি দিয়ে মিশাও এবং টেস্ট টিউবগুলো পাশাপাশি রাখ এবং টিউবগুলোর পিছনে এক টুকরা সাদা কাগজ রাখ। কঠিন সালফার উৎপন্ন হওয়ায় দ্রবণগুলো ক্রমশ ঘোলাটে হবে। দেখা যাবে যে, সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ঘোলা হবে ৫ নং টিউবের দ্রবণ। ৪ নং টিউবে একটু পরে ঘোলা হবে, এভাবে সবচেয়ে দেরিতে ঘোলা হবে ১ নং টিউবের দ্রবণ। এখানে প্রতিটি টেস্ট টিউবে দ্রবণের পরিমাণ সমান, HCl-এর

পরিমাণ সমান। শুধু $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ -এর ঘনমাত্রার পার্থক্যের কারণে বিক্রিয়ার বেগের পার্থক্য হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ঘনমাত্রার দ্রবণে বিক্রিয়ার বেগ সবচেয়ে বেশি। ফলে বিক্রিয়া সম্পন্ন হতে সবচেয়ে কম সময় লাগছে।

৯.৫ তাপমাত্রার প্রভাবের পরীক্ষা

উপরের পরীক্ষাটি যদি এবার উচ্চ তাপমাত্রায় করা যায় তবে বিক্রিয়ার হারের ওপর তাপমাত্রার প্রভাব সহজে বুঝা যাবে। উপরের ন্যায় একইভাবে পাঁচটি টেস্ট টিউবে বিভিন্ন ঘনমাত্রার $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ -এর দ্রবণ তৈরি কর এবং টিউবগুলোকে গরম পানিতে অর্ধেক নিমজ্জিত করে রাখ, যেন দ্রবণে কোনো পানি ঢুকতে না পারে। গরম পানির তাপমাত্রা $70^\circ-90^\circ\text{C}$ হলে ভালো হয়। দশ মিনিট পর পূর্বের ন্যায় প্রতিটি টেস্ট টিউবে সমপরিমাণ (2 mL) HCl যোগ করে ঘোলাটে হওয়া পর্যবেক্ষণ কর। দেখবে প্রথম পরীক্ষার তুলনায় এবার অনেক কম সময়ে প্রতিটি টেস্ট টিউবের দ্রবণসমূহ ঘোলাটে হয়ে যাবে। প্রথম পরীক্ষা আর দ্বিতীয় পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য শুধু তাপমাত্রা। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পায়।

৯.৬ প্রভাবক ও প্রভাবন (Catalyst and catalysis)

যে বস্তু কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কের সংস্পর্শে থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি বা হ্রাস করে, কিন্তু বিক্রিয়ার শেষে ভরে এবং রাসায়নিক সংযুক্তিতে অপরিবর্তিত থাকে, তাকে ঐ বিক্রিয়ার প্রভাবক বলা হয় এবং এ প্রক্রিয়াকে প্রভাবন বলা হয়। প্রভাবকের উপস্থিতিতে কোনো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি পায়, আবার কোনো কোনো বিক্রিয়ার গতি হ্রাস পায়। যেমন পটাশিয়াম ক্লোরেট হতে অক্সিজেন প্রস্তুতির সময় ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি তার বিয়োজনের গতি বৃদ্ধি করে।

প্রভাবকের শ্রেণীবিভাগ (Types of catalysts)

প্রভাবক ও প্রভাবন প্রধানত দুই প্রকার। যথা (১) ধনাত্মক ও (২) ঋণাত্মক।

১। **ধনাত্মক প্রভাবক** : যে প্রভাবক কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার স্বাভাবিক গতিকে বৃদ্ধি করে, তাকে ধনাত্মক প্রভাবক বলা হয়। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের দ্রবণে বালু (SiO_2) বা ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড যোগ করলে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দ্রুত বিয়োজিত হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে বালু ও ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ধনাত্মক প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

২। **ঋণাত্মক প্রভাবক** : যখন কোনো প্রভাবক কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার স্বাভাবিক গতিকে হ্রাস করে, তখন তাকে ঋণাত্মক প্রভাবক বলা হয়। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের দ্রবণ স্বাভাবিক অবস্থায় ধীরে ধীরে বিয়োজিত হয়। কিন্তু এতে ফসফরিক এসিড বা সালফিউরিক এসিড বা গ্লিসারিন অল্প পরিমাণে যোগ করলে বিয়োজনের হার হ্রাস পায়। সুতরাং এ সকল বস্তু এক্ষেত্রে ঋণাত্মক প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

৯.৭ শিল্পক্ষেত্রে প্রভাবকের ব্যবহার

যেহেতু প্রভাবক রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবৃদ্ধি করতে পারে, সেহেতু শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত ও স্বল্পব্যয়ে বিভিন্ন যৌগ তৈরিতে বিভিন্ন প্রভাবক ব্যবহৃত হয়। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল :

(ক) অ্যামোনিয়ার শিল্প উৎপাদন : হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন হতে হেবার পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া প্রস্তুতির জন্য বিজারিত লোহার গুঁড়া প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(খ) অ্যামোনিয়া হতে নাইট্রিক এসিড প্রস্তুতি : অসওয়াল্ড পদ্ধতিতে নাইট্রিক এসিড প্রস্তুতির একটি ধাপে অ্যামোনিয়াকে বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা জারিত করে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করা হয়। এ বিক্রিয়ায় প্লাটিনাম প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

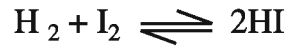
(গ) সালফিউরিক এসিডের প্রস্তুতি : স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতির একটি ধাপে সালফার ডাইঅক্সাইডকে বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা জারিত করে সালফার ট্রাইঅক্সাইড তৈরি করা হয়। এ বিক্রিয়ায় প্লাটিনাম চূর্ণ বা ভ্যানাডিয়াম পেন্টাঅক্সাইড (V_2O_5) প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

(ঘ) কৃত্রিম ঘি তৈরিতে : অসম্পৃক্ত তেলের মধ্যে হাইড্রোজেন চালনা করে কৃত্রিম ঘি বা ডালডা তৈরিতে নিকেল চূর্ণ প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

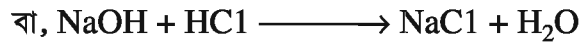
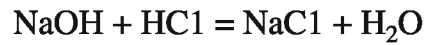
(ঙ) পলিইথিলিনের শিল্প প্রস্তুতিতে : ইথিলিনের পলিমারকরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে পলিইথিলিন তৈরিতে আধুনিককালে টাইটেনিয়ামের জৈব ধাতব যৌগসমূহ প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে পলিইথিলিনের প্রচুর দাম ছিল। এ আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে এর উৎপাদন খরচ অনেক কমেছে।

৯.৮ উভমুখী বিক্রিয়া (Reversible reaction)

যদি কোনো বিক্রিয়া একই সাথে সম্মুখ ও বিপরীত দিকে সংগঠিত হয় তবে সে বিক্রিয়াকে উভমুখী বিক্রিয়া বলে। যেমন— যদি হাইড্রোজেন ও আয়োডিনকে একটি আবদ্ধ পাত্রে নিয়ে উত্তপ্ত করা হয় যেখানে কিছুটা বিক্রিয়ক হাইড্রোজেন আয়োডাইড উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপে ঘটে



উভমুখী বিক্রিয়াকে বিপরীতমুখী দুইটি তীর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। বাস্তবে অধিকাংশ বিক্রিয়াই উভমুখী। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী বিক্রিয়ার বেগ সম্মুখ বিক্রিয়ার বেগের তুলনায় নগণ্য। সেক্ষেত্রে শুধু সম্মুখ দিকের বিক্রিয়ার অস্তিত্ব বুঝা যায় এবং তাকে একমুখী বিক্রিয়া বলে ধরে নেওয়া হয়। এ সকল ক্ষেত্রে রাসায়নিক সমীকরণে সমান বা একমুখী তীর চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন :

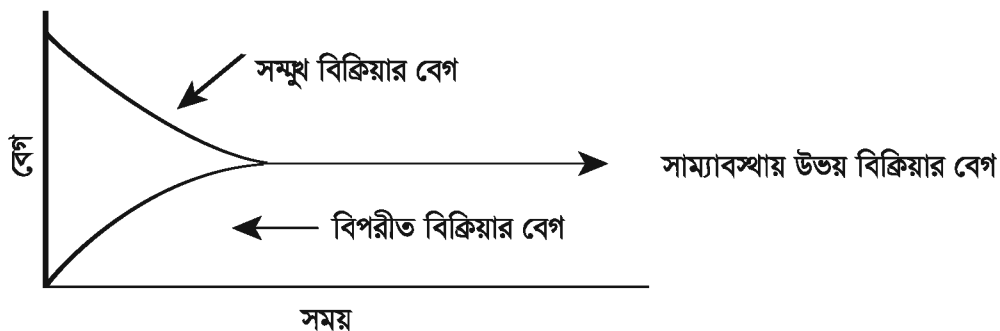


৯.৯ রাসায়নিক সাম্যাবস্থা (Chemical equilibrium)

আমরা জানি যে, বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে বিক্রিয়ার বেগ বৃদ্ধি পায়। অতএব, একটি উভমুখী বিক্রিয়ার শুরুতে সম্মুখ বিক্রিয়ার বেগ সবচেয়ে বেশি থাকবে এবং বিপরীত বিক্রিয়ার বেগ কম থাকবে। সময়ের সাথে বিক্রিয়কের পরিমাণ কমতে থাকবে ও উৎপাদের পরিমাণ বাড়তে থাকবে। কাজেই সময়ের সাথে সম্মুখ বিক্রিয়ার বেগ কমতে থাকবে এবং বিপরীত বিক্রিয়ার বেগ বাড়তে থাকবে। এক সময় সম্মুখ ও বিপরীত বিক্রিয়ার বেগ সমান হবে। এ অবস্থাকে রাসায়নিক সাম্যাবস্থা বলে।

অর্থাৎ আবদ্ধ পাত্রে H_2 ও I_2 এর মিশ্রণ উত্তপ্ত করলে HI উৎপন্ন শুরু হবে এবং সাথে সাথে HI ভেঙে H_2 ও I_2 উৎপন্ন হবে। প্রথম দিকে HI উৎপন্নের হার HI ভাঙার হারের চেয়ে বেশি হবে এবং সময়ের সাথে HI গড়া ও ভাঙার হার সমান হয়ে বিক্রিয়াটি সাম্যাবস্থায় উপনীত হবে।

সাম্যাবস্থায় আপাত দৃষ্টিতে বিক্রিয়া বন্ধ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে উভয়দিকে বিক্রিয়া সমান বেগে চলতে থাকে। সুতরাং সাম্যাবস্থা কোনো স্থিতিাবস্থা নয় বরং গতিময় অবস্থা। এজন্য গতিময় সাম্যাবস্থা (dynamic equilibrium) বলা হয়। রাসায়নিক সাম্যাবস্থাকে একটি লেখচিত্রের মাধ্যমে নিম্নে দেখানো হল :



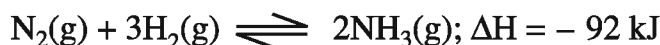
৯.১০ সাম্যাবস্থার ওপর বিভিন্ন নিয়ামকের প্রভাব (Effects of different factors on chemical equilibrium)

কোনো বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় পৌঁছানোর পর যদি বাহ্যিক অবস্থা পরিবর্তন করা না হয়, তবে সে সাম্যাবস্থা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে। তাপমাত্রা, চাপ ও সাম্যাবস্থায় উপস্থিত পদার্থের ঘনমাত্রা সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। এসব নিয়ামকের যে কোনো একটি পরিবর্তন করলে বিক্রিয়ক ও উৎপাদকের ঘনমাত্রার পরিবর্তন হয় এবং সাম্যের অবস্থান পরিবর্তন হয়। সাম্যাবস্থার ওপর এ সকল নিয়ামক পরিবর্তনের ফলাফল লা শাতেলিয়ে (Le Chatelier) নীতির সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। নীতিটি নিম্নে উদ্ভূত করা হল :

“কোনো বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় থাকা কালে যদি ঐ অবস্থার একটি নিয়ামক, যেমন তাপমাত্রা, চাপ বা ঘনমাত্রা পরিবর্তন করা হয়, তবে সাম্যের অবস্থান এমনভাবে বদলাবে যেন নিয়ামক পরিবর্তনের ফলাফল প্রশমিত হয়।”

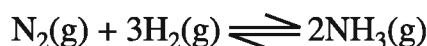
কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে লা শাতেলিয়ে নীতিটি ব্যাখ্যা করা হল :

(১) তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলাফল : লা শাতেলিয়ে নীতি অনুসারে কোনো বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তাপমাত্রা বাড়ালে এর সাম্যাবস্থা এমন দিকে সরে যাবে, যেন সংযোগকৃত তাপ শোষিত হয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলাফল প্রশমিত হয়। সুতরাং কোনো বিক্রিয়া তাপহারী হলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বিক্রিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হয় এবং তাপ শোষণ করে তাপ সংযোজনের ফলাফল প্রশমিত করে। অপরদিকে তাপ উৎপাদনকারী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাম্যাবস্থায় তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়াটি পিছন দিকে অগ্রসর হয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলাফল প্রশমিত করে। যেমন হেবার পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাপ উৎপাদিত হয়।



এ ক্ষেত্রে সম্মুখ বিক্রিয়ার তাপ নির্গত হয়েছে, তাই সাম্যাবস্থায় তাপ সংযোগ করলে বিক্রিয়াটি পশ্চাদিকে অগ্রসর হবে। অর্থাৎ কিছু অ্যামোনিয়া বিয়োজিত হয়ে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং কিছু তাপ শোষিত হয়। তাপমাত্রা কমালে বিক্রিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হয় অর্থাৎ আরো কিছু নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে NH_3 উৎপন্ন করে সাথে সাথে তাপের উদ্ভব হয়, যা তাপমাত্রা কমানোর প্রভাবকে রোধ করে।

(২) চাপের প্রভাব : দ্রবণে বা কঠিন অবস্থায় বিক্রিয়া হলে আয়তনের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। ফলে এ ধরনের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে চাপের কোনো প্রভাব নেই। যে সকল বিক্রিয়ায় উভয় দিকে গ্যাসীয় পদার্থের মোল সংখ্যা অর্থাৎ আয়তনের কোনো পরিবর্তন ঘটে না তাদের ক্ষেত্রেও চাপের কোনো প্রভাব নেই। অপরদিকে যে সকল বিক্রিয়ায় উভয়দিকে গ্যাসীয় পদার্থের মোল সংখ্যা সমান নয় সেখানে আয়তনের তারতম্য ঘটে এবং চাপের প্রভাবে সাম্যাবস্থার পরিবর্তন ঘটে। যেমন অ্যামোনিয়া সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে উৎপাদে বিক্রিয়ক অপেক্ষা অণুর সংখ্যা কম। ফলে এই বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় পৌঁছার পর



চাপ বাড়ালে বিক্রিয়া সামনের দিকে যাবে। কারণ অণুর সংখ্যা কমে চাপের প্রভাব প্রশমিত হবে। চাপ কমালে বিক্রিয়া পশ্চাদিকে অগ্রসর হবে। অপরদিকে ডাই নাইট্রোজেন টেট্রাক্সাইডের বিয়োজনে অণুর সংখ্যা বাড়ে। ফলে চাপ বাড়ে।



এ বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় পৌঁছার পর চাপ বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়া পশ্চাদিকে ধাবিত হয়ে চাপের প্রভাব প্রশমিত করবে এবং চাপ কমালে বিক্রিয়া সম্মুখ দিকে ধাবিত হবে।

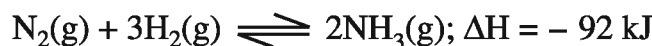
ঘনমাত্রার পরিবর্তন : যদি কোনো বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় উপস্থিত বস্তুসমূহের একটির ঘনমাত্রা পরিবর্তন করা হয়, তবে লা শাতেলিয়ে নীতি অনুযায়ী সাম্যাবস্থা এমনভাবে বদলাবে যেন সে ঘনমাত্রা পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত হয়। যে কোনো একটি বিক্রিয়া ধরা যাক। যেমন —



বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা অর্জিত হওয়ার পর বিক্রিয়ক PCl_5 এর ঘনমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা কিছুটা হ্রাস করবে। অপরদিকে উৎপাদ PCl_3 বা Cl_2 এর ঘনমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়া পিছনের দিকে অগ্রসর হবে। অর্থাৎ কিছু উৎপাদ বিক্রিয়া করে PCl_5 উৎপন্ন করবে, ফলে PCl_3 ও Cl_2 এর ঘনমাত্রা কমবে।

৯.১১ শিল্প উৎপাদনে লা শাতেলিয়ে নীতি প্রয়োগ (Application of Le Chatelier principle in industrial production)

(ক) অ্যামোনিয়া গ্যাস সংশ্লেষণ : হেবার-বস পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস হতে বাণিজ্যিকভাবে অ্যামোনিয়া সংশ্লেষণ করা হয়। বিক্রিয়ার সমীকরণ নিম্নরূপ :



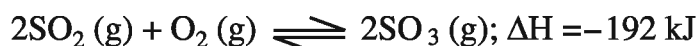
বিক্রিয়ার ফলে গ্যাসীয় অণুর সংখ্যা চার হতে দুইয়ে হ্রাস পায়, ফলে একই আয়তনে চাপ কমে। সুতরাং লা শাতেলিয়ের নীতি অনুযায়ী যত বেশি চাপ প্রয়োগ করা হবে অ্যামোনিয়ার উৎপাদন তত বেশি বাড়বে।

বাস্তবেও তাই দেখা যায়। অতিরিক্ত চাপে বিক্রিয়া সংঘটিত করাতে যে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তা ব্যয়সাপেক্ষ। উৎপাদনে তাপমাত্রা ও চাপের প্রভাব এবং সর্বাধিক ব্যয়ের কথা বিবেচনা করে সাধারণত হেবার-বস পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া উৎপাদনে 200–250 atm চাপ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

বিক্রিয়াটি তাপ উৎপাদী। সুতরাং লা শাতেলিয়ের সূত্রানুসারে বিক্রিয়ার তাপমাত্রা যত কম হবে অ্যামোনিয়ার উৎপাদন তত বেশি হবে। কিন্তু তাপমাত্রা কমালে বিক্রিয়ার বেগ কমে যায়। তাই বিক্রিয়ার হারও কমে যায়। আবার তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়ার বেগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সাম্যাবস্থায় অ্যামোনিয়ার শতকরা উৎপাদন হ্রাস পায়। এ দুইটি বিপরীত শর্ত। এ সমস্যা নিরসনে বিক্রিয়ার গতি বাড়ানোর জন্য প্রভাবক হিসেবে লৌহচূর্ণ (Fe) এবং প্রভাবক উদ্ভেজক (promoter) হিসেবে KOH এবং Al_2O_3 এর মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়।

প্রভাবকের উপস্থিতিতে এবং নির্ধারিত চাপে এমন একটি তাপমাত্রা বেছে নেওয়া হয় যেন বিক্রিয়ার গতিও যথেষ্ট থাকে এবং অ্যামোনিয়ার উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এ তাপমাত্রা 450–550°C। এটি অ্যামোনিয়া উৎপাদনের জন্য অত্যনুকূল তাপমাত্রা (optimum temperature)

(খ) সালফার ডাইঅক্সাইডের জারণ : বাণিজ্যিক ভিত্তিতে স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইডের জারণ।



যেহেতু এ বিক্রিয়াটি তাপ উৎপাদী, তাই যত নিম্ন তাপমাত্রায় এ বিক্রিয়াটি চালানো যায়, সালফার ট্রাইঅক্সাইডের উৎপাদন ততই বাড়বে। তবে নিম্ন তাপমাত্রায় বিক্রিয়া খুব ধীর গতিতে অগ্রসর হয় বলে উচ্চতর তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। প্রভাবক ব্যবহার করেও বিক্রিয়ার গতিবেগ বাড়ানো যায়। বাস্তবে শিল্পক্ষেত্রে ভ্যানাডিয়াম পেন্টাঅক্সাইড (V_2O_5) বা প্লাটিনাম চূর্ণ প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ অবস্থায় 450–550°C তাপমাত্রা এ পদ্ধতিতে অত্যনুকূল তাপমাত্রা।

বাতাসের অক্সিজেন যেহেতু সহজলভ্য, সেহেতু শিল্পক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়া চালানোর সময় তাত্ত্বিকভাবে হিসাবকৃত পরিমাণ অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ বাতাস বিক্রিয়াস্থলে প্রবেশ করানো হয়, যেন অধিক পরিমাণ সালফার ডাইঅক্সাইড জারিত হয়।

বিক্রিয়ার সমীকরণ হতে দেখা যায় যে, এ বিক্রিয়ায় গ্যাসীয় অণুর সংখ্যা হ্রাস পায়, সুতরাং চাপ প্রয়োগ করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তবে 1 atm চাপেই উপরে উল্লেখিত অবস্থায় প্রায় 98 – 99% সালফার ডাইঅক্সাইড জারিত হয়। এ কারণে আর অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করা হয় না।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

রাসায়নিক গতিবিদ্যা : রসায়নের যে শাখায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগ সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হয়, তাকে রাসায়নিক গতিবিদ্যা বলা হয়।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ কয়েকটি নিয়ামকের ওপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে তাপমাত্রা, বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা ও প্রভাবকের উপস্থিতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়ার গতিবেগ বাড়ে, বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বাড়ালেও বিক্রিয়ার গতিবেগ বাড়ে, ধনাত্মক প্রভাবকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়ার গতিবেগ বাড়ে, ঋণাত্মক প্রভাবকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়ার গতিবেগ কমে।

উভমুখী বিক্রিয়া : কোনো বিক্রিয়া একটি বিশেষ অবস্থায় উপনীত হয়ে যদি একসাথে সম্মুখে ও পশ্চাদিকে সংঘটিত হয়, তবে ঐ বিক্রিয়াকে উভমুখী বিক্রিয়া বলা হয়। উভমুখী বিক্রিয়া অসম্পূর্ণ বিক্রিয়া।

রাসায়নিক সাম্যাবস্থা : যখন কোনো উভমুখী বিক্রিয়ার সম্মুখদিকের গতিবেগ তার বিপরীত দিকের গতিবেগের সমান হয়, তখন সে অবস্থাকে রাসায়নিক সাম্যাবস্থা বলা হয়।

লা শাতেলিয়ে নীতি : কোনো বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় থাকা অবস্থায় যদি একটি নিয়ামক যেমন তাপমাত্রা, চাপ বা ঘনমাত্রা পরিবর্তন করা হয়, তবে সাম্যের অবস্থান এমনভাবে বদলাবে যেন নিয়ামক পরিবর্তনের ফলাফল প্রশমিত হয়।

সাম্যাবস্থায় চাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলাফল : কঠিন ও তরল মাধ্যমে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে চাপের কোনো প্রভাব নেই, যে বিক্রিয়ার উভয় দিকে সমান সংখ্যক গ্যাসীয় অণু থাকে, তাতেও চাপের কোনো প্রভাব নেই। যে বিক্রিয়ায় গ্যাসীয় অণুসংখ্যা হ্রাস পায়, চাপ বাড়াতে সে বিক্রিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হয়। বিক্রিয়ায় অণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বা চাপ বাড়াতে বিক্রিয়া পিছনের দিকে যায়।

সাম্যাবস্থায় ঘনমাত্রার পরিবর্তন : কোনো বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বাড়াতে বিক্রিয়া সামনের দিকে যাবে; উৎপাদের ঘনমাত্রা বাড়াতে বিক্রিয়া পিছনের দিকে যাবে।

সাম্যাবস্থায় তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলাফল : অ্যামোনিয়ার শিল্প উৎপাদনে বিক্রিয়ার গতিবেগ বাড়ানোর জন্য তাপমাত্রা বাড়ানো প্রয়োজন, আবার অ্যামোনিয়া সংশ্লেষণ বিক্রিয়াটি তাপ উৎপাদী হওয়ায় তাপমাত্রা বাড়াতে বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় কম অ্যামোনিয়া উৎপাদিত হয়। এ কারণে একটি অত্যনুকূল তাপমাত্রা ($450-550^{\circ}\text{C}$) প্রয়োজন। এ ছাড়া বিক্রিয়ার গতিবেগ বাড়াতে আয়রনের সাথে পটাসিয়াম হাইড্রোজেনাইড এবং অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণ প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিক্রিয়ায় গ্যাসীয় অণুর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় উচ্চ চাপ প্রয়োগে উৎপাদন বাড়ে, তাই $200-250\text{ atm}$ চাপ ব্যবহার করা হয়।

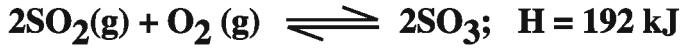
শিল্পক্ষেত্রে সালফার ডাইঅক্সাইডের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও অত্যনুকূল তাপমাত্রা ($400-500^{\circ}\text{C}$) প্রয়োজন, কেননা তাপমাত্রা বাড়লে বিক্রিয়ার গতিবেগ বাড়ে, কিন্তু উৎপাদন কমে। তাৎক্ষিকভাবে হিসাবকৃত পরিমাণ অপেক্ষা তিনগুণ বাতাস ব্যবহার করে বিক্রিয়াকে সামনের দিকে নেওয়া হয়। এর ফলে কাক্ষিত উৎপাদন পাওয়া যায় বলে চাপ বাড়ানো হয় না।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটনের জন্য কোনটি অত্যাৱশ্যক?

- | | |
|---------|-------------|
| ক. আলোক | খ. তাপ |
| গ. চাপ | ঘ. সংস্পর্শ |



—এ বিক্রিয়াটি থেকে নিম্নের ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

২. বিক্রিয়াটিতে চাপ প্রয়োগ করলে বিক্রিয়াটির সাম্যাবস্থা—

- পশ্চাদ দিকে সরে যাবে
- সম্মুখ দিকে সরে যাবে
- কোনো পরিবর্তন হবে না

কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

৩. বিক্রিয়াটিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে SO_3 উৎপাদনের ক্ষেত্রে কী ঘটবে?

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ক. SO_3 এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে | খ. SO_3 এর পরিমাণ হ্রাস পাবে |
| গ. SO_3 এর পরিমাণ একই থাকবে | ঘ. বিক্রিয়াটি থেমে যাবে। |

৪. a, ও b, c তিনটি পরীক্ষানলে সোডিয়াম থায়োসালফেটের দ্রবণ নিয়ে তাতে সব পরিমাণ HCl যোগ করলে c, b ও a নলের দ্রবণ যথাক্রমে 5, 10 ও 15 মিনিট পরে ঘোলা হবে। এ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়—

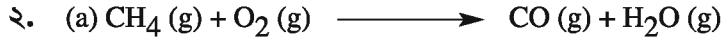
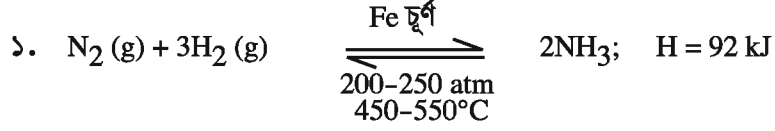
- a পরীক্ষানলের দ্রবণটির ঘনমাত্রা বেশি
- b পরীক্ষানলের দ্রবণটির ঘনমাত্রা বেশি
- c পরীক্ষানলের দ্রবণটির ঘনমাত্রা বেশি

কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. iii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

আমাদের দেশের অধিক জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য কৃষি জমিতে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। সারের প্রধান কাঁচামাল প্রাকৃতিক গ্যাস। বাতাসের নাইট্রোজেন এবং প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করা হয়, যা ইউরিয়ার তৈরির অন্যতম উপাদান। অ্যামোনিয়া প্রস্তুতির বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :



ক. প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদানটির রাসায়নিক নাম লিখ?

খ. সাম্যাস্থায় ১ নম্বর বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর?

গ. ২ (b) নং বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় তাপ প্রয়োগ করলে কী ঘটবে লিখ?

ঘ. ১ নং বিক্রিয়াটি সংগঠনের শর্তাবলির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

দশম অধ্যায়

তড়িৎ বিশ্লেষণ

বিষয়বস্তু : তড়িৎ বিশ্লেষণ, তড়িৎ বিশ্লেষ্য, তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ; তড়িৎ দ্বার; তড়িৎ বিশ্লেষণের কৌশল; এসিড মিশ্রিত পানি; সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ ও কপার সালফেট দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ; ইলেকট্রোপ্লেটিং; ফ্যারাডের তড়িৎ বিশ্লেষণের সূত্র।

১০.১ তড়িৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis)

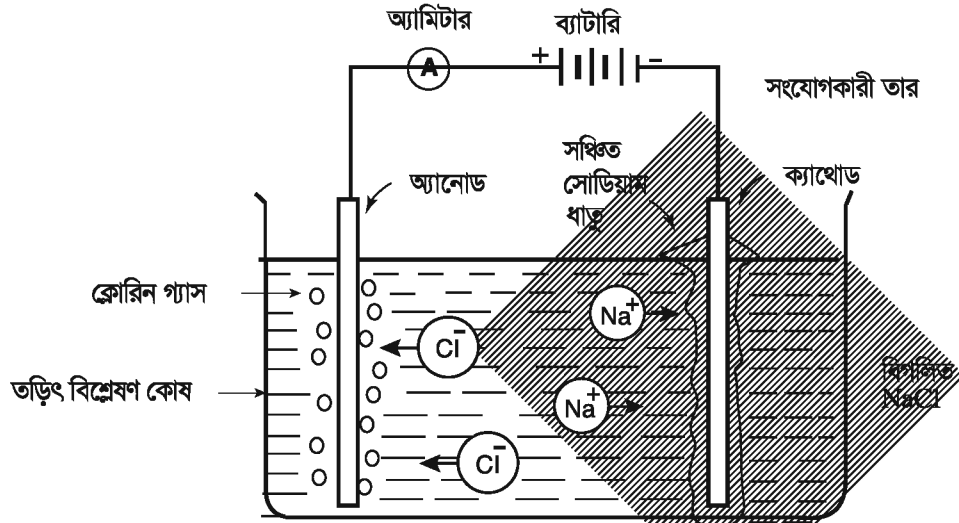
যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে, তাদেরকে বিদ্যুৎ পরিবাহী বলা হয়। বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থসমূহকে দুইভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) **ধাতব ও ইলেকট্রনীয় পরিবাহী :** যে সকল পদার্থের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহণের সময় কোনোরূপ রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না, তাদেরকে ধাতব পরিবাহী বলা হয়। সকল ধাতু ও গ্রাফাইট এ ধরনের পরিবাহী।

(খ) **তড়িৎ বিশ্লেষ্য :** যে সকল যৌগ বিগলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহণ করে এবং সেই সাথে তাদের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তাদেরকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য বলা হয়। সকল আয়নিক যৌগ এবং কিছু সমযোজী যৌগ তড়িৎ বিশ্লেষ্য। যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড, এসিড মিশ্রিত পানি প্রভৃতি। যে সকল যৌগ দ্রবণে বা বিগলিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না, তাদেরকে তড়িৎ অবিশ্লেষ্য বলা হয়। যেমন চিনি, গ্লুকোজ।

বিগলিত বা দ্রবীভূত তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহণের সময় সেই যৌগের বিয়োজন বা রাসায়নিক পরিবর্তনকে তড়িৎ বিশ্লেষণ বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ বিগলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করলে দেখা যায় যে ধনাত্মক তড়িৎ দ্বারে ক্লোরিন গ্যাস এবং ঋণাত্মক তড়িৎ দ্বারে সোডিয়াম ধাতুর সৃষ্টি হয়। নিম্নের চিত্রের সাহায্যে প্রক্রিয়াটি দেখান হল :



চিত্র ১০.১ : বিগলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণ

তড়িৎদ্বার ও তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষ : একটি পাত্রে বিগলিত অথবা দ্রবীভূত তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্যে দুইটি তড়িৎ পরিবাহী দণ্ড প্রবেশ করিয়ে, দণ্ড দুইটি তার দিয়ে ব্যাটারির সাথে যুক্ত করলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এ দুইটি ধাতব পরিবাহী

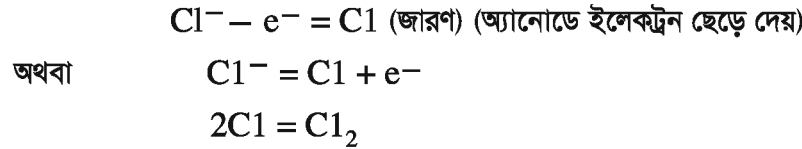
দণ্ডকে তড়িৎদ্বার বলা হয়। এ ব্যবস্থাকে তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষ বলা হয়। যে তড়িৎদ্বার বাইরের বিদ্যুৎ উৎসের ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে তাকে অ্যানোড এবং যে তড়িৎদ্বার ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে তাকে ক্যাথোড বলা হয়। অ্যানোডে জারণ ও ক্যাথোডে বিজারণ ঘটে।

১০.২ তড়িৎ বিশ্লেষণের কৌশল (Mechanism of electrolysis)

কঠিন অবস্থায় তড়িৎ বিশ্লেষণ পদার্থের আয়নসমূহ কেলসের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে, তখন তারা বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না। বিগলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় আয়নসমূহ মোটামুটি স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। যেমন বিগলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় সোডিয়াম ক্লোরাইডের সোডিয়াম (Na^+) ও ক্লোরাইড (Cl^-) আয়নসমূহ মোটামুটি মুক্ত অবস্থায় চলাচল করে। তরলে দুইটি তড়িৎদ্বার প্রবেশ করিয়ে তাদের মধ্যে ব্যাটারির সাহায্যে বিভব পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়। ক্যাথোড ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট হওয়ায় তা ধনাত্মক সোডিয়াম আয়নসমূহকে আকর্ষণ করে। সোডিয়াম আয়নসমূহ ক্যাথোড পৌছামাত্র ক্যাথোড তাদের ইলেকট্রন দান করে, ফলে সোডিয়াম পরমাণুর সৃষ্টি হয়। সোডিয়াম পরমাণুসমূহ একত্রিত হয়ে সোডিয়াম ধাতুরূপে দেখা দেয়।



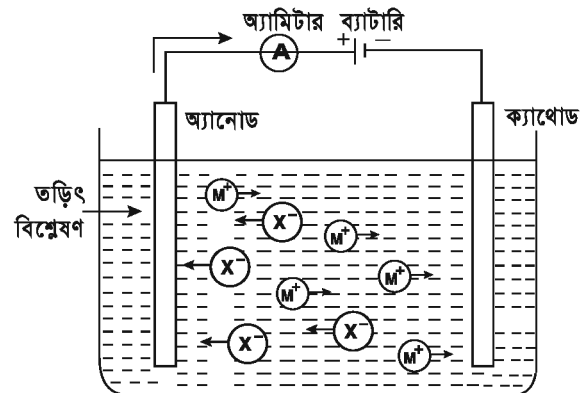
অন্যদিকে অ্যানোড ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট হওয়ায় তা ঋণাত্মক ক্লোরাইড আয়নসমূহকে আকর্ষণ করে এবং এ আয়নসমূহ অ্যানোডে পৌছা মাত্র তাতে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ক্লোরিন পরমাণুর সৃষ্টি হয়। দুইটি ক্লোরিন পরমাণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে ক্লোরিন গ্যাসের সৃষ্টি করে।



এভাবেই তড়িৎ বিশ্লেষণ সংঘটিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ধনাত্মক আয়নসমূহ ক্যাথোড কর্তৃক আকৃষ্ট হয় বলে তাদেরকে ক্যাটায়ন এবং ঋণাত্মক আয়নসমূহ অ্যানোড কর্তৃক আকৃষ্ট হয় বলে তাদেরকে অ্যানায়ন বলা হয়।

১০.৩ কতিপয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ

ইতোপূর্বে বর্ণিত বিগলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের বিশ্লেষণে কোনোরূপ পার্শ্ব বিক্রিয়া হয় না; কিন্তু সাধারণত দ্রবণে বিভিন্ন ধরনের পার্শ্ব বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। দ্রবণে জারিত হওয়ার মতো একাধিক অ্যানায়ন থাকলে কোনটি প্রথমে জারিত হবে এবং বিজারিত হওয়ার মতো একাধিক ক্যাটায়নের কোনটি প্রথমে বিজারিত হবে তা নির্ভর করে তিনটি নিয়ামকের ওপর।

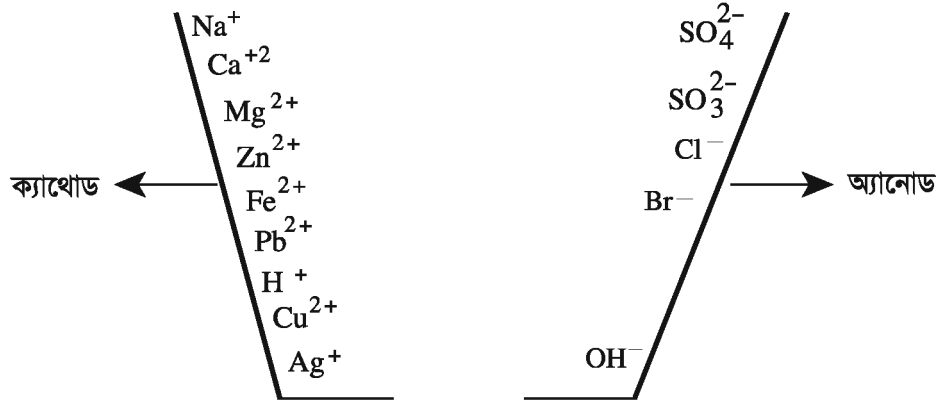


চিত্র ১০.২ : তড়িৎ বিশ্লেষণের কৌশল

(ক) সক্রিয়তা ক্রমে এদের আপেক্ষিক অবস্থান : সক্রিয়তা ক্রমে যে আয়নের অবস্থান নিচে সেটি প্রথম জারিত বা বিজারিত হবে। নিচের ছকে কয়েকটি আয়নের অবস্থান দেখান হল।

(খ) দ্রবণে কোনো আয়নের ঘনমাত্রা বেশি হলে সে আয়ন প্রথম জারিত বা বিজারিত হতে পারে।

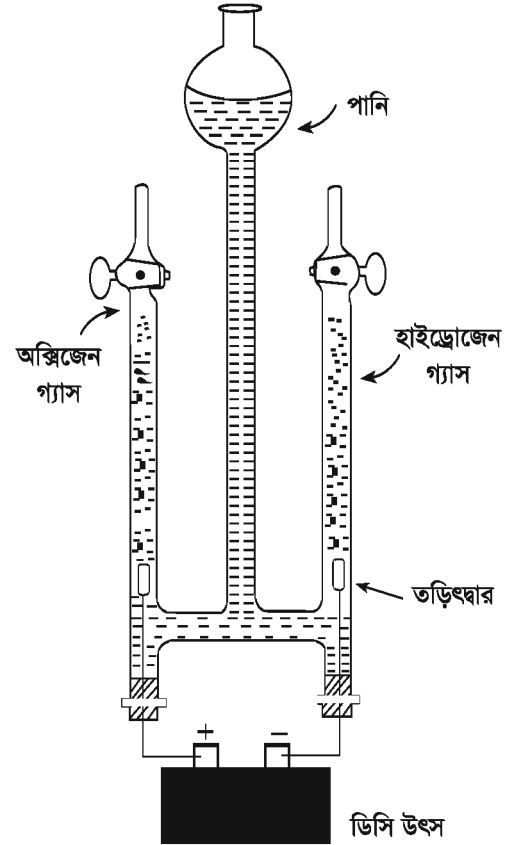
(গ) তড়িৎদ্বার হিসেবে কী পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপরও তড়িৎদ্বারে জারণ ও বিজারণ ক্রিয়া নির্ভর করে।



কয়েকটি সুনির্দিষ্ট যৌগের তড়িৎ বিশ্লেষণ আলোচনা করা হল :

(১) এসিড মিশ্রিত পানির তড়িৎ বিশ্লেষণ :

বিশুদ্ধ পানি বিদ্যুৎ কুপরিবাহী; অর্থাৎ খুব কম বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বৃদ্ধির জন্য এতে অল্প পরিমাণ সালফিউরিক এসিড যোগ করা হয়। এর পর একটি পাণ্ড্রে নিয়ে দুই পার্শ্বে দুইটি প্লাটিনাম তার প্রবেশ করানো হল। তার দুইটি তড়িৎদ্বার হিসেবে কাজ করবে। একটি মোটর গাড়ির ব্যাটারি অথবা কয়েকটি শুকনো ব্যাটারি একত্রিত করে ধাতুর তার দ্বারা প্লাটিনাম তারদ্বয়ের একটিকে ধনাত্মক প্রান্তের সাথে এবং অন্যটিকে ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যোগ করা হল। এর সাথে একটি অ্যামিটার যোগ করা থাকলে দেখা যাবে যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। একই সাথে চোখে দেখা যাবে যে প্লাটিনাম তারদ্বয়ে ছোট ছোট বুদবুদের সৃষ্টি হচ্ছে।



চিত্র ১০.৩ : এসিড মিশ্রিত পানির তড়িৎ বিশ্লেষণ

দুইটি গ্যাস জারে দুইটি গ্যাস জমা করে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে অ্যানোডে অক্সিজেন গ্যাস এবং ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস জমা হয়েছে। আয়তনের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে হাইড্রোজেনের আয়তন অক্সিজেন গ্যাসের আয়তনের দ্বিগুণ। সুতরাং পানির তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় নিম্নোক্ত বিক্রিয়া ঘটে :

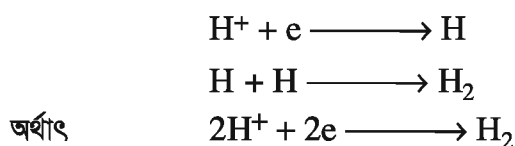


ক্রিয়া কৌশল

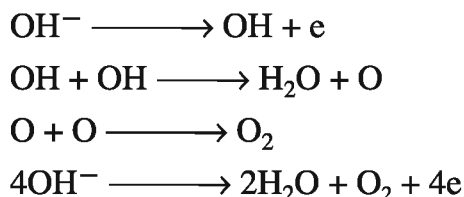
সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত পানিতে এসিড হতে উৎপন্ন H^+ এবং SO_4^{2-} ছাড়াও পানির বিয়োজনে উৎপন্ন অল্প পরিমাণ H^+ এবং OH^- আয়ন বিদ্যমান। তাহলে দ্রবণে আছে -

ক্যাটায়ন	অ্যানায়ন
H^+	OH^-
	SO_4^{2-}

তড়িৎ প্রবাহের সময় ধনাত্মক H^+ আয়ন ক্যাথোডের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং সেখানে ইলেকট্রন গ্রহণ করে হাইড্রোজেন পরমাণু উৎপন্ন করে। দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু একত্রিত হয়ে হাইড্রোজেন অণু তৈরি হয়। এভাবে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। তাহলে ক্যাথোডে বিক্রিয়া হচ্ছে :



অ্যানায়ন দুইটি ঋণাত্মক আধানযুক্ত হওয়ায় অ্যানোডের দিকে ধাবিত হয়। সক্রিয়তা ক্রমে OH^- আয়নের অবস্থান নিচে হওয়ায় OH^- আয়ন ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারিত হয় এবং নিম্নলিখিত বিক্রিয়া সংঘটিত হয়ে অক্সিজেন উৎপাদিত হয়।



(২) সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ

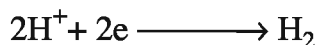
সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণে তড়িৎদ্বারে উৎপন্ন পদার্থ কী হবে তা নির্ভর করে তড়িৎদ্বারের প্রকৃতি এবং দ্রবণের ঘনমাত্রার ওপর।

(ক) প্রাটিনাম তড়িৎদ্বার ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের লঘু দ্রবণ :

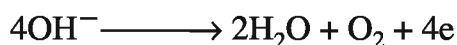
দ্রবণে নিম্নোক্ত আয়ন উপস্থিত :

ক্যাটায়ন	অ্যানায়ন
Na^+	Cl^-
H^+	OH^-

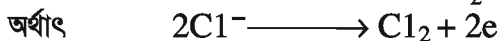
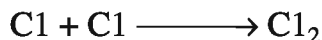
তড়িৎ প্রবাহ চালনা করলে সক্রিয়তা ক্রমে H^+ আয়নের অবস্থান অনুযায়ী H^+ আয়ন বিজারিত হয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদিত হয়। ক্যাথোডে বিক্রিয়া :



অ্যানোডের দিকে ঋণাত্মক Cl^- এবং OH^- উভয়ই ধাবিত হয়। সক্রিয়তা ক্রম অনুসারে OH^- আয়ন জারিত হয়ে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়।



এর সঙ্গে অ্যানোডে কিছু Cl^- আয়ন জারিত হয়ে ক্লোরিন গ্যাসও উৎপন্ন হয়।

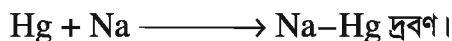


(খ) প্লাটিনাম তড়িৎদ্বার ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় দ্রবণ

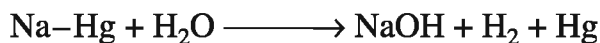
এ অবস্থায় ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা বেশি হওয়ায় অ্যানোডে Cl^- জারিত হয়ে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

(গ) মারকিউরি (পারদ) তড়িৎদ্বার এবং সোডিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় দ্রবণ

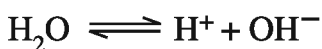
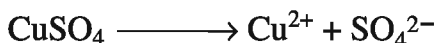
বিদ্যুৎ প্রবাহের সময় ধনাত্মক সোডিয়াম ও হাইড্রোজেন আয়ন ক্যাথোডের দিকে আকৃষ্ট হয়। মারকিউরি তড়িৎদ্বারে হাইড্রোজেন আয়নের তুলনায় সোডিয়াম আয়নের বিজারিত হওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি তাই ক্যাথোডে নিম্নলিখিত বিক্রিয়ায় Na^+ আয়ন বিজারিত হয় এবং উৎপাদিত Na মারকিউরিতে দ্রবীভূত হয়।



Na-Hg দ্রবণ অন্য একটি পাত্রে নিয়ে পানি যোগ করলে নিম্নোক্ত বিক্রিয়ায় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়।



(৩) কপার সালফেট দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ : জলীয় দ্রবণে কপার সালফেট হতে কপার ও সালফেট আয়ন মুক্তভাবে বিচরণ করে। এছাড়া পানির অণু হতে খুব অল্প পরিমাণ হাইড্রোজেন ও হাইড্রোক্সাইড আয়ন দ্রবণে থাকে।



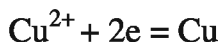
ক্যাটায়ন



অ্যানায়ন

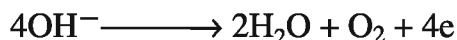


তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় ধনাত্মক কপার ও হাইড্রোজেন আয়ন উভয়েই ক্যাথোডের দিকে আকৃষ্ট ও ধাবিত হয়। কিন্তু কপার আয়ন সক্রিয়তা ক্রমে হাইড্রোজেনের নিচে অবস্থিত বলে ক্যাথোড হতে ইলেকট্রন গ্রহণ করে ধাতু কপারে পরিণত হয়।



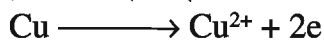
অপরদিকে অ্যানোডের দিকে হাইড্রোক্সাইড ও সালফেট আয়ন ধাবিত হয়। এ ক্ষেত্রে দুইটি বিশেষ অবস্থা হতে পারে।

(ক) যদি প্লাটিনাম বা এ ধরনের বিশেষ নিষ্ক্রিয় ধাতু দ্বারা অ্যানোড তৈরি হয়, তবে সালফেট আয়নের কোনো পরিবর্তন হয় না, হাইড্রোক্সাইড আয়ন জারিত হয়ে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।



যেহেতু হাইড্রোক্সাইড আয়ন অপসারিত হচ্ছে, সেহেতু পানির বিয়োজন হয়ে নতুন H^+ ও OH^- আয়ন তৈরি হয়। ফলে ক্রমশ H^+ এর পরিমাণ বাড়ে। দ্রবণে সালফেট আয়ন থেকে যাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে H^+ ও SO_4^{2-} আয়ন যুক্ত হয়ে সালফিউরিক এসিড তৈরি করে।

(খ) কিন্তু অ্যানোড কপার ধাতু দ্বারা তৈরি হলে কপার ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্যাটায়ন সৃষ্টি করে।



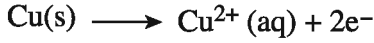
ফলে অ্যানোড ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কেননা কিছু কপার পরমাণু দ্রবণে চলে যায় এবং কপার সালফেট উৎপন্ন করে।

১০.৪ কপারের বিশুদ্ধকরণ (Refining of copper)

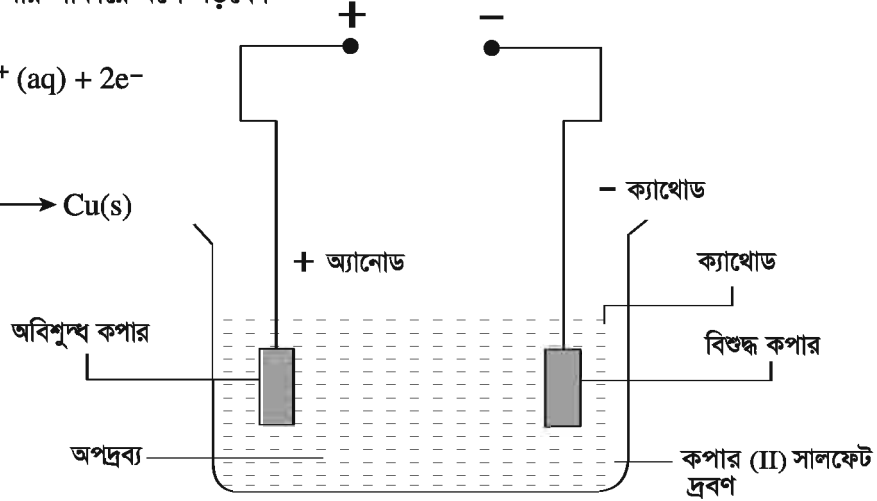
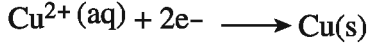
অবিশুদ্ধ কপারকে তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ করা যায়। এজন্য একটি তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষে অবিশুদ্ধ কপারকে অ্যানোড করা হয় এবং বিশুদ্ধ কপারকে ক্যাথোড করা হয়। তড়িৎ বিশ্লেষণ হিসেবে কপার(II) সালফেট দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। এ অবস্থায় তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে দ্রবণ হতে কপার আয়ন বিজারিত হয়ে ক্যাথোডে বিশুদ্ধ

কপার হিসেবে জমা হবে। অপরদিকে অ্যানোডে কপার দ্রবীভূত হয়ে কপার সালফেট উৎপন্ন করবে। অ্যানোডে অপদ্রব্য হিসেবে জিংক, আয়রন প্রভৃতি ধাতু থাকলেও সেগুলো ক্রমশ দ্রবীভূত হবে। এভাবে অ্যানোড ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং ক্যাথোডে বিশুদ্ধ কপার জমা হবে। অ্যানোডে কপারের সাথে অপদ্রব্য হিসেবে সিলভার, গোল্ড প্রভৃতি থাকলে সেগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার আকারে খসে পড়বে।

অ্যানোড বিক্রিয়া :



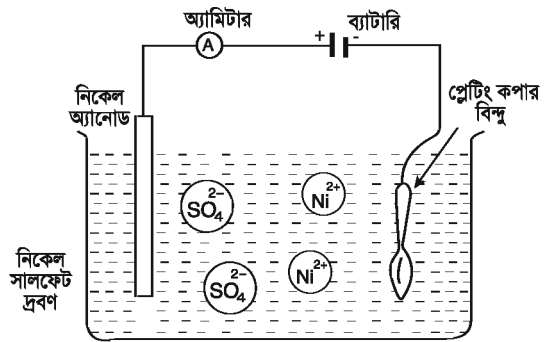
ক্যাথোড বিক্রিয়া :



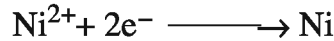
চিত্র ১০.৪ : কপার বিশুদ্ধকরণ

১০.৫ ইলেকট্রোপ্লেটিং বা তড়িৎ প্রলেপন (Electroplating)

উপরে বর্ণিত পরীক্ষায় কপারের পরিবর্তে অন্য যে কোনো ধাতুর তৈরি একটি দণ্ড ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার করলে দণ্ডটির উপর কপারের একটি আস্তরণ সৃষ্টি হত। এভাবে তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি ধাতুর তৈরি জিনিসপত্রের উপর অন্য একটি ধাতুর প্রলেপ সৃষ্টি করাকে ইলেকট্রোপ্লেটিং বলা হয়। সাধারণত পার্থক্য সৃষ্টির জন্য অথবা ক্ষয় রোধের জন্য একটি সক্রিয় ধাতুকে কম সক্রিয় ধাতু (যেমন নিকেল, ক্রোমিয়াম) দ্বারা প্রলেপ দেওয়া হয়। যেমন লোহার তৈরি কোনো জিনিসকে প্রথমে কস্টিক সোডা ও পরে সালফিউরিক এসিডে ধুয়ে নিয়ে পৃষ্ঠদেশকে পরিষ্কার করা হয়। অতঃপর এটিকে ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার করে নিকেল লবণের দ্রবণে তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয়। ফলে এর উপর নিকেল ধাতুর প্রলেপ পড়ে।



চিত্র ১০.৫ : ইলেকট্রোপ্লেটিং-এর কৌশল



দ্রবণে নিকেল আয়নের পরিমাণ যেন হ্রাস না পায় সেজন্য নিকেলের তৈরি অ্যানোড ব্যবহার করা হয়।

সাধারণ লোহার তৈরি জিনিসপত্রে সহজেই মরিচা ধরে, ফলে ওগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। নিকেল বা ক্রোমিয়াম প্রলেপযুক্ত হওয়ার পর লোহা বাতাসের সংস্পর্শে আসে না, ফলে মরিচাও ধরে না, ক্ষয়প্রাপ্তও হয় না। উপরন্তু বস্তুটিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখায়। তোমার ঘড়ির চেইনটি দেখতে রূপার মতো উজ্জ্বল। প্রকৃতপক্ষে ওটার ভেতরে লোহা, উপরে ক্রোমিয়ামের প্রলেপ।

১০.৬ ফ্যারাডের তড়িৎ বিশ্লেষণ সূত্র (Faraday's laws of electrolysis)

তড়িৎ বিশ্লেষণের সাথে রাসায়নিক পরিবর্তনের মাত্রিক পরিমাণ সম্পর্কে ফ্যারাডের দুইটি বিখ্যাত সূত্র আছে।

প্রথম সূত্র : তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় যে কোনো তড়িৎদ্বারে সঞ্চিত বা দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণের সমানুপাতিক।

দ্বিতীয় সূত্র : যদি বিভিন্ন তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্য দিয়ে একই পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহিত করা হয়, তবে বিভিন্ন তড়িৎদ্বারে সঞ্চিত বা দ্রবীভূত পদার্থগুলোর ভরের পরিমাণ তাদের নিজ নিজ যোজনীর সাথে সম্পর্কিত।

এখানে শুধুমাত্র প্রথম সূত্র আলোচনা করা হল। আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি সংখ্যার সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। তড়িৎ আধান পরিমাণের একক হচ্ছে কুলম্ব (Coulomb)। এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ কোনো পদার্থের মধ্য দিয়া এক সেকেন্ড সময়ের জন্য প্রবাহিত করা হলে তড়িৎের পরিমাণ ধরা হয় এক কুলম্ব (Coulomb)। তাহলে লেখা যায়—

$$\text{কুলম্ব (C)} = \text{অ্যাম্পিয়ার (i)} \times \text{সময় (t, সেকেন্ড)}$$

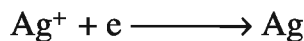
$$\text{অর্থাৎ } C = it \text{ (সময় সেকেন্ডে প্রকাশ করতে হবে)}$$

ফ্যারাডের প্রথম সূত্র অনুযায়ী কোনো পদার্থের তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় C কুলম্ব পরিমাণ আধান প্রবাহিত হওয়ার ফলে যদি W গ্রাম পরিমাণ ধাতু সঞ্চিত হয় তবে W হবে C এর সমানুপাতিক।

সূত্রটি পরীক্ষা করার জন্য চিত্র ১০.২—এ বর্ণিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। পাট্রে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ হিসেবে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ এবং তড়িৎদ্বার হিসেবে প্লাটিনাম নেওয়া হল। সার্কিটে তড়িৎ প্রবাহ মাপার জন্য একটি অ্যামিটার যুক্ত আছে। এবার নির্দিষ্ট সময়ে (t সেকেন্ড) i অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত করে ক্যাথোডে কতটুকু সিলভার সঞ্চিত হয়েছে তা মাপা হল।

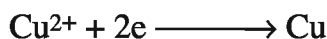
দেখা যাবে যে, 5g সিলভার সঞ্চিত হতে যে পরিমাণ তড়িৎ প্রয়োজন 10g সঞ্চিত হতে তার দ্বিগুণ পরিমাণ তড়িৎ প্রয়োজন। এর দ্বারা প্রথম সূত্র প্রতিপাদিত হয়।

এ পরীক্ষায় আরো দেখা যায় এক মোল সিলভার সঞ্চিত হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তড়িৎ প্রয়োজন। নিম্নের বিক্রিয়ায় সিলভার সঞ্চিত হয়।



অর্থাৎ একটি সিলভার পরমাণু সঞ্চিত হওয়ার জন্য একটি সিলভার আয়ন একটি ইলেকট্রনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। অতএব এক মোল সিলভার সঞ্চিত হতে এক মোল ইলেকট্রন এক মোল সিলভার আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়। আবার পরীক্ষায় দেখা গেছে এক মোল সিলভার সঞ্চিত হওয়ার জন্য 96500 কুলম্ব আধান প্রয়োজন। সুতরাং এক মোল ইলেকট্রন 96500 কুলম্ব আধান বহন করে।

অনুরূপ পরীক্ষায় সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের পরিবর্তে কপার সালফেট দ্রবণ নিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এক মোল কপার সঞ্চিত হতে দুই মোল ইলেকট্রন প্রয়োজন, অর্থাৎ 2 × 96500 কুলম্ব আধান প্রয়োজন। কারণ



এক মোল অ্যালুমিনিয়াম সঞ্চিত হতে প্রয়োজন হয় তিন মোল ইলেকট্রন, অর্থাৎ 3 × 96500 কুলম্ব।

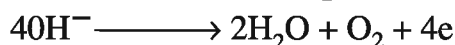
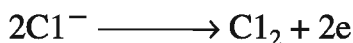
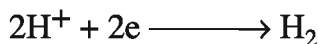
ফ্যারাডের নামানুসারে 96500 কুলম্বকে এক ফ্যারাডে বলা হয়। অর্থাৎ

$$1 \text{ Faraday} = 96500 \text{ কুলম্ব}$$

$$1F = 96500 \text{ C}$$

তাহলে এক মোল সিলভার সঞ্চিত হতে প্রয়োজন 1F, এক মোল কপার সঞ্চিত হতে প্রয়োজন 2F, এক মোল অ্যালুমিনিয়াম সঞ্চিত হতে প্রয়োজন 3F।

অনুরূপভাবে গ্যাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া বিবেচনা করা যাক,



উপরিউক্ত আলোচনা অনুযায়ী এক মোল হাইড্রোজেন ও এক মোল ক্লোরিন উৎপাদনের প্রতি ক্ষেত্রে 2F প্রয়োজন এবং এক মোল অক্সিজেন উৎপাদনের জন্য 4F তড়িৎ প্রয়োজন।

এক মোল ইলেকট্রন = 6.02×10^{23} ইলেকট্রন। এক মোল ইলেকট্রন এক ফ্যারাডে আধানের সমান অর্থাৎ 96500 কুলম্ব আধান বহন করে।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

বিদ্যুৎ পরিবাহী : যে সকল পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে, তাদেরকে বিদ্যুৎ পরিবাহী বলা হয়। বিদ্যুৎ পরিবাহী দুই প্রকারের— ধাতব পরিবাহী ও তড়িৎ বিশ্লেষ্য।

ধাতব বা ইলেকট্রনীয় পরিবাহী : যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহণের সময় কোনরূপ রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না, তাদেরকে ধাতব পরিবাহী বলা হয়।

তড়িৎ বিশ্লেষ্য : যে সকল যৌগ বিগলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহণ করে, তাদেরকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য বলা হয়।

তড়িৎ অবিশ্লেষ্য : যে সকল যৌগ বিগলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না, তাদেরকে তড়িৎ অবিশ্লেষ্য বলা হয়।

তড়িৎ বিশ্লেষণ : বিগলিত বা দ্রবীভূত তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহণের সময় সে যৌগের বিয়োজন বা রাসায়নিক পরিবর্তনকে তড়িৎ বিশ্লেষণ বলা হয়।

তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষ : যে পাত্রে তড়িৎ বিশ্লেষণ চালানো হয়, তাকে তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষ বলা হয়।

তড়িৎদ্বার : তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় বিগলিত বা দ্রবীভূত তড়িৎ বিশ্লেষ্যের মধ্যে দুইটি ইলেকট্রনীয় পরিবাহী প্রবেশ করাতে হয়, তাদেরকে তড়িৎদ্বার বলা হয়। যে তড়িৎদ্বার বাইরের বিদ্যুৎ উৎসের ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে, তাকে অ্যানোড এবং যে তড়িৎদ্বার ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে, তাকে ক্যাথোড বলা হয়।

এসিড মিশ্রিত পানির তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন এবং অ্যানোডে অক্সিজেন গ্যাসের সৃষ্টি হয়। হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন অক্সিজেন গ্যাসের আয়তনের দ্বিগুণ হয়।

কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে কপার ধাতু জমা হয়। অ্যানোড প্লাটিনাম, গ্রাফাইট প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় বস্তু দ্বারা তৈরি হলে সেখানে অক্সিজেন গ্যাস তৈরি হয়। অ্যানোড কপার দ্বারা তৈরি হলে অ্যানোড হতে কপার ধীরে ধীরে দ্রবণে যায় এবং কপার সালফেটের ঘনমাত্রা অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ নীট রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় না।

ইলেকট্রোপ্লেটিং : তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি ধাতুর তৈরি জিনিসপত্রের উপর অন্য একটি ধাতুর প্রলেপ সৃষ্টি করাকে ইলেকট্রোপ্লেটিং বা তড়িৎ প্রলেপন বলা হয়।

তড়িৎ বিশ্লেষণ সংক্রান্ত ফ্যারাডের সূত্র : (১) প্রথম সূত্র— তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় যে কোনো তড়িৎদ্বারে সঞ্চিত বা দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণের সমানুপাতিক।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. নিম্নের কোনটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য?

- | | |
|------------|----------------------|
| ক. গ্লুকোজ | খ. অকটেন |
| গ. পেট্রল | ঘ. এসিড মিশ্রিত পানি |

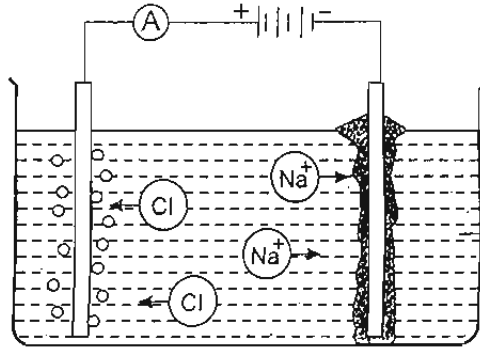
২. তড়িৎ বিশ্লেষণ একটি শক্তিশালী জারণ ও বিজারণ প্রক্রিয়া কারণ—

- শুধু ইলেকট্রন গ্রহীত হয়
- শুধু ইলেকট্রন বর্জন হয়
- ইলেকট্রনের আদান-প্রদান হয়।

কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. iii |
| গ. i এবং ii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের চিত্রটি ব্যবহার করে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও



চিত্র : সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণ

৩. কোন আয়নটি ক্যাথোড দ্বারা আকৃষ্ট হবে?

ক. Cl^-

খ. Na^+

গ. H^+

ঘ. OH^-

৪. কোন পদার্থটি চিত্রে প্রদর্শিত তড়িৎ বিশ্লেষণে উৎপন্ন হয় না?

ক. সোডিয়াম ধাতু

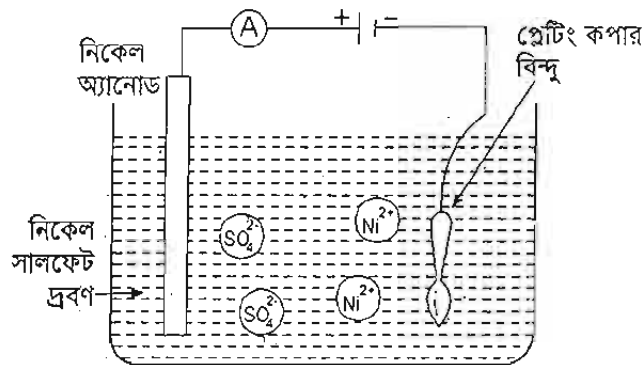
খ. সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড

গ. হাইড্রোজেন

ঘ. ক্লোরিন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

ধাতুর তৈরী তৈজসপত্র দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তৈজসপত্রের ক্ষয়রোধ করার জন্য ইলেকট্রোপ্লেটিং করা হয়। ইলেকট্রোপ্লেটিং করার কৌশল চিত্রে প্রদর্শিত হল :



চিত্র : ইলেকট্রোপ্লেটিং এর কৌশল

ক. ইলেকট্রোপ্লেটিং কী?

খ. এখানে অ্যানোড হিসেবে নিকেল ধাতু নেওয়া হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর

গ. নিকেল সালফেট দ্রবণের মধ্য দিয়ে 0.5A মাত্রার তড়িৎ প্রবাহ 10 মিনিট ধরে চালনা করলে কী পরিমাণ নিকেল তড়িৎদ্বারে সঞ্চিত হবে?

ঘ. ধাতুর তৈরী অলংকার, ঘড়ির চেইন ইত্যাদি দীর্ঘস্থায়ী ও আকর্ষণীয় করার কৌশল চিত্র অবলম্বন ব্যাখ্যা কর।

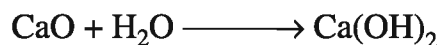
একাদশ অধ্যায়

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর

বিষয় : রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর; তাপোৎপাদী ও তাপহারী বিক্রিয়া; ΔH সংকেত; শক্তি পরিবর্তনের উৎস; দহন তাপ, প্রশমন তাপ, দ্রবণ তাপ; বিভিন্ন ধরনের গ্যালভানিক সেল যেমন : ডেনিয়েল সেল—এর প্রস্তুতি ও ক্রিয়া কৌশল।

১১.১ ভূমিকা : রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে তাপ উৎপন্ন হয় তা তোমরা নিশ্চয় লক্ষ করেছ। বাড়িতে রান্না করতে কাঠ-খড়ি, কেরোসিন বা গ্যাস ব্যবহার করা হয়। একবার আগুন ধরিয়ে দিলে এগুলো জ্বলতে থাকে এবং উৎপন্ন তাপের সাহায্যেই রান্না হয়। উপরিউক্ত পদার্থগুলোর উপাদানের মধ্যে কার্বন ও হাইড্রোজেন প্রধান। আগুন ধরিয়ে দিলে এগুলো বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করার সময় তাপ উৎপন্ন হয়।

অনেকের বাড়িতেই বয়স্ক ব্যক্তিগণ পান খাওয়ার সময় চুন ব্যবহার করেন। চুন হচ্ছে CaO । লক্ষ করবে বাজার থেকে CaO এনে পানিতে রাখলে পানি গরম হয়ে যায় এবং কোনো কোনো সময় ফুটতে থাকে। এখানে নিম্নোক্ত বিক্রিয়ায় তাপ উৎপাদিত হয়েছে।



তবে সর্বক্ষেত্রেই তাপ নির্গত হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাপ শোষিতও হয়। যেমন— একটি গ্লাসে কিছু পানি নিয়ে তাতে কিছু নিশাদল (NH_4Cl) যোগ করে দ্রবণটি নাড়া দাও। দেখবে নিশাদল দ্রবীভূত হয়েছে এবং দ্রবণটি পূর্বের তুলনায় শীতল হয়েছে।

উপরিউক্ত উদাহরণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাপের পরিবর্তন হয়। তাপ এক প্রকার শক্তি। এ অধ্যায়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির পরিবর্তন, বিশেষ করে তাপ শক্তির পরিবর্তন আলোচিত হবে।

১১.২ তাপোৎপাদী ও তাপহারী বিক্রিয়া (Exothermic and endothermic reactions)

সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপশক্তির পরিবর্তন হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ পরিবর্তনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য। তাপশক্তির পরিবর্তন দুই ধরনের হয়। কোনো বিক্রিয়ায় তাপ উৎপাদিত হয়, কোনো বিক্রিয়ায় তাপ শোষিত হয়।

যে বিক্রিয়ায় তাপ উৎপাদিত হয় তাকে তাপোৎপাদী বিক্রিয়া বলা হয়।

যে বিক্রিয়ায় তাপ শোষিত হয় তাকে তাপহারী বিক্রিয়া বলা হয়।

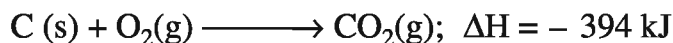
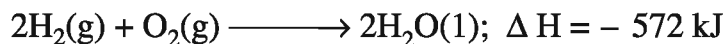
১১.৩ শক্তি পরিবর্তনের এককসমূহ (Units of heat change)

বহু বৎসর যাবৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপশক্তির পরিবর্তন মাপার একক হিসেবে কিলোক্যালরি ব্যবহৃত হয়। এর সংকেত হচ্ছে Kcal.। এক কিলোগ্রাম পানির তাপমাত্রা 1°C বাড়াতে যে পরিমাণ তাপ প্রদান করতে হয় তাকে এক কিলোক্যালরি বলা হয়। এর এক হাজার ভাগের এক ভাগকে ক্যালরি বলা হয় এবং বিজ্ঞানে তাপশক্তির একক হিসেবে তা ব্যবহৃত হত। 1 g পানির তাপমাত্রা 1°C বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপশক্তিকে এক ক্যালরি বলা হয়।

আধুনিককালে সকল ধরনের শক্তির আন্তর্জাতিক একক হিসেবে জুল (Joule) গৃহীত হয়েছে। কোনো বস্তুর উপর 1N বল প্রয়োগে বলের দিকে 1 মিটার (m) সরণের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ = 1 Joule। শক্তির অপর একক ক্যালোরি। জুল ও ক্যালোরির সম্পর্ক হচ্ছে, 1 Cal = 4.18 Joule। রাসায়নিক তাপ পরিবর্তনের পরিমাণকে 1 হাজার জুল বা 1 kJ এককে প্রকাশ করা হয়। এর সংকেত হচ্ছে kJ.।

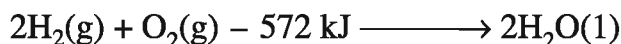
১১.৪ ΔH সংকেত (The ΔH notation)

কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ পরিবর্তনকে ΔH (উচ্চারণ : ডেলটা এইচ) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আধুনিক রীতি অনুযায়ী যদি বিক্রিয়ায় তাপ উৎপাদিত হয়, তবে ΔH ঋণাত্মক। বিক্রিয়ায় তাপ শোষিত হলে ΔH ধনাত্মক।

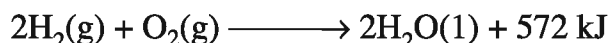


এ ধরনের সমীকরণকে তাপ-রাসায়নিক সমীকরণ বলা হয়।

প্রথম বিক্রিয়াটিকে নিম্নরূপেও লেখা যায় :



অর্থাৎ চিহ্নসহ ΔH এর মান বামপার্শ্বে বিক্রিয়কের সাথে বসতে পারে। আবার সমীকরণের নিয়মানুসারে বিক্রিয়াটিকে এভাবেও লেখা যায় :



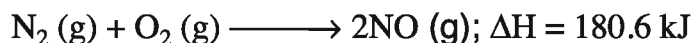
তাপের আগের যোগ চিহ্ন আছে বিধায় তাপ এ বিক্রিয়ায় একটি উৎপাদ।

উপরিউক্ত দুইটি সমীকরণকে সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করলে হবে :

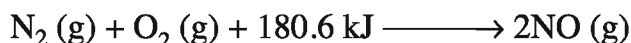
(১) ২ মোল হাইড্রোজেন গ্যাস ১ মোল অক্সিজেন গ্যাসের সাথে সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করে (বা অক্সিজেন গ্যাসে পুড়ে) ২ মোল তরল পানি উৎপন্ন করে। এ সময় ৫৭২ kJ তাপ নির্গত হয়।

(২) ১ মোল কঠিন কার্বন সম্পূর্ণরূপে ১ মোল অক্সিজেন গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করে ১ মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। একই সাথে ৩৯৪ kJ তাপ নির্গত হয়।

একইভাবে তাপহারী বিক্রিয়াসমূহ লেখা যায়, যেমন :



এ বিক্রিয়াকে নিম্নরূপেও লেখা যায় :

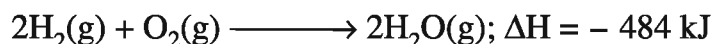


এ বিক্রিয়ায় তাপ শোষিত হয়েছে।

এ সমীকরণের অর্থ হচ্ছে :

১ মোল নাইট্রোজেন গ্যাস ১ মোল অক্সিজেন গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করে ২ মোল নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। এ সময় ১৮০.৬ kJ তাপ পরিপার্শ্ব হতে শোষিত হয়।

এ ধরনের সমীকরণসমূহে বিক্রিয়ক ও উৎপাদসমূহের অবস্থা (গ্যাসীয়, তরল বা কঠিন) উল্লেখ করা অতীব প্রয়োজন। কেননা, অবস্থা ভেদে ΔH এর মান পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন প্রথম বিক্রিয়ায় তরল পানি উৎপাদিত হলে যে তাপশক্তির পরিবর্তন হয়, তা উল্লেখিত হয়েছে। তরল পানিকে গ্যাসীয় অবস্থায় আনতে তাপশক্তির যোগান দিতে হয়। সুতরাং উক্ত বিক্রিয়ায় গ্যাসীয় পানি উৎপাদিত হলে আরো কম পরিমাণ তাপ নির্গত হবে। আরেকটি তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার উদাহরণ :



প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য যে, ΔH এর মান পদার্থের অবস্থা ছাড়াও তাপমাত্রা ও চাপের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে বিভিন্ন বিক্রিয়ায় তাপ পরিবর্তনকে সঠিকভাবে মাপার জন্য প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপ ব্যবহার করতে হয়। এ ক্ষেত্রে

প্রমাণ তাপমাত্রা = ২৫°C বা ২৯৮ K

প্রমাণ চাপ = ১ atm বায়ুচাপ।

লক্ষ কর গ্যাসের আয়তন মাপার ক্ষেত্রে যে প্রমাণ তাপমাত্রা ব্যবহৃত হয়, তা থেকে এ প্রমাণ তাপমাত্রা ভিন্ন।

১১.৫ তাপ পরিবর্তনের কারণ

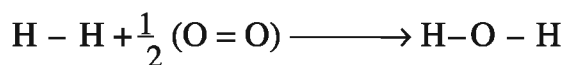
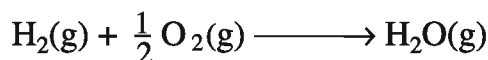
আমরা জানি শক্তি অবিনশ্বর অর্থাৎ শক্তি সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না। প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপশক্তি উদ্ভব হয় কোথা থেকে বা শোষিত হয়ে কোথায় যায়?

যে কোনো বস্তুর অণুতে বিভিন্ন পরমাণু বা আয়নের মধ্যে রাসায়নিক বন্ধন বিদ্যমান। এ সকল বন্ধন শক্তির আধার। এ শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি বলা হয়। একটি বন্ধন ভাঙতে শক্তি যোগান দিতে হয়। আবার ঐ বন্ধন সৃষ্টি হলে সেই শক্তি নির্গত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোনো পরমাণু সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না, তাদের মধ্যকার বন্ধন ভাঙে এবং নতুন বন্ধন গড়ে। এ বন্ধন ভাঙা ও গড়ায় সর্বমোট যে শক্তির পরিবর্তন হয়, সেটাই বিক্রিয়ায় তাপ ও অন্যান্য শক্তি পরিবর্তন হিসেবে দেখা যায়। যদি বন্ধন ভাঙতে কম পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, নতুন বন্ধন সৃষ্টিতে অধিক পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়, তবে বিক্রিয়ায় এ দুই শক্তির পার্থক্যের সমান পরিমাণ শক্তি নির্গত হবে। অপরদিকে বন্ধন ভাঙতে যদি অধিক পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় তবে বিক্রিয়ায় দুই শক্তির পার্থক্যের সমান পরিমাণ শক্তি শোষিত হবে।

বন্ধন ভাঙার প্রয়োজনীয় শক্তি > বন্ধন সৃষ্টিতে নির্গত শক্তি \Rightarrow তাপহারী বিক্রিয়া।

বন্ধন ভাঙার প্রয়োজনীয় শক্তি < বন্ধন সৃষ্টিতে নির্গত শক্তি \Rightarrow তাপোৎপাদী বিক্রিয়া।

দুই একটি উদাহরণ হতে একথা স্পষ্ট হবে। হাইড্রোজেন অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে বন্ধন শক্তি 435 kJ/mole। (kJ/mole = kJ \div mole = kJ mole⁻¹)। অক্সিজেন অণুতে দুইটি অক্সিজেন পরমাণুর মধ্যে বন্ধনশক্তি 498 kJ/mole। পানির অণুতে একটি অক্সিজেন ও একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে বন্ধনশক্তি 464 kJ/mole। হাইড্রোজেন গ্যাস ও অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে বিক্রিয়ার সময় নিম্নোক্ত বন্ধনসমূহ ভাঙে ও গড়ে :



1 মোল H - H বন্ধন ভাঙতে 435 kJ শক্তি শোষিত হয়। অর্ধ মোল O = O বন্ধন ভাঙতে $498 \div 2 = 249$ kJ শক্তি শোষিত হয়।

আবার, দুই মোল O - H বন্ধন সৃষ্টি হতে $464 \times 2 = 928$ kJ শক্তি নির্গত হয়।

সুতরাং তত্ত্বীয় হিসাব অনুসারে বন্ধনসমূহ ভাঙতে সর্বমোট শক্তির প্রয়োজন = $435 + 249 = 684$ kJ। নতুন বন্ধন সৃষ্টিতে নির্গত শক্তি = 928 kJ।

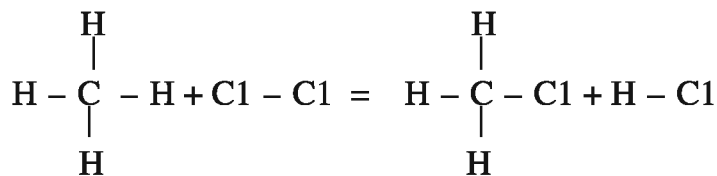
যেহেতু এ ক্ষেত্রে বন্ধন ভাঙার শক্তি < নতুন বন্ধন সৃষ্টির শক্তি

সুতরাং এ বিক্রিয়া তাপোৎপাদী এবং এ বিক্রিয়ায় উৎপাদিত শক্তির পরিমাণ = $928 - 684 = 244$ kJ।

এ মান ইতোপূর্বে উল্লিখিত গ্যাসীয় পানি সৃষ্টিতে উৎপাদিত তাপ শক্তির প্রায় কাছাকাছি।

উদাহরণ : দেওয়া আছে যে, C - H, C - Cl, Cl - Cl ও H - Cl বন্ধন শক্তিসমূহ যথাক্রমে 414, 326, 244 ও 431 kJ/mole। নিম্নোক্ত বিক্রিয়ায় ΔH এর মান বের কর।

সমাধান : সব বন্ধন দেখিয়ে বিক্রিয়াটি নিম্নরূপে লেখা যায় :



সুতরাং দেখা যায় যে, বিক্রিয়ায় এক মোল C-H এবং এক মোল Cl-Cl বন্ধন ভাঙে। এ জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি = 414 + 244 = 658 kJ।

আবার এ বিক্রিয়ায় এক মোল C - Cl এবং এক মোল H-Cl বন্ধন সৃষ্টি হয়। এতে উৎপাদিত শক্তি = 326 + 431 = 757 kJ।

দেখা যায় যে, বন্ধন ভাঙার শক্তি < নতুন বন্ধন সৃষ্টিতে নির্গত শক্তি।

সুতরাং এটি একটি তাপোৎপাদী বিক্রিয়া, অর্থাৎ ΔH ঋণাত্মক।

এ দুইটি মানের পার্থক্য হতে ΔH এর মান পাওয়া যায়।

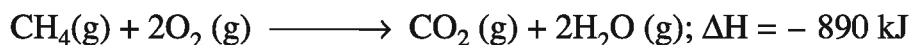
$$\Delta H = 658 - 757 = -99 \text{ kJ (উঃ)}।$$

১১.৬ বিভিন্ন ধরনের তাপ পরিবর্তন

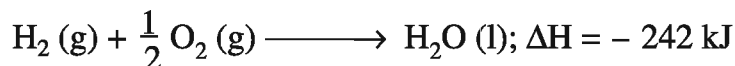
রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহকে যেমন বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়, তেমনি বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে তাপ পরিবর্তনকেও বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন দহন তাপ, প্রশমন তাপ ইত্যাদি। এ ছাড়া বিভিন্ন ভৌত পরিবর্তনেও তাপশক্তির পরিবর্তন হয়। আমরা এখানে মাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তাপ পরিবর্তন আলোচনা করব।

(১) দহন-তাপ : 1 atm চাপে কোনো যৌগিক বা মৌলিক পদার্থের 1 মোল সম্পূর্ণরূপে অক্সিজেনে দহন করলে তাপশক্তির যে পরিবর্তন হয়, তাকে সে পদার্থের দহন-তাপ বলা হয়।

যেমন 1 মোল অর্থাৎ 16g মিথেনকে অক্সিজেনে সম্পূর্ণরূপে পোড়ালে 890 kJ তাপ নির্গত হয়। সুতরাং মিথেনের দহন-তাপ হচ্ছে 890 kJ / মোল। অন্য কথায় গেলে নিম্নোক্ত বিক্রিয়ায় তাপ পরিবর্তনই হচ্ছে মিথেনের দহন-তাপ।

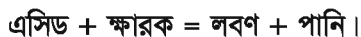


একইভাবে হাইড্রোজেনের দহন-তাপ হচ্ছে -242 kJ / মোল, কেননা, নিম্নোক্ত বিক্রিয়ায় 1 মোল হাইড্রোজেনের দহন তাপ হচ্ছে।



দহনের সময় পদার্থের অণুর বন্ধনসমূহ ভাঙে, অক্সিজেন অণুর বন্ধনও ভাঙে; কিন্তু একই সাথে শক্তিশালী C = O, O - H প্রভৃতি বন্ধন সৃষ্টি হয়। এ কারণেই দহনে সর্বদা শক্তি নির্গত হয়।

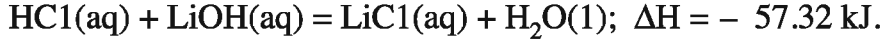
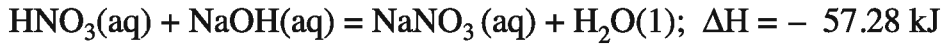
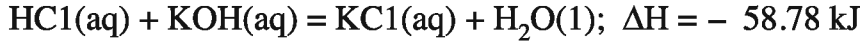
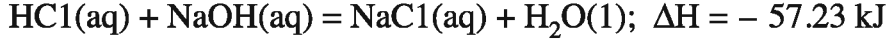
(২) প্রশমন তাপ : এসিডের সাথে ক্ষারকের বিক্রিয়াকে প্রশমন বিক্রিয়া বলা হয়। সকল প্রশমন বিক্রিয়ায় তাপের উদ্ভব হয়। প্রশমন বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়।



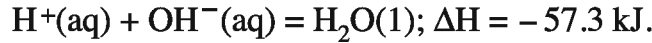
এসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় 1 মোল পরিমাণ পানি উৎপাদনে যে পরিমাণ তাপ নির্গত হয়, তাকে প্রশমন তাপ বলে।

একটি তীব্র এসিড এবং একটি তীব্র ক্ষারের দ্বারা প্রশমিত করলে প্রশমন তাপ প্রায় ধ্রুবক হয় এবং এর মান

মোটামুটিভাবে 57.3 kJ। যেমন :



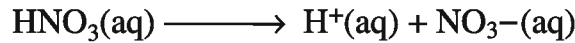
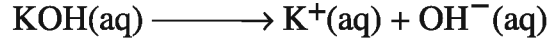
এখানে aq দ্বারা জলীয় দ্রবণ বুঝানো হয়েছে। তড়িৎ বিশ্লেষণের তত্ত্ব হতে এ ধ্রুবক মানের ব্যাখ্যা সহজে পাওয়া যায়। সকল তীব্র এসিড ও ক্ষারক জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণরূপে আয়নিত অবস্থায় থাকে। তাই যে কোনো তীব্র এসিড বা ক্ষারক নেওয়া হোক না কেন প্রশমন বিক্রিয়ায় শুধু হাইড্রোজেন ও হাইড্রোক্সাইড আয়ন পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে পানি তৈরি করে। অন্যান্য আয়ন পূর্বের ন্যায় মুক্ত থাকে। এ কারণে সকল ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া সংগঠিত হয় এবং তাপের পরিবর্তন হয়।



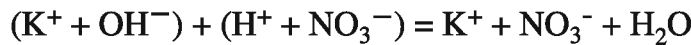
দুই একটি উদাহরণ হতে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। মনে কর হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্বারা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণকে প্রশমিত করা হয়েছে। দ্রবণে হাইড্রোক্লোরিক এসিড H^+ ও Cl^- আয়ন এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড Na^+ ও OH^- আয়ন প্রদান করে। সুতরাং তাদের মধ্যে বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ হবে :



একইভাবে পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও নাইট্রিক এসিডের বিক্রিয়া নিম্নের সমীকরণ সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়



সুতরাং তাদের মধ্যে বিক্রিয়া নিম্নরূপ



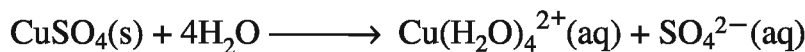
যেহেতু সকল তীব্র এসিড ও ক্ষারকের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে একই বিক্রিয়া হচ্ছে, সেহেতু সকল ক্ষেত্রে প্রশমন তাপ একই।

(৩) দ্রবণ তাপ : কোনো পদার্থের এক মোলকে যথেষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে দ্রবীভূত করলে তাপের যে পরিবর্তন হয়, তাকে সে পদার্থের দ্রবণ তাপ বলা হয়।

দ্রাবকের পরিমাণের ওপর দ্রবণ তাপ কিছুটা নির্ভর করে। সাধারণত দ্রাবকের পরিমাণ এতটা বেশি রাখা হয়, যেন দ্রবণকে খুব লঘু বলে ধরা যায়।

কঠিন আয়নিক যৌগে বিপরীতধর্মী আয়নসমূহ পরস্পরের যতটা সম্ভব কাছে থেকে পরস্পরকে আকর্ষণ করে; আবার সমধর্মী আয়নসমূহ পরস্পর হতে যতটা সম্ভব দূরে থেকে পরস্পরকে বিকর্ষণ করে; তবে কঠিন পদার্থে সবসময় আকর্ষণ শক্তি বেশি থাকে। পানিতে দ্রবীভূত করার সময় এ আকর্ষণকে অতিক্রম করতে হয়, কেননা দ্রবণে আয়নসমূহ পরস্পর হতে মোটামুটি দূরে সরে যায়। এ কারণে প্রায় সকল ক্ষেত্রে দ্রবণের সময় তাপ শোষিত হয়; অর্থাৎ ΔH ধনাত্মক।

অপরদিকে কিছু ক্ষেত্রে দ্রবণের সাথে সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত হয় এবং সত্যিকার দ্রবণ তাপ অপেক্ষা অনেক বেশি তাপ নির্গত হয়, ফলে সামগ্রিকভাবে তাপ নির্গত হয়। যেমন পানিশূন্য কপার সালফেট পানিতে দ্রবীভূত হওয়ার সময় তাপ নির্গত হয়, কেননা দ্রবণের সাথে সাথে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।



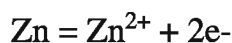
১১.৭ তড়িৎ-রাসায়নিক কোষ (Electrochemical cell)

দুইটি ইলেকট্রোড বা তড়িৎদ্বারকে একই বা দুইটি ভিন্ন তড়িৎ বিশ্লেষ্যের দ্রবণে নিমজ্জিত করে তড়িৎ-রাসায়নিক কোষ বা সেল প্রস্তুত করা হয়। এটি প্রধানত দুই ধরনের; (১) গ্যালভানিক সেল ও (২) তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষ। দ্বিতীয়টি সম্পর্কে ইতিপূর্বে দশম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

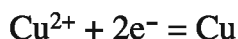
যে বৈদ্যুতিক কোষে রাসায়নিক শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তাকে তড়িৎ-রাসায়নিক কোষ বা গ্যালভানিক সেল বলা হয়।

ইটালির বৈজ্ঞানিক ভোল্টার (Count Volta) নামানুসার একে ভোল্টার কোষও বলা হয়। সকল ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হতে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় না। শুধুমাত্র জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়; কেননা এ সময় ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে আর বিদ্যুৎ হচ্ছে ইলেকট্রনের প্রবাহ। বিভিন্ন ধরনের গ্যালভানিক সেল আছে। তন্মধ্যে ডেনিয়েল সেল বা কোষ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

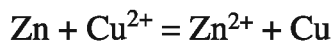
ডেনিয়েল (Daniell) কোষ : এ কোষ নিম্নরূপে সহজে প্রস্তুত করা যায় (চিত্র ১১.১) একটি কাচের পাত্রে কপার সালফেট দ্রবণ এবং একটি গ্লোজ না দেওয়া কাদামাটির পাত্রে জিংক সালফেট দ্রবণ নাও। এবার কাদামাটির পাত্রটি কাচের পাত্রের ভিতরে এক পাশে বসিয়ে দাও। দ্রবণদ্বয়ের উচ্চতা সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। কপার সালফেট দ্রবণে একটি কপার দণ্ড এবং জিংক সালফেট দ্রবণে একটি জিংক দণ্ড প্রবেশ করিয়ে দুই খণ্ড কপার তার দ্বারা একটি টর্চ বাত্বকে কপার ও জিংক দণ্ডদ্বয়ের সাথে সংযোগ করলে বাত্ব জ্বলে উঠবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং ইলেকট্রন নির্গত হয়।



ইলেকট্রন তার দিয়ে কপার দণ্ডে যায় এবং কপার সালফেট দ্রবণের কপার আয়ন এ ইলেকট্রনকে গ্রহণ করে ধাতব কপারে রূপান্তরিত হয় এবং কপার দণ্ডের গায়ে লেগে যায়।



সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কোষে সামগ্রিকভাবে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।



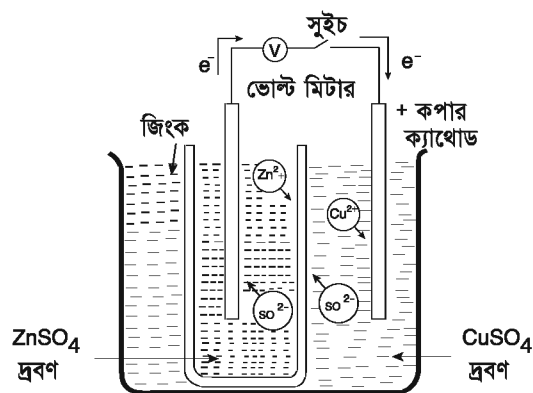
এ বিক্রিয়ার শক্তিই বিদ্যুৎ প্রবাহে রূপান্তরিত হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহের সময় জিংক দণ্ড ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অন্যদিকে কপার দণ্ড ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

এ অধ্যায়ে যা শিখলাম

তাপোৎপাদী বিক্রিয়া : যে বিক্রিয়ায় তাপ নির্গত হয়, তাকে তাপোৎপাদী বিক্রিয়া বলা হয়।

তাপহারী বিক্রিয়া : যে বিক্রিয়ায় তাপ শোষিত হয়, তাকে তাপহারী বিক্রিয়া বলা হয়।

বিক্রিয়ায় তাপশক্তি পরিবর্তন : বিক্রিয়ায় তাপশক্তির পরিবর্তনকে ΔH সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আধুনিককালে এর একক kJ ধরা হয়। বিক্রিয়ায় তাপশক্তি শোষিত হলে ΔH ধনাত্মক, তাপ নির্গত হলে ΔH ঋণাত্মক হয়।



চিত্র ১১.১ : ডেনিয়েল সেল। গ্লোজ না দেওয়া সচ্ছিদ্র কাদামাটির পাত্র অ্যানোড থাকোঁঠ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

শক্তি পরিবর্তনের উৎস : রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কিছু রাসায়নিক বন্ধন ভাঙে, কিছু নতুন বন্ধন সৃষ্টি হয়। বন্ধন ভাঙার সময় শক্তির যোগান দিতে হয়, বন্ধন সৃষ্টির সময় শক্তি নির্গত হয়। এ দুইটি প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ শক্তি শোষিত বা নির্গত হয়, তাই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শোষিত বা নির্গত শক্তি। বিভিন্ন বন্ধনের শক্তি জেনে তাত্ত্বিকভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার তাপ পরিবর্তনের পরিমাণ হিসাব করা যায়।

দহন তাপ : 1 atm চাপে কোনো যৌগিক বা মৌলিক পদার্থের এক মোল সম্পূর্ণরূপে অক্সিজেনে দহন করলে তাপশক্তির যে পরিবর্তন হয়, তাকে সে পদার্থের দহন তাপ বলা হয়।

প্রশমন তাপ : এসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় 1 মোল পরিমাণ পানি উৎপাদনে যে পরিমাণ তাপ নির্গত হয়, তাকে প্রশমন তাপ বলে।

একটি তীব্র এসিডকে একটি তীব্র ক্ষারক দ্বারা প্রশমনে তাপ প্রায় ধ্রুবক এবং এর মান মোটামুটিভাবে 57.3 kJ.

দ্রবণ তাপ : এক মোল কোনো বস্তুকে যথেষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে দ্রবীভূত করলে তাপের যে পরিবর্তন হয়, তাকে সে বস্তুর দ্রবণ তাপ বলা হয়।

তড়িৎ রাসায়নিক কোষ বা গ্যালভানিক সেল বা কোষ : যে কোষে রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তাকে তড়িৎ রাসায়নিক কোষ বা গ্যালভানিক সেল বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যে কোষে রাসায়নিক বিক্রিয়া হতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাকে গ্যালভানিক সেল বলা হয়। ডেনিয়েল সেল এরূপ তড়িৎ রাসায়নিক কোষের উদাহরণ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোনটি পানিতে রাখলে পানি গরম হয়?

ক. CaCO_3

খ. CaCl_2

গ. Ca(OH)_2

ঘ. CaO

২. প্রশমন বিক্রিয়ায়—

i. তাপ উৎপন্ন হয়

ii. তাপ শোষিত হয়

iii. ΔH ঋণাত্মক হয়

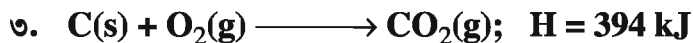
সঠিক উত্তর কোনটি?

ক. i

খ. iii

গ. i এবং ii

ঘ. i, ii এবং iii

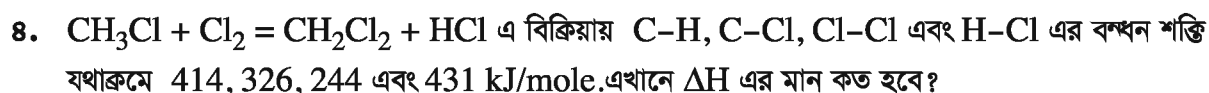


উপরিউক্ত বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন উক্তিগুলো সঠিক?

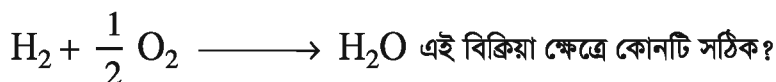
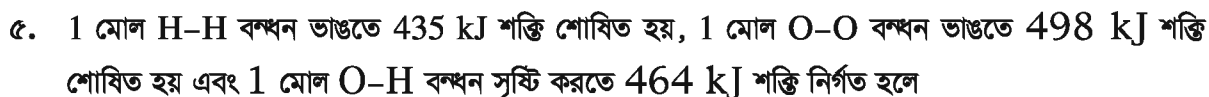
- 1 মোল C 1 মোল O_2 এর সাথে বিক্রিয়া করে 1 মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে
- এ বিক্রিয়ায় 394 কিলোজুল তাপ শোষিত হয়
- এটি একটি তাপোৎপাদী বিক্রিয়া

সঠিক উত্তর কোনটি?

- | | |
|---------------|------------------|
| ক. i এবং ii | খ. i এবং iii |
| গ. ii এবং iii | ঘ. i, ii এবং iii |



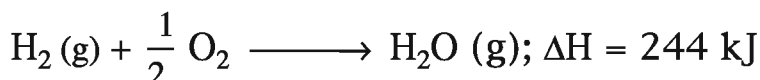
- | | |
|------------|------------|
| ক. 315 kJ | খ. -425 kJ |
| গ. -751 kJ | ঘ. -99 kJ |



- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ক. 469 kJ তাপ উৎপন্ন হবে | খ. 469 kJ তাপ শোষিত হবে |
| গ. 244 kJ তাপ উৎপন্ন হবে | ঘ. 244 kJ তাপ শোষিত হবে |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

নিচে একটি তাপ রাসায়নিক সমীকরণ দেয়া হল :



- ΔH কী?
- এখানে তাপের পরিমাণ, $\Delta H = 244 \text{ kJ}$ বলতে কী বুঝায়, তা ব্যাখ্যা কর।
- H-H, O=O এবং O-H বন্ধন শক্তিসমূহ যথাক্রমে 435, 498 ও 643 kJ/mol হলে নিচের বিক্রিয়া থেকে ΔH এর মান বের কর।
- $H_2(g) + \frac{1}{2} O_2 \longrightarrow H_2O(l)$

“প্রদত্ত বিক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপ শুধুমাত্র বিক্রিয়ক (H_2 , O_2) ও উৎপন্ন পদার্থ (H_2O)-এর অভ্যন্তরীণ গঠনের নির্ভর করে”—উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

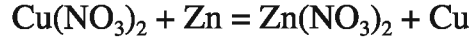
দ্বাদশ অধ্যায়

ধাতু নিষ্কাশন

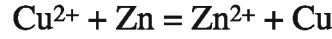
বিষয়বস্তু : সক্রিয়তা সিরিজ; ধাতু নিষ্কাশনের বিভিন্ন পদ্ধতি; তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের নিষ্কাশন; কার্বন বিজারণ পদ্ধতির সাহায্যে জিংক, লেড ও আয়রনের নিষ্কাশন; ইস্পাতের প্রস্তুতি; কপারের নিষ্কাশন ও বিশোধন।

১২.১ সক্রিয়তা ক্রম ও ধাতু নিষ্কাশন (Reactivity series and extraction of metals)

বহুকাল আগে হতে একথা জ্ঞাত যে কোনো ধাতব লবণের জলীয় দ্রবণে আরেকটি ধাতু যোগ করলে তা লবণ হতে প্রথমে ধাতুকে অপসারণ করে। যেমন কপার লবণের দ্রবণে জিংক ধাতু প্রবেশ করালে তা লবণ হতে কপারকে প্রতিস্থাপন করে।



এ বিক্রিয়াকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করাই অধিকতর যুক্তিসংগত :



এর বিপরীত বিক্রিয়া ঘটে না অর্থাৎ জিংক লবণের দ্রবণে কপার ধাতু যোগ করলে তা লবণ হতে জিংককে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। এ থেকে বুঝা যায় যে জিংক কপার ধাতু অপেক্ষা অধিক সক্রিয়।

এভাবে বিভিন্ন ধাতব লবণের সাথে ধাতুসমূহ বিক্রিয়া করে কি করে না, তা দেখে একটি ধাতু অন্য কোনো ধাতু অপেক্ষা সক্রিয় তা বের করা যায়। অধিকতর সক্রিয় ধাতুকে উপরে এবং তা অপেক্ষা কম সক্রিয় ধাতুকে নিচে বসিয়ে ধাতুর একটি সংখ্যাক্রম পাওয়া যায়। একে ধাতুসমূহের সক্রিয়তা ক্রম বলা হয়। নিম্নে এ ক্রমে সাধারণ ধাতুসমূহের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

ধাতু	সংকেত	
পটাসিয়াম	K	সবচেয়ে বেশি তড়িৎ ধনাত্মক (electropositive) ধাতু
সোডিয়াম	Na	
ক্যালসিয়াম	Ca	
ম্যাগনেসিয়াম	Mg	
অ্যালুমিনিয়াম	Al	
জিংক (দস্তা)	Zn	
আয়রন (লোহা)	Fe	
লেড (সীসা)	Pb	
হাইড্রোজেন	H	
কপার (তামা)	Cu	
সিলভার (রূপা)	Ag	এ ক্রমে সবচেয়ে কম তড়িৎ ধনাত্মক ধাতু।

১২.৩ তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে ধাতু নিষ্কাশন (Metal extraction by electrolysis)

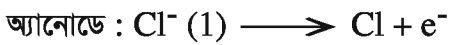
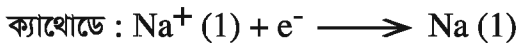
ইতোপূর্বে যে সক্রিয়তা ক্রম দেখানো হয়েছে তার প্রথম ছয়টি ধাতুকে তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে নিষ্কাশন করা হয়। তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহুল, এ কারণে এভাবে উৎপন্ন ধাতুসমূহ মূল্যবান।

লিথিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামকে তাদের ক্লোরাইড লবণের তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুক্ত করা হয়। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অ্যালুমিনিয়ামকে মুক্ত ধাতু হিসেবে পাওয়া যায়।

সোডিয়াম নিষ্কাশন : প্রকৃতিতে সোডিয়াম মুক্ত অবস্থায় নেই, কিন্তু তার বিভিন্ন যৌগ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। তন্মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড খাদ্য লবণ হিসেবে সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় এবং খনিজ লবণ হিসেবে খনিতে কঠিন পাথররূপে বিদ্যমান। চিলির মরুভূমিতে সল্টপিটার নামে খনিজ হিসেবে সোডিয়াম নাইট্রেট পাওয়া যায়। সাজিমাটিতে সোডিয়াম কার্বনেট বিদ্যমান। এ ছাড়া সোহাগারূপে সোডিয়াম পাইরোবোরেট বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায়। এ সকল যৌগ সোডিয়ামের অন্যান্য যৌগ তৈরিতে ব্যবহৃত হলেও সোডিয়াম ধাতু তৈরিতে সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয়।

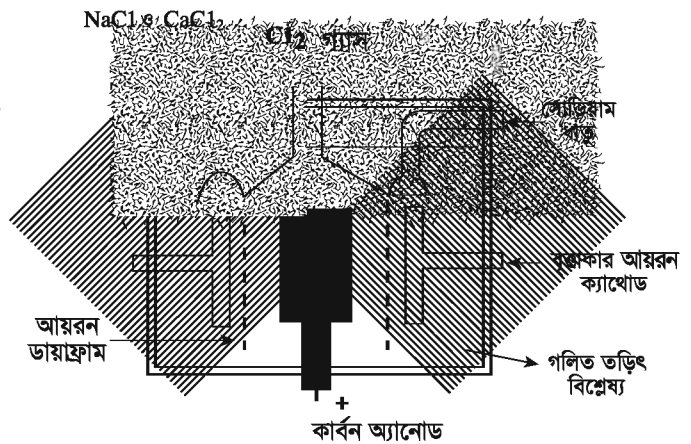
বর্ণনা : ডাউনের (Down's Method) পদ্ধতিতে লোহার তৈরী একটি ট্যাংকে সোডিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের একটি মিশ্রণ নিয়ে বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে 600°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে গলানো হয় (চিত্র ১২.১)। সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলনাঙ্ক 801°C । ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড মিশালে ইহার গলনাঙ্ক হ্রাস পেয়ে 600°C হয়। ট্যাংকের তলদেশ দিয়ে প্রবেশকৃত একটি প্রশস্ত গ্রাফাইট দণ্ড অ্যানোড হিসেবে কাজ করে। ঐ অ্যানোডের কিছু দূরে একটি লোহার বলয় অ্যানোডকে বেষ্টিত করে রাখে। এ লোহার বলয় ক্যাথোডরূপে কাজ করে। অ্যানোড ও ক্যাথোডের মাঝখানে একটি লোহার সরু তারজালি থাকে, যেন ক্যাথোডে উৎপন্ন সোডিয়াম অ্যানোডের দিকে যেতে না পারে। ক্যাথোডের উপরের অংশ একটা ঢাকনি দ্বারা ঢাকা থাকে, এ ঢাকনির উপরদিকে একটি পাইপ থাকে, যেন উৎপন্ন সোডিয়াম এ পাইপ দিয়ে বাইরে চলে যায়। অ্যানোডের উপর একটি গম্বুজাকৃতির ঢাকনি থাকে। এ ঢাকনির মধ্য দিয়ে ক্লোরিন নির্গত হয়।

এ সেলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে ক্যাথোডে সোডিয়াম আয়ন বিজারিত হয়ে সোডিয়াম ধাতুতে পরিণত হয়। অপরদিকে অ্যানোডে ক্লোরাইড আয়ন জারিত হয়ে ক্লোরিন পরমাণু সৃষ্টি করে এবং দুইটি পরমাণু একত্রে ক্লোরিন অণু সৃষ্টি করে। বিক্রিয়াসমূহ হচ্ছে :



তরল সোডিয়াম ধাতু ক্যাথোডে সঞ্চিত হয় এবং গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড অপেক্ষা হালকা বলে ক্যাথোডের ঢাকনির সাথে সংযুক্ত নলের মধ্য দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং একটি কেরোসিন ভর্তি পাত্রে জমা করা হয়। অপরদিকে অ্যানোডে ক্লোরিন গ্যাস সৃষ্টি হয় এবং গম্বুজাকৃতির ঢাকনির মধ্য দিয়ে বাইরে অন্য পাত্রে চলে আসে, যেখানে তাকে তরল করে জমা করা হয়।

এ পদ্ধতিতে পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম ধাতুসমূহকেও এদের ক্লোরাইড লবণ থেকে নিষ্কাশন করা হয়।

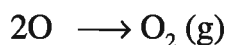
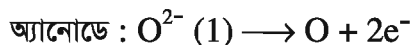
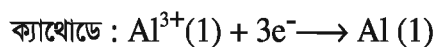
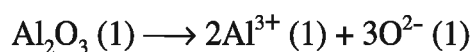


চিত্র ১২.১ : সোডিয়াম ক্লোরাইড হতে সোডিয়াম ধাতুর নিষ্কাশন

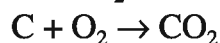
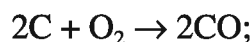
অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর নিষ্কাশন : ভূত্বকের প্রায় ৭ শতাংশ হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম। অ্যালুমিনিয়ামের খনিজ হচ্ছে বক্সাইট বা পানিযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড $Al_2O_3 \cdot 2H_2O$ । একে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায় এবং এর তড়িৎ বিশ্লেষণ হতে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করা হয়।

বজ্রাইট হতে বিভিন্ন অপদ্রব্য অপসারিত করে একে বিশুদ্ধ করা হয়, অতঃপর উত্তাপে এর পানি অপসারণ করে অনর্দ্র অ্যালুমিনিয়াম অজ্রাইডে রূপান্তরিত করা হয়। অ্যালুমিনিয়াম অজ্রাইডের গলনাঙ্ক প্রায় 2050°C । এত উচ্চ তাপমাত্রা অর্জন ব্যয়বহুল; তাই সরাসরি অ্যালুমিনিয়াম অজ্রাইডের পরিবর্তে এর সাথে ক্রাইওলাইট নামক খনিজের দ্রবণ মিশিয়ে কাজ করা হয়। ক্রাইওলাইট হচ্ছে বাণিজ্যিক নাম, এর বৈজ্ঞানিক নাম সোডিয়াম হেক্সাফ্লুরো অ্যালুমিনেট ও সংকেত Na_3AlF_6 । এর গলনাঙ্ক 1000°C । উভয়ের মিশ্রণ 900°C – 950°C তাপমাত্রায় গলে যায়।

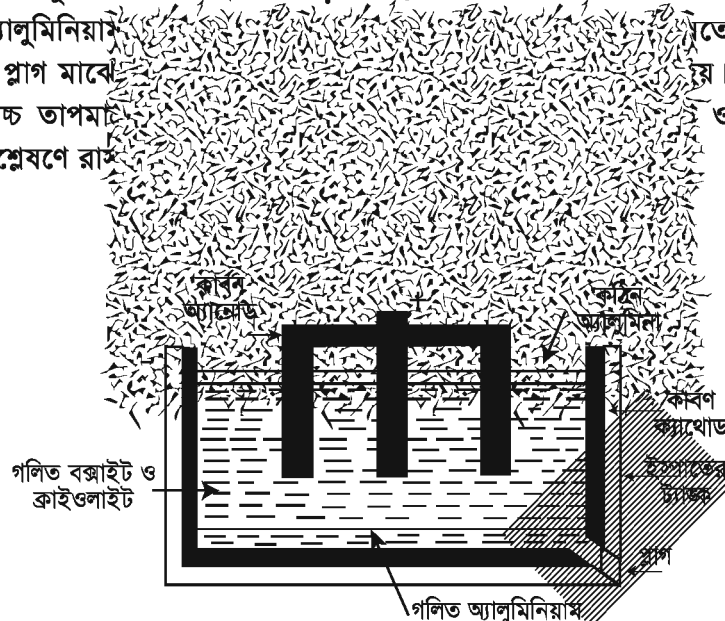
একটি ইস্পাতের ট্যাংকের ভিতরের অংশ গ্রাফাইটের স্তর দ্বারা আবৃত করা হয়। এ গ্রাফাইট স্তর ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে। অ্যানোড হিসেবে কয়েকটি গ্রাফাইট দণ্ড ব্যবহৃত হয় (চিত্র ১২.২)। এ ট্যাংকে বিগলিত বজ্রাইটের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়। বজ্রাইটের গলনাঙ্ক কমানোর জন্য ক্রাইওলাইট (Na_3AlF_6) যোগ করা হয়। এ তড়িৎ প্রবাহের কারণে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণ চলতে থাকে। ক্যাথোডে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু সঞ্চিত হতে থাকে। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণে অ্যানোডে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়, যা এ উচ্চ তাপমাত্রায় কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে। তড়িৎ বিশ্লেষণে রাস



পরবর্তীতে কার্বনের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া :



যেহেতু তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় অ্যানোড ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিছু সময় পর পর অ্যানোড পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।



চিত্র ১২.২ : তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন

১২.৪. কার্বন বিজারণের সাহায্যে ধাতু নিষ্কাশন (Metal extraction by carbon reduction)

এ পর্যন্ত যে সকল ধাতুর নিষ্কাশন আলোচনা করা হয়েছে, তারা খুব সক্রিয়। সক্রিয়তা ক্রমে এদের পরবর্তী মৌলসমূহ আদিকাল থেকে পরিচিত। এদের খনিজকে কয়লার সাথে উত্তপ্ত করেই এ সকল ধাতু নিষ্কাশন করা হত। সম্ভবত সেকালের গৃহা মানব এভাবেই লোহা তৈরি করেছিল। আধুনিক যুগেও একই প্রক্রিয়া চালু আছে, শুধু আধুনিক পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতি অধিক ব্যবহৃত হয় এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সমৃদ্ধ হওয়ায় বর্তমানে প্রতিটি ধাপ সূনিয়ন্ত্রিত হয়।

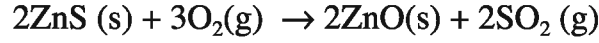
কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে জিংক, লেড ও আয়রন ইত্যাদি ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। এখানে জিংক ও আয়রনে নিষ্কাশন বর্ণনা করা হল।

জিংক নিষ্কাশন : প্রকৃতিতে জিংকের বিভিন্ন আকরিক বিদ্যমান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

(১) জিংক ব্লেন্ড বা জিংক সালফাইড, ZnS

(২) ক্যালামাইন বা জিংক কার্বনেট, $ZnCO_3$

বিভিন্ন ভৌত পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রথমে এ আকরিকসমূহ হতে অপদ্রব্যসমূহ অপসারিত করা হয়। অতঃপর এদেরকে বাতাসে উত্তপ্ত করা হয়, তখন এরা জিংক অক্সাইডে পরিণত হয়।

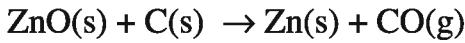


উৎপন্ন জিংক অক্সাইডের সাথে কোক চূর্ণ (কার্বন) মিশ্রিত করে একমুখ বন্ধ সিলিন্ডার আকৃতির রিটর্টে নেওয়া হয় (চিত্র ১২.৩)। এ রিটর্টটি অগ্নিসহ মাটির তৈরী। এর খোলামুখে মাটির তৈরী গ্রাহক নল জুড়ে দেওয়া হয়। এ নলটি জিংক বাষ্পের জন্য কনডেনসার বা শীতকরূপে কাজ করে। শীতকের শেষ মাথায় লোহার তৈরী একটি ক্ষুদ্রাকার শীতক থাকে, যাকে প্রোলং বা (prolong) প্রবর্ধন বলা হয়। প্রথম শীতকে যে জিংক বাষ্প ঘনীভূত হয় না, তাকে সংগ্ৰহ করাই এ প্রোলং—এর কাজ।

জিংক অক্সাইড ও কোকের মিশ্রণকে গ্যাসের সাহায্যে প্রায় ২৪ ঘণ্টা উত্তপ্ত করা হয়। এ সময় জিংক অক্সাইড বিজারিত হয়ে জিংকে রূপান্তরিত হয় এবং কার্বন জারিত হয়ে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন করে, যা কনডেনসারের মুখে জ্বলতে থাকে।

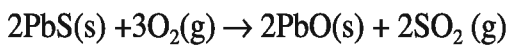


চিত্র ১২.৩ : কার্বন বিজারণের মাধ্যমে জিংক নিষ্কাশন

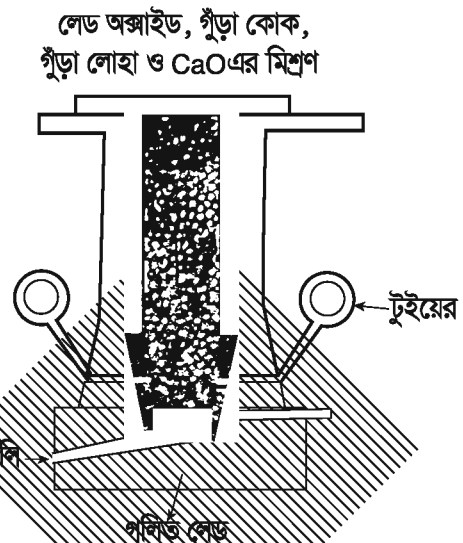
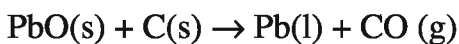


উৎপাদিত জিংক রিটর্ট হতে বাষ্পাকারে বের হয়ে আসে এবং এর বড় অংশ কনডেনসারে ঠাণ্ডা হয়ে তরল জিংক হিসেবে জমা হয়। এভাবে উৎপন্ন জিংক 97 - 98% বিশুদ্ধ হয়। প্রয়োজনবোধে তড়িৎ বিশোধনের সাহায্যে একে আরো বিশুদ্ধ করা হয়।

লেড নিষ্কাশন : প্রকৃতিতে লেড প্রধানত গ্যালেনা আকরিক হিসেবে থাকে, যা প্রকৃতপক্ষে লেড সালফাইড (PbS)। ভূপৃষ্ঠে তা বহুস্থানে পাওয়া যায়। শিল্পক্ষেত্রে গ্যালেনা আকরিককে ভৌত পদ্ধতির সাহায্যে কিছুটা পরিশুদ্ধ করে বাতাসের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করা হয়, তখন তা জারিত হয়ে লেড অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়।

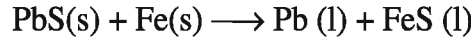


পরবর্তীতে লেড অক্সাইডের সাথে গুঁড়া কোক বা কয়লা মিশিয়ে ছোট বাত্যাচুল্লিতে উত্তপ্ত করা হয়, তখন লেড অক্সাইড কার্বন দ্বারা বিজারিত হয়ে লেড ধাতুতে পরিণত হয়।

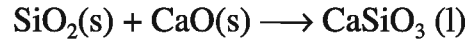


চিত্র ১২.৪ : কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে লেড নিষ্কাশন

প্রথম ধাপে কিছু লেড সালফাইড বিক্রিয়া না করে অপরিবর্তিত থেকে যেতে পারে। এ কারণে এর সাথে কিছু আয়রন যোগ করা হয়। যা লেড সালফাইডের সাথে বিক্রিয়া করে লেড ধাতুকে মুক্ত করে।



আকরিকের সাথে অপদ্রব্য হিসেবে সিলিকা (SiO_2) থাকে। এ কারণে কার্বন বিজারণের সময় কিছু ক্যালসিয়াম অক্সাইড যোগ করা হয়, যা সিলিকার সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম সিলিকেট বা ধাতুমল তৈরি করে।



বাত্যাচুল্লির উচ্চ তাপমাত্রায় লেড ও ক্যালসিয়াম সিলিকেট তরল হিসেবে থাকে। লেড ভারী বলে নিচে জমা হয়, ক্যালসিয়াম সিলিকেট তার উপরে ভিন্ন স্তর হিসেবে থাকে। দুইটি পৃথক নির্গম-নলের সাহায্যে চুল্লির তলদেশ হতে এদেরকে বের করে আনা হয়।

আয়রন নিষ্কাশন : আয়রন বা লোহার গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোনো দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য লোহার তৈরী বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজন। এ ছাড়া প্রকৃতিতে আয়রন যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। ভূত্বকের ওজনের শতকরা 4.15 ভাগ হচ্ছে লোহা। এ কারণে এবং আকরিক হতে কার্বন বিজারণের মাধ্যমে লোহাকে নিষ্কাশন করা যায় বলে প্রাচীনকাল হতে এ ধাতু মানব সমাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে সক্রিয় ধাতু হওয়ায় প্রকৃতিতে আয়রন মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না, তার বিভিন্ন যৌগ আকরিক হিসেবে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ আকরিকসমূহ হচ্ছে :

- (১) ম্যাগনেটাইট, Fe_3O_4
- (২) হেমাটাইট Fe_2O_3
- (৩) লিমোনাইট $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

এ সকল আকরিক হতেই আয়রন নিষ্কাশন করা হয়।

লোহা নিষ্কাশন বা কাস্ট আয়রন প্রস্তুতি

উচ্চ তাপে অক্সাইড খনিজগুলোকে কার্বন ও কার্বন মনোক্সাইড দ্বারা বিজারিত করে ধাতব লোহাতে পরিণত করা হয়। এ প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত ধাপসমূহে সমাপ্ত করা হয় :

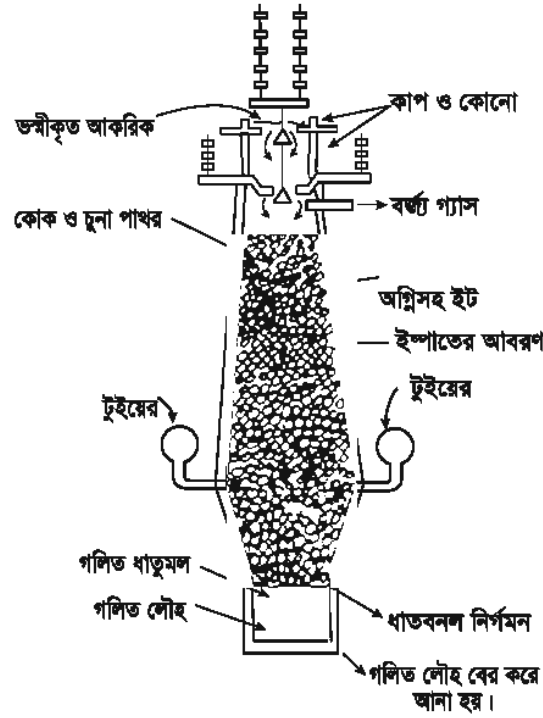
- (১) **ধৌতকরণ ও ঘনীভবন :** প্রথমে আকরিকের টুকরা টুকরা করা হয়। এরপর ছোট ছোট টুকরাগুলোকে পানির স্রোতে ধৌত করে কাদা, বালি ও অন্যান্য অপদ্রব্য দূর করা হয়। এ ধৌত আকরিককে চুম্বক দ্বারা ঘনীভবন করা হয়।
- (২) **ভস্মীকরণ :** এ অবস্থায় আকরিকের টুকরাগুলো 3-5 cm দীর্ঘ হয়। এদের একত্র করে বাতাসের সংস্পর্শে উত্তপ্ত করা হয়। এতে আকরিকের সাথে পানি, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও কিছু পরিমাণ সালফার ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়ে যায় এবং খনিজ পাথরগুলো অনেকটা হালকা ও ঝাঁঝরা হয়ে যায়। যদি আকরিকের ভিতর কিছু ফেরাস যৌগ থাকে তাও জারিত হয়ে ফেরিক অক্সাইডে পরিণত হয়।

বিগলন (Smelting) : এরপর খনিজগুলোকে কোক ও চুনা পাথরের সাথে মিশিয়ে বাত্যাচুল্লিতে উত্তপ্ত করা হয়। এতে খনিজ পদার্থগুলো বিজারিত হয়ে লোহাতে পরিণত হয় এবং বিগলিত অবস্থায় বের হয়ে আসে।

বাত্যাচুল্লি : লোহা নিষ্কাশনের ব্যবহৃত চিমনি আকৃতির বাত্যাচুল্লি আকারে বেশ বড় এবং পুরু ইস্পাতের পাত দ্বারা তৈরী। শতাধিক ফুট দীর্ঘ এ চুল্লির মাঝখানটি অপেক্ষাকৃত চওড়া। ইস্পাতের ভিতরের দিকে অগ্নিসহ মৃত্তিকার পুরু আস্তরণ দেওয়া থাকে। চুল্লির নিচের অংশে ও এর চারদিকে কয়েকটি শক্ত ও মোটা নল থাকে। এ নলগুলোকে টুইয়ের (tuyere) বলা হয়। এর সাহায্যে ভেতরে বায়ু সরবরাহ করা হয়। টুইয়ের নিচে চুল্লির নিম্নতম অংশে যে প্রকোষ্ঠ থাকে তাতে উৎপন্ন লোহা ও ধাতুমল জমা হয়। আকরিক, চুনা পাথর ও কোক প্রবেশ করানোর জন্য চুল্লির উপরে কাপ ও কোন (cup and cone) নামক বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এর সাহায্যে খনিজ প্রভৃতি ঢুকানোর সময় ভিতরের উত্তপ্ত গ্যাস ঐ পথ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। চুল্লির বর্জ্য গ্যাস যাতে বেরিয়ে যেতে পারে এজন্য উপরের দিকে অপর

একটি নির্গম পথ থাকে। বর্জ্য গ্যাসে কার্বন মনোঅক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন থাকে।

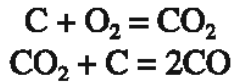
ভস্মীকৃত আকরিক, কোক ও চুনাপাথর উপর হতে কাপ ও কোনের সাহায্যে ছুন্নির ভেতর প্রবেশ করানো হয়। টুইয়েরের এর সাহায্যে প্রচুর শুষ্ক উত্তমত বায়ু সর্বদা ছুন্নিতে প্রবেশ করানো হতে থাকে। উত্তমত বায়ুর সংস্পর্শে কোক জ্জারিত হয়ে কার্বন মনোঅক্সাইডে পরিণত হয় ও প্রচুর উত্তাপের সৃষ্টি করে। ফলে ছুন্নির ভেতরের পদার্থগুলো অত্যন্ত উত্তমত হয়। এর নিচের দিকে তাপমাত্রা প্রায় 1500°C এবং উপরের দিকে তা কমতে কমতে $300^{\circ}-400^{\circ}\text{C}$ হয়। এসব স্থানে আয়রন অক্সাইডের সঙ্গে কার্বন মনোঅক্সাইডের বিক্রিয়া ঘটে এবং ধাতব লৌহ উৎপন্ন হতে থাকে।



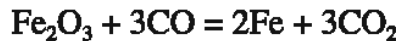
চিত্র ১২.৫ : কাষ্ট আয়রন প্রস্তুতির বাত্যাচুল্লি

বাত্যাচুল্লির বিক্রিয়াসমূহ

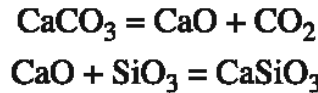
চুল্লির নিম্নাংশে (টুইয়েরের নিকটে) কোক পুড়ে প্রথমে কার্বন ডাইঅক্সাইড হয়। পরে এ কার্বন ডাইঅক্সাইড লোহিত তন্ত কোকের সাথে বিক্রিয়ায় কার্বন মনোঅক্সাইডে পরিণত হতে থাকে।



এ কার্বন মনোঅক্সাইড আয়রন অক্সাইড আকরিককে বিজারিত করে ধাতব লোহাতে পরিণত করে। এ বিজারণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন তাপমাত্রায় বিভিন্নভাবে সংঘটিত হয়।



ব্যবহৃত চুনাপাথর উচ্চ তাপমাত্রায় বিয়োজিত হয়ে চুন (CaO) ও কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। CaO খনিজের সিলিকার (সাধারণ বালি) সাথে যুক্ত হয়ে ক্যালসিয়াম সিলিকেটে পরিণত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ক্যালসিয়াম সিলিকেট গলে যায়। এটি অন্যান্য সিলিকেট ও খনিজের অন্যান্য অপদ্রব্য শোষণ করে ধাতুমল উৎপন্ন করে :



চুল্লির নিম্নাংশে উচ্চ তাপমাত্রায় খনিজের সাথে মিশ্রিত ফসফেট, MnO_2 এবং সিলিকা বিজারিত হয়ে যথাক্রমে ফসফরাস, ম্যাংগানিজ ও সিলিকনে পরিণত হয়। বিজারিত মৌলগুলো (P, Mn, Si) এবং সামান্য পরিমাণে কার্বন গলিত লোহার দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। ধাতুমল ও লোহা উভয়ই চুল্লির নিম্নতম প্রকোষ্ঠে জমা হয়। ধাতুমল ধাতু অপেক্ষা হালকা বলে তা গলিত লোহার উপর ভাসমান অবস্থায় থাকে। দুইটি নির্গম পথের সাহায্যে ধাতুমল ও গলিত লোহাকে পৃথক পৃথকভাবে বের করে নেওয়া হয়। গলিত লোহাকে ঠান্ডা করে পিণ্ড করা হয়। একেই কাষ্ট আয়রন বা ঢালাই লোহা বলে। এতে মোটামুটি 4% কার্বন, 0.4% ম্যাংগানিজ, 1-1.5% সিলিকন ও 0.10% ফসফরাস থাকে। চুল্লি হতে নির্গত ধাতুমল রাস্তা নির্মাণে, সিমেন্ট উৎপাদনে এবং রেলওয়ে রাস্তায় ব্যালাস্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে প্রাপ্ত ঢালাই লোহা হতে ইস্পাত ও পেটা লোহা, তথা বিশুদ্ধ লোহা প্রস্তুত করা যায়।

ইস্পাত প্রস্তুতি : সাধারণত বেসিমার পদ্ধতিতে ঢালাই লোহা হতে সব কার্বন অপসারণ করে পরে কিছু পরিমাণ কার্বন যুক্ত করে ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। এ পদ্ধতিতে একটি অগ্নিসহ মৃত্তিকার আস্তরণ দেয়া স্টিল ট্যাংকে শ্বেত-তপ্ত ঢালাই লোহার ভেতর দিয়ে বাতাস চালনা করা হয়। এতে করে ঢালাই লোহার বিভিন্ন অপদ্রব্য জারিত হয়। কার্বন জারিত হয়ে CO ও CO₂ হিসেবে উড়ে যায়। Mn ও Si তাদের অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়ে ধাতুমল তৈরি করে এবং P, P₂O₅ এ পরিণত হয়ে ক্ষারীয় আস্তরে শোষিত হয়। এরপর প্রয়োজন মতো কার্বন মিশ্রিত করে ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়।

আজকাল বাতাসের পরিবর্তে তরল অক্সিজেন ব্যবহার করেও অপদ্রব্য অপসারণ করা হয়।

১২.৫. ধাতু নিষ্কাশনে অন্যান্য পদ্ধতির ব্যবহার

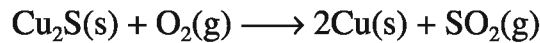
খুব সক্রিয় ধাতু নিষ্কাশনের জন্য তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়; মোটামুটি সক্রিয় অন্যান্য অনেক ধাতুর জন্য কার্বন বিজারণ পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত। তবে অন্যান্য কিছু ধাতুর ক্ষেত্রে আকরিকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ সকল পদ্ধতিকে সাধারণ পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না; কেননা এর এক একটি ধাতুর ক্ষেত্রে এক এক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

কপার নিষ্কাশন : কপার পাইরাইট কপারের একটি প্রধান আকরিক। সাধারণত এ আকরিক হতে বাণিজ্যিকভাবে কপার নিষ্কাশন করা হয়।

প্রথমে যন্ত্রের সাহায্যে আকরিককে ছোট ছোট টুকরা করা হয় এবং ঘনীভূত করা হয়। এ ঘনীভূত আকরিককে বাতাসের উপস্থিতিতে তাপজারণ করে বিভিন্ন অপদ্রব্য, যেমন জলীয় বাষ্প, সালফার ও আর্সেনিক মুক্ত করা হয়। এ সময় কপার পাইরাইট বিয়োজিত হয়ে কপার (I) সালফাইড উৎপন্ন হয়।

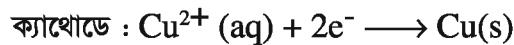
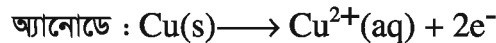


তারপর কিছু পরিমাণ SiO₂ যোগ করে বায়ুর অনুপস্থিতিতে তাপ দিয়ে FeO কে FeSiO₃ ধাতুমলে পরিণত করা হয় এবং অপসারণ করা হয়। উৎপন্ন Cu₂S কে নিয়ন্ত্রিত বায়ু প্রবাহে উত্তপ্ত করলে বিজারিত হয়ে কপার উৎপন্ন হয়।



এভাবে তৈরীকৃত কপারে যথেষ্ট পরিমাণে অপদ্রব্য থাকে। একে ব্লিস্টার কপার বলে। এই কপার তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ করা হয়।

একটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য কোষে কপার সালফেট দ্রবণ নেওয়া হয়। এক টুকরা বিশুদ্ধ কপারকে ক্যাথোড ও তৈরীকৃত ব্লিস্টার কপারকে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করে তড়িৎ চালনা করা হয়। ফলে অ্যানোডে ব্লিস্টার কপার ক্রমশ দ্রবীভূত হয় এবং ক্যাথোডে বিশুদ্ধ কপার জমা হয়। এ পদ্ধতিতে তৈরী কপার 99.98% বিশুদ্ধ।



এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

সক্রিয়তা ক্রম : ধাতুসমূহকে তাদের সক্রিয়তা অনুসারে সাজালে যে ক্রম পাওয়া যায়, তাকে সক্রিয়তা ক্রম বলা হয়। একটি ধাতু এ ক্রমে তার নিচে একটি ধাতুর লবণ হতে সে ধাতুকে অপসারণ করতে পারে, কিন্তু এর উপরের ধাতুকে অপসারণ করতে পারে না। রূপার লবণের দ্রবণ হতে তামা রূপাকে অধঃক্ষিপ্ত করতে পারে।

আকরিক : প্রকৃতিতে সাধারণত ধাতুসমূহ মুক্ত অবস্থায় থাকে না, যৌগ হিসেবে থাকে। প্রকৃতিতে এক একটি ধাতু যৌগ মাটির নিচে বা উপরে বিরাট স্তূপ আকারে থাকে। একে আকরিক বলা হয়। আকরিকে অন্যান্য বহু অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে।

ধাতু নিষ্কাশন : আকরিক হতে মুক্ত ধাতু উৎপন্ন করাকে ধাতু নিষ্কাশন বলা হয়। ধাতু নিষ্কাশন প্রকৃতপক্ষে একটি বিজারণ প্রক্রিয়া।

ধাতু নিষ্কাশনের বিভিন্ন পদ্ধতি : যে সকল ধাতু খুব সক্রিয় অর্থাৎ সক্রিয়তা ক্রমে যে সকল ধাতুর অবস্থান উপরের দিকে, তাদের গলিত লবণকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। মধ্যম সক্রিয় ধাতুসমূহকে কার্বন বিজারণ প্রক্রিয়ায় নিষ্কাশন করা হয়।

তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে ধাতু নিষ্কাশন : পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ধাতুকে গলিত অবস্থায় তাদের ক্লোরাইড লবণের তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুক্ত করা হয়। অ্যানোড হিসেবে গ্রাফাইট এবং ক্যাথোড হিসেবে আয়রন ব্যবহার করা হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় তরল ক্রাইওলাইটে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডকে দ্রবীভূত করে তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ক্যাথোড ও অ্যানোড উভয়ই গ্রাফাইট দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে।

কার্বন বিজারণের মাধ্যমে ধাতু নিষ্কাশন : কার্বন বিজারণ প্রক্রিয়ায় জিংক, লেড ও আয়রন নিষ্কাশন করা হয়। মূল বিক্রিয়ায় এদের অক্সাইড কার্বন অথবা কার্বন মনোক্সাইডের দ্বারা বিজারিত হয়ে মুক্ত ধাতু উৎপন্ন করে।

কপার নিষ্কাশন : কপারের প্রধান আকরিক কপার পাইরাইটে আয়রন ও সালফার থাকায় কপার নিষ্কাশন একটি জটিল পদ্ধতি। কপার পাইরাইট আকরিককে বায়ুর উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করে সালফার ডাইঅক্সাইড ও আয়রন অক্সাইড উৎপন্ন করা হয়। সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস হিসেবে নিষ্কাশিত হয়। আয়রন অক্সাইডের সাথে সিলিকা বিক্রিয়া করে ধাতুমল হিসেবে অপসারণ করা হয়। অতঃপর উচ্চতাপে নিয়ন্ত্রিত বায়ু প্রবাহে কপার সালফাইডের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়ার মাধ্যমে কপার বিমুক্ত করা হয়। উৎপাদিত কপারকে তড়িৎ বিশোধনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ করা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. বক্সাইটের সংকেত কোনটি?

ক. $Al_2O_3 \cdot H_2O$

খ. $Al_2O_3 \cdot 2H_2O$

গ. $Al_2O_3 \cdot 3H_2O$

ঘ. Al_2O_3

২। তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে কোন ধাতুকে নিষ্কাশন করা হয়?

ক. লেড

খ. কপার

গ. জিংক

ঘ. অ্যালুমিনিয়াম

৩. সক্রিয়তার সিরিজে জিংকের নিচের ধাতুকে (Fe, Pb, Ca, Ag) কার্বন দ্বারা বিজারণ করা সম্ভব কারণ—

i. কার্বনের অবস্থান হাইড্রোজেনের নিচে

ii. ধাতুসমূহ অধিক শক্তিশালী বিজারক

iii. ধাতুসমূহ কার্বন অপেক্ষা কম শক্তিশালী বিজারক

নিচের কোনটি সঠিক?

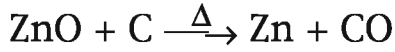
ক. i এবং ii

খ. i এবং iii

গ. ii এবং iii

ঘ. i, ii এবং iii

জিংক অক্সাইড ও কার্বনের মিশ্রণকে উত্তপ্ত করে জিংক নিষ্কাশন করা হয়।



এ বিক্রিয়া অবলম্বনে নিচের ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৪. উপরের বিক্রিয়ায়—

- কার্বনের জারণ ঘটে
- জিংক অক্সাইডের বিজারণ ঘটে
- জিংক অক্সাইডের জারণ ঘটে।

কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. i, ii ও iii |

৫. জিংক নিষ্কাশনকালে কনডেনসারের মুখে কোনটি জ্বলতে থাকে?

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| ক. জিংক | খ. কার্বন |
| গ. কার্বন মনোক্সাইড | ঘ. কার্বন ডাইঅক্সাইড। |

৬.

Mg
Al
Zn
Fe
Pb

উপরের সক্রিয়তা সিরিজের ভিত্তিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় Al দ্বারা কোন মৌলকে প্রতিস্থাপিত করা যাবে না?

- | | |
|-------|-------|
| ক. Mg | খ. Zn |
| গ. Fe | ঘ. Pb |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

আমাদের দৈনন্দিন গৃহস্থালি কাজকর্মে দা. খোস্তা, কুঠার, থালা, বাটি, রড, খিল ইত্যাদি ব্যবহার করি। এগুলো কোনো না কোনো ধাতু দ্বারা তৈরী। আকরিক থেকে এসব ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। লোহার আকরিক থেকে একে নিষ্কাশনের সময় বাত্যাচুল্লিতে গরম বাতাস প্রবেশ করানো হয়। এগুলো অনেক দিন ব্যবহার করার ফলে আস্তে আস্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাই এসব জিনিসের মূল উপাদানের সাথে একাধিক মৌলিক পদার্থ (ধাতু) মিশিয়ে ধাতু সংকর তৈরি করা হয় অথবা এর উপর অন্য ধাতুর প্রলোপ দেওয়া হয়।

- আকরিক কী?
- ধাতু সংকর তৈরি করা হয় কেন?
- প্রদত্ত গৃহস্থালি জিনিসপত্রকে ক্ষয় হওয়া থেকে কীভাবে রক্ষা করা যায়?
- লোহের আকরিক থেকে লৌহ নিষ্কাশনের সময় বাত্যাচুল্লিতে গরম বাতাস প্রবাহের কারণ বিশ্লেষণ কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধাতু ও ধাতব যৌগের ধর্ম ও ব্যবহার

বিষয়বস্তু : ধাতুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাসায়নিক ধর্ম ও অধাতুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রাসায়নিক ধর্মের তুলনা; কয়েকটি ধাতুর সাথে বায়ু, পানি ও এসিডের বিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে এদের তুলনামূলক সক্রিয়তা; কিছু ধাতুর পরিবর্তনশীল যোজ্যতা ও ভিন্ন রং প্রদর্শন; কিছু ধাতব আয়নের পরীক্ষা।

১৩.১ মৌলের শ্রেণিবিন্যাস

তোমরা পূর্বেই জেনেছ যে মৌলসমূহকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা : (অ) ধাতু (আ) অধাতু।

এ দুই শ্রেণীর মৌলের মধ্যে ভৌত ধর্ম ও রাসায়নিক ধর্মের ভিত্তিতে পার্থক্য নিম্নে দেখানো হল :

ভৌত ধর্মসমূহ

ধাতু	অধাতু
১। ধাতুসমূহ বিদ্যুৎ ও তাপ সুপরিবাহী।	১। অধাতুসমূহ প্রধানত বিদ্যুৎ ও তাপ অপরিবাহী।
২। ধাতুসমূহের বিশেষ দ্যুতি আছে। এরা আলোক বিচ্ছুরণ করতে পারে।	২। অধাতুসমূহের দ্যুতি নেই। এরা আলোক বিচ্ছুরণে অক্ষম।
৩। ধাতুসমূহ ঘাতসহ, প্রসারণশীল ও নমনীয়। এদেরকে সরু তার ও পাত্রে পরিণত করা যায়।	৩। অধাতুসমূহ ঘাতসহ ও নমনীয় নয়, এদেরকে পাতলা পাত ও সরু তারে পরিণত করা যায় না।
৪। আঘাতে ধাতুসমূহ হতে টুন টুন শব্দ হয়।	৪। অধাতুকে আঘাত করলে এ ধরনের শব্দ হয় না।

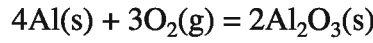
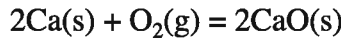
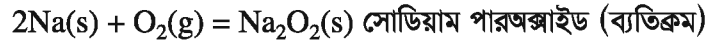
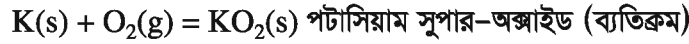
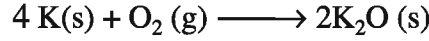
রাসায়নিক ধর্মসমূহ

১। ধাতুর অক্সাইডসমূহ ক্ষারকীয় এবং পানিতে দ্রবণীয় হলে ক্ষার উৎপন্ন করে। যেমন : $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{NaOH}$	১। অধাতুর অক্সাইডসমূহ প্রধানত অম্লীয়। যেমন : $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$
২। ধাতুসমূহ এসিডের হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে লবণ উৎপন্ন করে। যেমন : $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2$	২। অধাতুসমূহ এভাবে লবণ উৎপন্ন করতে পারে না।
৩। ধাতুর যৌগসমূহ সাধারণত আয়নিক ও তড়িৎ বিশ্লেষ্য।	৩। অধাতুর যৌগসমূহ প্রধানত সমযোজী, উদ্বায়ী ও তড়িৎ অবিশ্লেষ্য।
৪। কমসংখ্যক ধাতু যেমন Na, K, Ca ইত্যাদি স্থায়ী হাইড্রাইড গঠন করে। এরা আয়নিক। যেমন- $2\text{Na} + \text{H}_2 = 2\text{NaH}$	৪। অধাতুসমূহ স্থায়ী হাইড্রাইড গঠন করে। এরা সাধারণত সমযোজী। যেমন- $\text{C} + 2\text{H}_2 \longrightarrow \text{CH}_4$

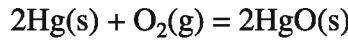
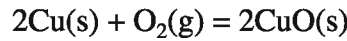
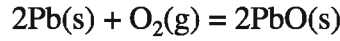
১৩.২ কয়েকটি ধাতুর সাথে বায়ু, পানি, হ্যালোজেন ও এসিডের বিক্রিয়া

বিভিন্ন বস্তুর সাথে ধাতুসমূহের বিক্রিয়া সক্রিয়তা ক্রমে এ সকল ধাতুর অবস্থানের উপর নির্ভর করে। বায়ু, পানি ও এসিডের সাথে বিভিন্ন ধাতুর বিক্রিয়া হতে তা স্পষ্ট হবে।

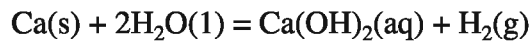
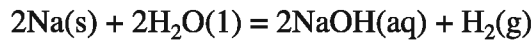
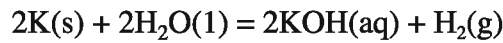
(ক) বায়ুর সাথে বিক্রিয়া : সক্রিয়তা ক্রমে যে ধাতুর অবস্থান যত উপরে তা তত সহজে বায়ুর সাথে বিক্রিয়া করে। পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম খুবই সহজে এবং অ্যালুমিনিয়াম, জিংক ও আয়রন উচ্চ তাপমাত্রায় বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে জ্বলে ওঠে। এ সময় সাধারণত স্বাভাবিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়। তবে পটাসিয়ামের ক্ষেত্রে সুপার-অক্সাইড এবং সোডিয়ামের ক্ষেত্রে পারঅক্সাইডও উৎপন্ন হয়।



অপরদিকে লেড, কপার ও মার্কারি উদ্ভূত অবস্থায় ধীরে ধীরে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে, কিন্তু জ্বলে ওঠে না।

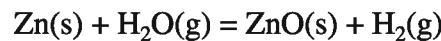
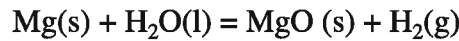


(খ) পানির সাথে বিক্রিয়া : কক্ষ তাপমাত্রায় পটাসিয়াম, সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম পানির সাথে তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে সে ধাতুর হাইড্রোক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। পটাসিয়াম এত তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে যে তাতে আগুন ধরে যায়, সোডিয়ামের ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে আগুন ধরে।



অপরদিকে ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, জিংক ও আয়রন উচ্চ তাপমাত্রায় জলীয় বাষ্পের সাথে এ ধরনের বিক্রিয়া করে। ম্যাগনেসিয়ামের জন্য 100°C তাপমাত্রা যথেষ্ট।

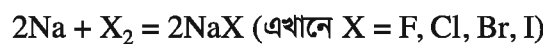
কিন্তু আয়রনের জন্য অনেক উচ্চতর তাপমাত্রা প্রয়োজন। যখন উত্তাপে লাল হয়ে ওঠে, তখন আয়রন জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে।

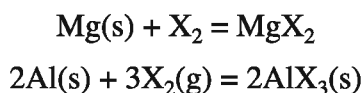


সক্রিয়তা ক্রমে নিচের ধাতুসমূহ যেমন লেড, কপার ও মার্কারি উদ্ভূত অবস্থাতেও জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে না।

(গ) হ্যালোজেনের সাথে বিক্রিয়া

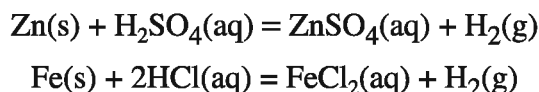
উদ্ভূত অবস্থায় ধাতুসমূহ হ্যালোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ধাতব হ্যালাইড উৎপন্ন করে। যেমন :





এখানে উল্লেখ্য যে আয়রনের ক্ষেত্রে সরাসরি আয়রন(III) হ্যালাইড উৎপন্ন হয়।

(ঘ) এসিডের সাথে বিক্রিয়া : পটাসিয়াম হতে আয়রন পর্যন্ত ধাতুসমূহ লঘু এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। সক্রিয়তা ক্রমে যত উপরে যাওয়া যায়, বিক্রিয়ায় তীব্রতা তত বৃদ্ধি পায়। পটাসিয়াম, সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম খুব দ্রুত বিক্রিয়া করে, অন্যান্য ধাতু করে ধীর গতিতে।



অবশ্য অ্যালুমিনিয়াম শুধুমাত্র হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্বারা আক্রান্ত হয়। লেড, কপার ও মারকারি সাধারণত এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে না, তবে নাইট্রিক এসিড দ্বারা আক্রান্ত হয়। কপারের সাথে শীতল ও মধ্যম গাঢ় নাইট্রিক এসিডের বিক্রিয়া :



এ সকল বিক্রিয়াকে নিম্ন সারণির সাহায্যে দেখানো যায় :

ধাতু	বায়ুর সাথে বিক্রিয়া	পানির সাথে বিক্রিয়া	এসিডের সাথে বিক্রিয়া
K Na Ca	সহজেই বাতাসে জ্বলে ও অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে।	ঠান্ডা পানির সাথে বিক্রিয়া করে।	এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে।
Mg Al Zn Fe	উচ্চতর তাপমাত্রায় বাতাসে জ্বলে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে।	উচ্চ তাপমাত্রায় পানির সাথে বিক্রিয়া করে।	লঘু এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে।
Pb Cu Hg	বাতাসে উত্তপ্ত করলে জারিত হয়, কিন্তু জ্বলে না।	উচ্চ তাপমাত্রায়ও পানির সাথে বিক্রিয়া করে না।	সাধারণত লঘু এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে না। তবে নাইট্রিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে।

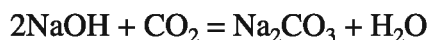
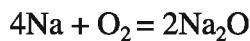
১৩.৩ বিভিন্ন ধাতুর ধর্ম ও ব্যবহার

১৩.৩.১ সোডিয়াম

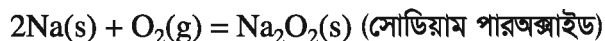
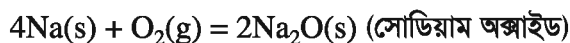
ভৌত ধর্ম : সোডিয়াম রূপার মতো উজ্জ্বল ধাতু। এটি বেশ নরম এবং ছুরির সাহায্যে কাটা যায়। এটি পানি অপেক্ষা হালকা।

রাসায়নিক ধর্ম : সোডিয়াম খুব ক্রিয়াশীল। এটি সহজে একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে Na^+ আয়নে রূপান্তরিত হয়। এ কারণে এটি খুব শক্তিশালী বিজারক ও একযোজী এবং সর্বদা আয়নিক যৌগ গঠন করে।

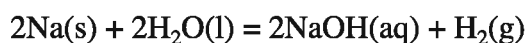
(১) বাতাসের সাথে বিক্রিয়া : শূন্য বাতাস সোডিয়ামের সাথে কক্ষ তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করে না। তবে আর্দ্র বাতাসের সংস্পর্শে সোডিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয়, যা বাতাসের জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন করে। এটি আবার বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে ধীরে ধীরে সোডিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয়। এ কারণে সোডিয়াম ধাতুকে পেট্রল বা কেরোসিনের নিচে রাখা হয়, যেন তা বাতাসের সংস্পর্শে না আসে।



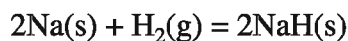
বাতাসে বা অক্সিজেনে উত্তপ্ত অবস্থায় সোডিয়াম সোনালি হলুদ বর্ণের শিখাসহ জ্বলে; এ সময় সোডিয়াম অক্সাইড ও পারঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।



(২) পানির সাথে বিক্রিয়া : সোডিয়াম ধাতু পানির সাথে তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।

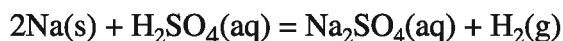
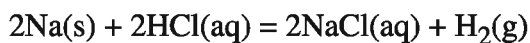


(৩) হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া : হাইড্রোজেন গ্যাসে সোডিয়াম ধাতুকে উত্তপ্ত করলে সোডিয়াম হাইড্রাইড উৎপন্ন করে।



এ যৌগে হাইড্রোজেনের ঋণাত্মক আয়ন বা হাইড্রাইড আয়ন H^- বিদ্যমান। তড়িৎ রাসায়নিক ক্রমে সোডিয়াম হাইড্রোজেনের অনেক উপরে হওয়ায় তা হাইড্রোজেনকে ইলেকট্রন গ্রহণে বাধ্য করতে পারে।

(৪) এসিডের সাথে বিক্রিয়া : সোডিয়াম জারণ ধর্মহীন লঘু এসিডসমূহের সাথে তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।

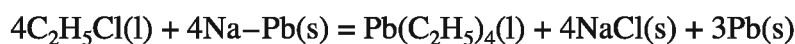


(৫) হ্যালোজেনসমূহের সাথে বিক্রিয়া : হ্যালোজেনসমূহের বাষ্পে সোডিয়ামকে উত্তপ্ত করলে তা জ্বলে ওঠে এবং সোডিয়াম হ্যালাইডসমূহ উৎপন্ন করে। সাধারণ তাপমাত্রায়ও একই বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, তবে তা ধীরে ধীরে ঘটে।

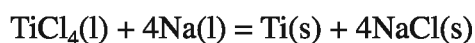


শিখা পরীক্ষা : সকল সোডিয়াম লবণ অনুজ্জ্বল বুনসেন শিখায় উত্তপ্ত করলে উজ্জ্বল সোনালি-হলুদ বর্ণের শিখা তৈরি করে। নীল কোবাল্ট কাচের ভেতর দিয়ে তাকালে এ শিখা দেখা যায় না। অজানা নমুনায় সোডিয়ামের উপস্থিতি প্রমাণের জন্য এ পরীক্ষা করা হয়।

ব্যবহার : (১) পেট্রলের এন্টিক (anti-knock) টেট্রা-ইথাইল লেড প্রস্তুতিতে লেডের সাথে সংকর হিসেবে সোডিয়াম ব্যবহার করা হয়।



(২) কিছু দুষ্প্রাপ্য ধাতু যেমন টাইটেনিয়াম, জিরকোনিয়াম, টাংস্টেন প্রভৃতি নিষ্কাশনে অতি শক্তিশালী বিজারকরূপে সোডিয়াম ধাতু ব্যবহৃত হয়।



(৩) সোডিয়াম পারঅক্সাইড, সোডামাইড, সোডিয়াম সায়ানাইড প্রভৃতি বিশেষ ক্রিয়াশীল কিছু যৌগ তৈরিতে সোডিয়াম ধাতু ব্যবহৃত হয়।

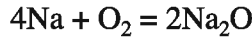
(৪) জৈব যৌগে হ্যালোজেনসমূহ, সালফার ও নাইট্রোজেনকে শনাক্ত করতে সোডিয়াম ব্যবহৃত হয়।

(৫) রাস্তায় হলুদ রঙের বাতিতে সোডিয়াম বাষ্প আছে।

সোডিয়ামের কয়েকটি যৌগ

(১) সোডিয়াম মনোঅক্সাইড; Na_2O

সোডিয়ামকে সীমিত বায়ু বা অক্সিজেনের সাথে উত্তপ্ত করে অতিরিক্ত সোডিয়ামকে নিম্নচাপে পাতনের সাহায্যে অপসারণ করলে সোডিয়াম মনোঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।



সোডিয়াম মনোঅক্সাইড একটি সাদা দানাদার পানিগ্রাসী কঠিন পদার্থ।

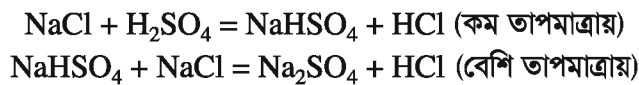
(২) সোডিয়াম ক্লোরাইড, NaCl

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ যেমন বাংলাদেশের সমুদ্রের পানিকে সূর্যতাপে উন্মুক্ত বাতাসে বাষ্পীভূত করে প্রচুর খাদ্য-লবণ, তথা NaCl উৎপাদন করা হয়। শীতপ্রধান দেশে সমুদ্রের পানিকে হিমায়ন করে বরফে পরিণত করা হয়। এ বরফকে পৃথক করে লবণের গাঢ় দ্রবণ পাওয়া যায়। এ দ্রবণকে তাপ দিয়ে আরো ঘন করা হয় যা শীতল করলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের কেলাস পাওয়া যায়।

সাধারণ খাদ্য-লবণ অবিশুদ্ধ। এতে সামান্য পরিমাণে MgCl_2 , CaCl_2 লবণ অপদ্রব্য হিসেবে মিশ্রিত থাকে।

বিশুদ্ধ NaCl স্বচ্ছ, বর্ণহীন কঠিন পদার্থ। পানিতে অতি দ্রবণীয়। বিশুদ্ধ NaCl পানিগ্রাসী নয়, তবে খাদ্য লবণে উপস্থিত পানিগ্রাসী পদার্থ যেমন CaCl_2 , MgCl_2 ইত্যাদি থাকে বলে বর্ষাকালে আমাদের দেশে লবণকে পানিগ্রাসী বলে মনে হয়।

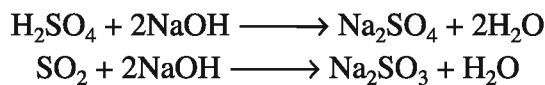
NaCl গাঢ় H_2SO_4 -এর সাথে বিক্রিয়া করে কম তাপমাত্রায় সোডিয়াম বাইসালফেট এবং অধিক তাপমাত্রায় সোডিয়াম সালফেট উৎপন্ন করে।



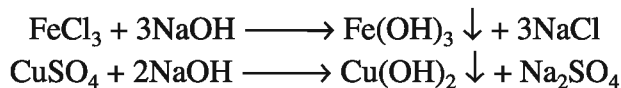
ব্যবহার : সোডিয়াম ক্লোরাইড (১) প্রধানত খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু করতে (২) বিভিন্ন অজৈব যৌগ প্রস্তুতিতে ও (৩) সাবান শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

(৩) সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কস্টিক সোডা এটি (NaOH) : সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অতি প্রয়োজনীয় ক্ষার ধাতু যৌগ। এটি অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়। এটি কস্টিক সোডা নামে পরিচিত। সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে কস্টিক সোডা প্রস্তুত করা হয়। (পৃষ্ঠা ১১৯ দেখ)

ধর্ম : (ক) সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটি তীব্র ক্ষার। সকল এসিড ও এসিডধর্মী অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।



(খ) এটি পানিতে দ্রবণীয় ধাতব লবণের সাথে বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় ধাতব হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন করে :

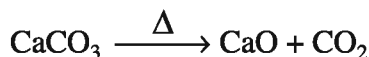


ব্যবহার : সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (১) একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল হিসেবে, (২) সাবান প্রস্তুতিতে (৩) কাগজ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

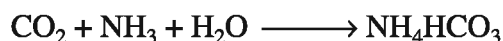
(৪) সোডিয়াম কার্বনেট, Na_2CO_3

কস্টিক সোডার ন্যায় এটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যৌগ। এটি অ্যামোনিয়া-সোডা বা সলভে প্রণালিতে প্রস্তুত করা হয়। এর প্রস্তুতিতে কাঁচামাল হিসেবে চুনা পাথর, অ্যামোনিয়া গ্যাস ও সাধারণ লবণ ব্যবহার করা হয়। প্রস্তুত প্রণালির বিভিন্ন ধাপগুলো নিম্নরূপ :

(১) চুনা পাথরকে উত্তপ্ত করে চুন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পাওয়া যায়



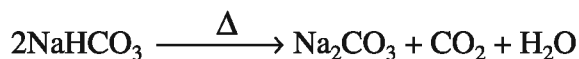
(২) কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসকে অ্যামোনিয়া গ্যাস ও পানির সাথে মিশ্রিত করা হয়। ফলে অ্যামোনিয়াম বাইকার্বনেট উৎপন্ন হয় :



(৩) উৎপন্ন অ্যামোনিয়াম বাইকার্বনেটের জলীয় দ্রবণ এবং সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণকে মিশ্রিত করলে NaHCO_3 ও NH_4Cl পাওয়া যায়। NaHCO_3 কম দ্রবণীয় বলে এটি কেলাসরূপে পৃথক হয় :



(৪) সোডিয়াম বাইকার্বনেটের কেলাসকে পৃথক করে উত্তপ্ত করলে সোডিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয় :



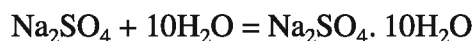
ব্যবহার :

(১) আর্দ্র সোডিয়াম কার্বনেট কাপড় কাচার সোডা হিসেবে,

(২) অনার্দ্র সোডিয়াম কার্বনেট কাচ শিল্পে, কাগজ শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

(৫) আর্দ্র সোডিয়াম সালফেট, $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

সোডিয়াম কার্বনেটের সাথে লঘু H_2SO_4 যোগ করলে সোডিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। সোডিয়াম সালফেটের জলীয় দ্রবণকে বাষ্পীভবনের সাহায্যে ঘনীভূত করলে এবং পরে শীতল করলে গুবার লবণের কেলাস অর্থাৎ $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ এর কেলাস পাওয়া যায় :



ধর্ম : সোডিয়াম সালফেটের দ্রবণে বেরিয়াম ক্লোরাইড বা বেরিয়াম নাইট্রেট দ্রবণ যোগ করলে সাদা বর্ণের বেরিয়াম সালফেট অধঃক্ষিপ্ত হয়।



ব্যবহার : আর্দ্র সোডিয়াম সালফেট

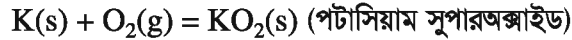
(১) জানালার কাচ প্রস্তুতিতে

(২) Na_2S ও Na_2CO_3 উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

১৩.৩.২ পটাসিয়াম

ভৌত ধর্ম : সোডিয়ামের অনুরূপ।

রাসায়নিক ধর্ম : সোডিয়ামের প্রায় অনুরূপ; শুধুমাত্র বিভিন্ন সমীকরণে Na-এর স্থানে K বসানো যেতে পারে। এটি সোডিয়াম অপেক্ষাও অধিক ক্রিয়াশীল। সোডিয়ামের সাথে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে এটি উত্তপ্ত অবস্থায় বাতাস বা অক্সিজেনে জ্বলার সময় পটাসিয়াম সুপার অক্সাইড উৎপন্ন করে।



শিখা পরীক্ষা : পটাসিয়ামের সকল যৌগ অনুজ্জ্বল বুনসেন দীপে প্রবেশ করালে বেগুনি শিখার সৃষ্টি হয়। কোবাল্ট কাচের মধ্য দিয়ে এ শিখাকে লাল বর্ণের দেখা যায়। এটি কোনো অজানা নমুনায় পটাসিয়ামের উপস্থিতি পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার : (১) পটাসিয়াম সুপারঅক্সাইড তৈরিতে ধাতব পটাসিয়াম ব্যবহৃত হয়।

(২) সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের তরল সংকর উচ্চ তাপমাত্রার থার্মোমিটারে ব্যবহৃত হয়।

(৩) আলোক-তড়িৎ সেল তৈরিতেও পটাসিয়াম ব্যবহৃত হয়।

গ্রুপ I ধাতুসমূহের যৌগসমূহ

এখানে বিভিন্ন যৌগ সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে না, সাধারণভাবে আলোচনা করা হবে, যেন ছাত্ররা বিভিন্ন যৌগ সম্পর্কে মুখস্থ না করেই তাদের সম্পর্কে ধারণা করতে পারে।

যেহেতু গ্রুপ I ধাতুসমূহের ধর্ম প্রায় সম্পূর্ণরূপে একই ধরনের, সেহেতু সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি ধাতুকে পৃথক-ভাবে উল্লেখ না করে এ গ্রুপের সকল ধাতুকে একত্রে আলোচনা করা হবে। সেহেতু এদের সাধারণ প্রতীক ধরা যাক M।

গ্রুপ I ধাতুসমূহ একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে M^+ আয়ন সৃষ্টির মাধ্যমে যৌগ গঠন করে। সুতরাং এরা সবসময় একযোজী। অতএব এদের ক্লোরাইডের সংকেত MCl (যেমন NaCl, KCl প্রভৃতি), সাধারণ অক্সাইডের সংকেত M_2O , হাইড্রোক্সাইডের সংকেত MOH, কার্বনেটের সংকেত M_2CO_3 , নাইট্রেটের সংকেত MNO_3 , সালফেটের M_2SO_4 ।

এ সকল যৌগ আয়নিক। সুতরাং কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই পানিতে দ্রবণীয়। এরা উচ্চ গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট। কঠিন অবস্থায় এ সকল যৌগ তড়িৎ পরিবহণ করে না, কিন্তু দ্রবণে ও গলিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। এ সময় তড়িৎ বিশ্লেষণ সংঘটিত হয়। জলীয় দ্রবণে এ সকল যৌগের তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে এ সকল ধাতুর হাইড্রোক্সাইড ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় এবং গলিত অবস্থায় তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে বিমুক্ত ধাতুর সৃষ্টি হয়।

এ সকল ধাতুর হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ পিচ্ছিল ধরনের মনে হয়। এদের হাইড্রোক্সাইড ও কার্বনেট উভ্যাপে বিয়োজিত হয় না।

উদাহরণ : পটাসিয়াম ক্লোরাইড সম্পর্কে কিছু ধারণা কর।

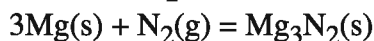
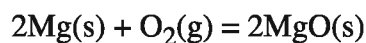
সমাধান : পটাসিয়াম গ্রুপ I এর একটি ধাতু; সুতরাং এর যোজনী এক এবং যৌগসমূহ আয়নিক। পটাসিয়াম ক্লোর-ইডের সংকেত KCl এবং এটি আয়নিক। অতএব এটি পানিতে দ্রবণীয়। এটি উচ্চ গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট। কঠিন অবস্থায় এটি বিদ্যুৎ পরিবাহী নয়, তবে তরল ও দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবাহী। বিদ্যুৎ পরিবহণের সময় তড়িৎ বিশ্লেষণ হয়। KCl-এর জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হবে এবং পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি হবে। গলিত KCl-এর তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে পটাসিয়াম ধাতু পাওয়া যাবে। এছাড়া আরো বলা যায় যে উভয় ক্ষেত্রে অ্যানোডে ক্লোরিন গ্যাস পাওয়া যাবে।

১৩.৩.৩ ম্যাগনেসিয়াম

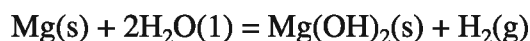
ভৌতধর্ম : ম্যাগনেসিয়াম উজ্জ্বল রূপালি বর্ণের ধাতু। এর গলনাঙ্ক 650°C এবং স্ফুটনাঙ্ক 1090°C ।

রাসায়নিক ধর্ম : ম্যাগনেসিয়াম খুব ইলেকট্রোপজিটিভ, ফলে তা অত্যন্ত সক্রিয় ও শক্তিশালী বিজারক। পর্যায় সারণিতে গ্রুপ II এর সদস্য হওয়ায় এর রাসায়নিক ধর্ম ক্যালসিয়ামের ন্যায়। উদাহরণস্বরূপ শেষ কক্ষপথে এর দুটো ইলেকট্রন থাকায় এর যোজনী 2। তবে এর সক্রিয়তা ক্যালসিয়াম অপেক্ষা কম।

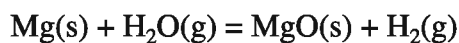
(১) বাতাসের সাথে বিক্রিয়া : সাধারণ তাপমাত্রায় বাতাসে এ ধাতুর বিশেষ পরিবর্তন হয় না, কেননা, এর উপর ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের একটি সূক্ষ্ম আস্তরণ সৃষ্টি হয়, যা ম্যাগনেসিয়াম ধাতুকে বাতাস থেকে রক্ষা করে। উত্তপ্ত করলে ম্যাগনেসিয়াম খুব উজ্জ্বল চোখ বলসানো আলোসহ জ্বলে এবং ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। এ সময় কিছু ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইডও সৃষ্টি হয়।



(২) পানির সাথে বিক্রিয়া : ম্যাগনেসিয়াম খুব ধীরে শীতল পানির সাথে বিক্রিয়া করে (ক্যালসিয়ামের সাথে তুলনা কর)। ফুটন্ত পানির সাথে এটি বিক্রিয়া করে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।

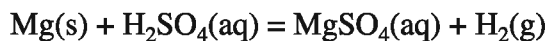
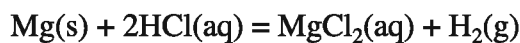


উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের সাথে ম্যাগনেসিয়ামের বিক্রিয়ায় ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়।

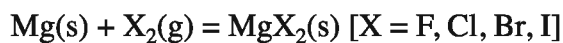


(৩) হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া : ম্যাগনেসিয়াম উত্তপ্ত অবস্থাতেও হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে না (সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের সাথে তুলনা করে)।

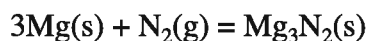
(৪) এসিডের সাথে বিক্রিয়া : জারণ ধর্মহীন লঘু এসিডসমূহের সাথে ম্যাগনেসিয়াম বিক্রিয়া করে লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।



(৫) হ্যালোজেনসমূহের সাথে বিক্রিয়া : উত্তপ্ত অবস্থায় ম্যাগনেসিয়াম ধাতু হ্যালোজেনসমূহের সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেসিয়াম হ্যালাইড উৎপন্ন করে।



(৬) অন্যান্য অধাতুর সাথে বিক্রিয়া : ম্যাগনেসিয়াম উত্তপ্ত অবস্থায় বিভিন্ন অধাতুর সাথে সরাসরি সংযুক্ত হয়।



নাইট্রোজেনের সাথে এ বিক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এ দ্বারা কোনো আবদ্ধ স্থান থেকে নাইট্রোজেন গ্যাস দূর করা যায়।

শিখা পরীক্ষা : ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর লবণসমূহ শিখা পরীক্ষায় কোনো বর্ণ উৎপন্ন করে না। সুতরাং শিখা পরীক্ষা দ্বারা ম্যাগনেসিয়াম লবণ শনাক্ত করা যায় না।

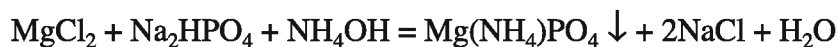
ব্যবহার : (১) ম্যাগনেসিয়ামের বিশেষ সুবিধা এই যে, এটি খুব সক্রিয় নয় এবং দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের উপযোগী ধাতুসমূহের মধ্যে এটি খুব হালকা। এ কারণে বিমান, মোটরগাড়ি, বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতির যন্ত্রাংশ তৈরিতে এর কিছু ধাতু-সংকর ব্যবহৃত হয়।

(২) উজ্জ্বল চোখ ঝলসানো আলোসহ জ্বলে বলে আতশবাজি এবং ফটোগ্রাফির ফ্লাশ পাউডার তৈরিতে এটি ব্যবহার করা হয়।

(৩) একই কারণে সাংকেতিক আলোক ও কোনো কোনো অগ্নি-উৎপাদক বোমা তৈরিতে ম্যাগনেসিয়াম ব্যবহৃত হয়।

(৪) ম্যাগনেসিয়াম বাতাসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন উভয়ের সাথে বিক্রিয়া করে বলে রেডিও ভাল্ভ হতে অবশিষ্ট বায়ু দূরীকরণে এ ধাতু ব্যবহৃত হয়।

ম্যাগনেসিয়াম আয়নের পরীক্ষা : ম্যাগনেসিয়াম লবণের দ্রবণে NH_4Cl ও NH_4OH যোগ করে ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট দ্রবণ যোগ করলে ম্যাগনেসিয়াম অ্যামোনিয়াম ফসফেটের অধঃক্ষেপ পড়ে।



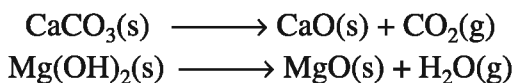
গ্রুপ II ধাতুসমূহের যৌগসমূহ

এখানেও বিভিন্ন যৌগ সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা না করে সাধারণ আলোচনা করা হবে। গ্রুপ II ধাতুসমূহের সাধারণ প্রতীক ধরা যাক M।

গ্রুপ II ধাতুসমূহ দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে M^{2+} আয়ন সৃষ্টির মাধ্যমে যৌগ গঠন করে। অতএব এরা সবসময় দ্বিযোজী এবং সৃষ্ট যৌগসমূহ আয়নিক। ধাতুসমূহ দ্বিযোজী হওয়ায় ক্লোরাইডের সংকেত MCl_2 , সাধারণ অক্সাইডের সংকেত MO , হাইড্রোক্সাইডের সংকেত $\text{M}(\text{OH})_2$, কার্বনেটের সংকেত MCO_3 , নাইট্রেটের সংকেত $\text{M}(\text{NO}_3)_2$, সালফেটের সংকেত MSO_4 ।

এ সকল যৌগ আয়নিক হওয়ায় উচ্চ গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট। কঠিন অবস্থায় এরা তড়িৎ পরিবহণ করে না। কিন্তু দ্রবণে ও গলিত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। এ সময় তড়িৎ বিশ্লেষণ সংঘটিত হয়। গলিত লবণসমূহের তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে ধাতু বিমুক্ত হয়। জলীয় দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় এবং ধাতুর হাইড্রোক্সাইড সৃষ্টি হয়।

ক্যাটায়নে দুইটি ধনাত্মক আধান থাকায় গ্রুপ I ধাতুসমূহের যৌগ অপেক্ষা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। যেমন আয়নিক যৌগ হওয়ায় প্রায় সকল যৌগ পানিতে দ্রবণীয়। কিন্তু গ্রুপ II ধাতুসমূহের কার্বনেটসমূহ অদ্রবণীয়। এছাড়া ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ও হাইড্রোক্সাইড অদ্রবণীয়। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও কার্বনেট উভাপে বিয়োজিত হয়ে অক্সাইডে পরিণত হয়।

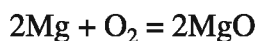


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে একমাত্র গ্রুপ I ধাতুসমূহ ব্যতীত সকল ধাতুর কার্বনেট ও হাইড্রোক্সাইড অনুরূপভাবে বিয়োজিত হয়।

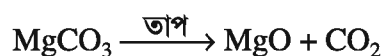
ম্যাগনেসিয়ামের যৌগসমূহ

(১) ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, MgO

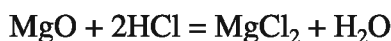
এটি ম্যাগনেসিয়া নামে পরিচিত। বাতাসে কিংবা অক্সিজেনে ধাতব ম্যাগনেসিয়াম পোড়ালে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয় :



ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট বা নাইট্রেটকে উভাপে বিয়োজিত করেও ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায় :



এটি একটি সাদা দানাদার পদার্থ। পানিতে সামান্য দ্রবণীয়। এটা একটি ক্ষারকীয় অক্সাইড, তাই এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।



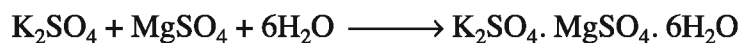
ব্যবহার : এটি তড়িৎ-চুল্লির অভ্যন্তরে আবরক হিসেবে এবং ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(২) ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

এই সোদক ম্যাগনেসিয়াম সালফেটকে ‘ইপসম লবণ’ বলা হয়। ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের সাথে লঘু H_2SO_4 যোগ করলে এ লবণ উৎপন্ন হয় :



এটি ঠান্ডা পানিতে কম দ্রবণীয় কিন্তু ফুটন্ত পানিতে অধিক দ্রবণীয়। ক্ষারধাতুর সালফেটের সাথে এটি দ্বিলবণ উৎপন্ন করে।

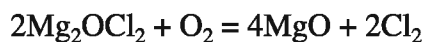


ব্যবহার : এটি (১) সাবান ও রং প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়

(২) এটি ওষুধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

(৩) ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড সমুদ্রের পানিতে ও কার্নালাইট খনিজে পাওয়া যায়। কার্নালাইটকে (KCl , MgCl_2 , $6\text{H}_2\text{O}$) উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে শীতল করলে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড গলিত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং KCl স্ফটিকাকারে নিচে জমা হয়। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড পানিতে অতি দ্রবণীয়। তাই জলীয় দ্রবণ থেকে কেলাসন প্রক্রিয়ায় সোদক ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড পাওয়া যায়। সোদক ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করলে এর কেলাস পানি আংশিক দূরীভূত হয়, তবে সম্পূর্ণরূপে অনার্দ্র হয় না। উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে সোদক ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড আরও বিশ্লেষিত হয়ে ম্যাগনেসিয়াম অক্সিক্লোরাইডে পরিণত হয় এবং পরে বাতাসের সাথে বিক্রিয়া করে অক্সাইডে পরিণত হয়।

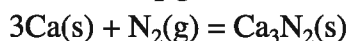
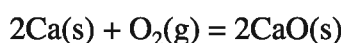


১৩.৩.৪ ক্যালসিয়াম

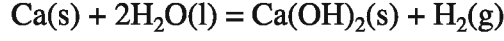
ভৌত ধর্ম : ক্যালসিয়াম রূপালি বর্ণের উজ্জ্বল ধাতু। এটি মোটামুটি নরম।

রাসায়নিক ধর্ম : অনেকটা সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের অনুরূপ, তবে এর যোজনী স্তরে দুইটি ইলেকট্রন থাকায়, ক্যালসিয়ামের যোজনী ২। এ ধাতু সোডিয়াম অপেক্ষা কম ক্রিয়াশীল।

(১) বাতাসের সাথে বিক্রিয়া : কক্ষ তাপমাত্রায় বাতাসে রেখে দিলে ধীরে ধীরে এর পৃষ্ঠদেশে অক্সাইডের আস্তরণ পড়ে। উত্তপ্ত করলে জ্বলে ওঠে এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও স্বল্প পরিমাণ ক্যালসিয়াম নাইট্রাইড উৎপন্ন করে।

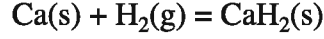


(২) পানির সাথে বিক্রিয়া : কক্ষ তাপমাত্রায় ক্যালসিয়াম পানির সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।

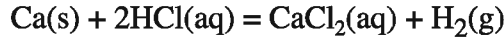


এ বিক্রিয়া সোডিয়াম বা পটাসিয়ামের তুলনায় অনেক কম তীব্রভাবে সংঘটিত হয়।

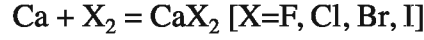
(৩) হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া : উত্তম অবস্থায় ক্যালসিয়াম ধাতু হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে হাইড্রাইড লবণ উৎপন্ন করে, যাতে ঋণাত্মক H^- আয়ন বিদ্যমান।



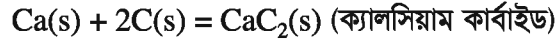
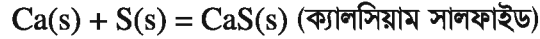
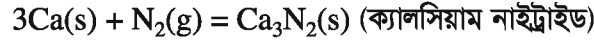
(৪) এসিডের সাথে বিক্রিয়া : ক্যালসিয়াম জারণ ধর্মহীন লঘু এসিডের সাথে দ্রুত বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।



(৫) হ্যালোজেনসমূহের সাথে বিক্রিয়া : ক্যালসিয়াম ধাতু বিভিন্ন হ্যালোজেনের সাথে সরাসরি সংযুক্ত হয়ে ক্যালসিয়াম হ্যালাইডসমূহ উৎপন্ন করে।



(৬) অন্যান্য অধাতুর সাথে বিক্রিয়া : উত্তম অবস্থায় ক্যালসিয়াম বিভিন্ন অধাতুর সাথে যুক্ত হয়।

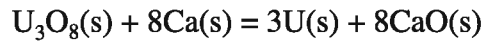


শিখা পরীক্ষা : গাঢ় HCl সিক্ত অবস্থায় সকল ক্যালসিয়াম লবণ অনুজ্জ্বল বুনসেন বার্নারে প্রবেশ করালে ইটের মতো লাল বর্ণের ক্ষণস্থায়ী শিখা দেখা যায়।

ব্যবহার : (১) যে সকল জৈব দ্রাবক সোডিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করে, তাদেরকে পুরোপুরি শুষ্ক করতে নিরুদক হিসেবে ক্যালসিয়াম ধাতু ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের দ্রাবক, যেমন অ্যালকোহল হতে পূর্বেই অন্য কোনো উপায়ে অধিকাংশ পানি দূর করা হয়।

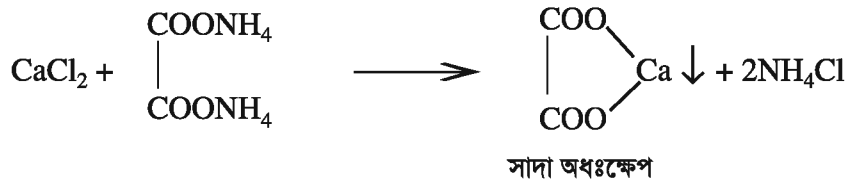
(২) ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড তৈরিতে এ ধাতু ব্যবহৃত হয়।

(৩) কোনো কোনো ধাতু নিষ্কাশনকালে তা হতে বিভিন্ন অধাতুকে অপসারণের জন্য ক্যালসিয়াম ব্যবহৃত হয়। যেমন, ইউরেনিয়াম ধাতুর নিষ্কাশনে :



ক্যালসিয়াম আয়নের পরীক্ষা : শিখা পরীক্ষায় ক্যালসিয়ামের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ কষ্টকর। এ কারণে নিম্নোক্ত আর্দ্র পরীক্ষাও করতে হবে :

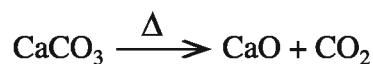
ক্যালসিয়াম লবণের দ্রবণে অ্যামোনিয়াম অক্সালেট দ্রবণ যোগ করলে ক্যালসিয়াম অক্সালেটের সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে। যা এসিটিক এসিডে দ্রবণীয় কিন্তু খনিজ এসিডে অদ্রবণীয়।



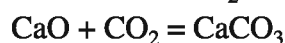
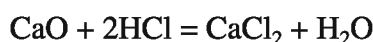
ক্যালসিয়ামের যৌগসমূহ

(১) ক্যালসিয়াম অক্সাইড, CaO

চুনাপাথরকে উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয় :



এটি এসিড ও এসিডধর্মী অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ উৎপন্ন করে।



এটি অ্যামোনিয়া অপেক্ষা তীব্রতর ক্ষারধর্মী বলে অ্যামোনিয়াম লবণের সাথে উত্তপ্ত করলে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়।



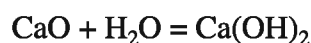
ব্যবহার : এটি (১) কলিচুন প্রস্তুতিতে

(২) ধাতু নিষ্কাশনে বিগলক হিসেবে

(৩) সোডালাইম প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

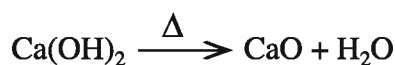
(২) ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, Ca(OH)₂

ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে স্ল্যাকেড লাইমও বলা হয়। চুনের সাথে প্রয়োজন অনুসারে পানি যোগ করলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড পানির সাথে তাপ-উৎপাদী বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন করে :

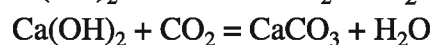
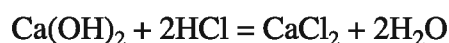


শুষ্ক ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে কলিচুন বলা হয়।

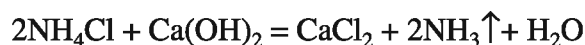
ধর্ম : এটি একটি সাদা অদানাদার পদার্থ, পানিতে সামান্য দ্রবণীয়। উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে বিয়োজিত হয়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে।



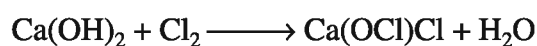
(১) এসিড ও এসিডধর্মী অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।



(২) অ্যামোনিয়া অপেক্ষা অধিক ক্ষারীয় বলে এটি অ্যামোনিয়াম লবণের সাথে উত্তপ্ত করলে অ্যামোনিয়া বিমুক্ত হয় :



(৩) 40°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত কলিচুনে ক্লোরিন গ্যাস চালনা করলে ব্লিচিং পাউডার উৎপন্ন হয়।



ব্যবহার : এটি (১) সিমেন্ট উৎপাদনে

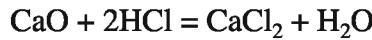
(২) দালান চুনকামের জন্য,

(৩) কস্টিক সোডা ও ব্লিচিং পাউডার উৎপাদনে

(৪) পানির খরতা দূরীকরণে ব্যবহৃত হয়।

(৩) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, $\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ এবং CaCl_2

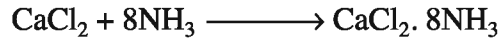
চূনাপাথর বা ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সাথে লঘু HCl যোগ করলে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।



প্রাপ্ত দ্রবণটিকে হেঁকে ও ঘন করে শীতল করলে আর্দ্র ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের কেলাস উৎপন্ন হয় :



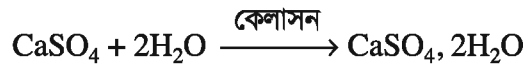
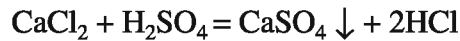
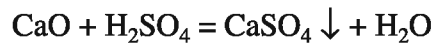
ধর্ম : ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বর্ণহীন, পানিগ্রাহী দানাদার কঠিন পদার্থ। এটি পানিতে অতি দ্রবণীয়। অনার্দ্র CaCl_2 অ্যামোনিয়ার সাথে যুত যোগ অকটা-অ্যামিন ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করে।



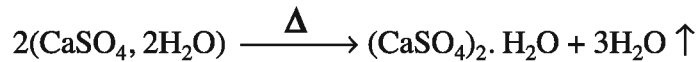
ব্যবহার : ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (১) পানিগ্রাসী হিসেবে, (২) ক্যালসিয়াম নিষ্কাশনে, (৩) হিমমিশ্র প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

(৪) ক্যালসিয়াম সালফেট, CaSO_4

প্রকৃতিতে এটি জিপসাম ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) ও অ্যানহাইড্রাইট (CaSO_4) এই দুই অবস্থায় পাওয়া যায়। চুন বা চূনাপাথরের সাথে লঘু H_2SO_4 যোগ করলে অনার্দ্র ক্যালসিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। তবে ক্যালসিয়াম লবণ, যেমন CaCl_2 এর সাথে লঘু H_2SO_4 যোগ করলে জিপসাম অধঃক্ষিপ্ত হয় :



ধর্ম : জিপসামকে উত্তপ্ত করলে প্যারিস-প্লাস্টার উৎপন্ন হয়।



ব্যবহার : এটি (১) প্যারিস-প্লাস্টার ও অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপাদনে,

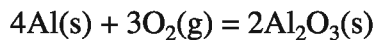
(২) কাগজের ওজন বৃদ্ধি ও মসৃণ করতে ব্যবহৃত হয়।

১৩.৩.৫ অ্যালুমিনিয়াম

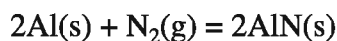
ভৌতধর্ম : অ্যালুমিনিয়াম উজ্জ্বল রূপালি বর্ণের ধাতু। অ্যালুমিনিয়াম থেকে পাতলা পাত তৈরি করা যায়।

রাসায়নিক ধর্ম : অ্যালুমিনিয়াম পর্যায় সারণিতে গ্রুপ III এর সদস্য। এর পরমাণুর শেষ কক্ষপথে তিনটি ইলেকট্রন থাকায় এর যোজনী তিন। এটি মধ্যম শক্তিশালী বিজারক। ইতোপূর্বে আলোচিত ধাতুসমূহ অপেক্ষা এটি কম সক্রিয়, তবে সক্রিয়তা ক্রমে এর অবস্থান হাইড্রোজেনের উপরে।

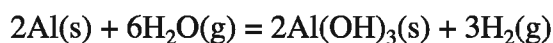
(১) বাতাসের সাথে বিক্রিয়া : বাতাসের সংস্পর্শে এর উপরিভাগে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের প্রলেপ পড়ে, যা একে বাতাসের ক্রমাগত আক্রমণ হতে রক্ষা করে। এ কারণে সাধারণ তাপমাত্রায় অ্যালুমিনিয়াম বাতাসের সাথে বিক্রিয়া করে না। কিন্তু খুব উত্তপ্ত করলে, বিশেষ করে পাত আকার হলে এটি জ্বলে ওঠে এবং অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডে পরিণত হয়।



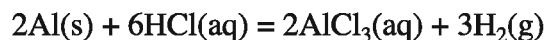
একই সাথে কিছু অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইড উৎপন্ন হয়।



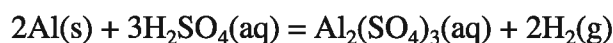
(২) পানির সাথে বিক্রিয়া : কক্ষ তাপমাত্রায় অ্যালুমিনিয়াম পানির সাথে বিক্রিয়া করে না। উত্তপ্ত অবস্থায় জলীয় বাষ্পের সাথে এ ধাতু বিক্রিয়া করে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।



(৩) এসিডের সাথে বিক্রিয়া : লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড ধীরে এবং ঘন হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্রুত এ ধাতুকে আক্রমণ করে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।



উষ্ণ লঘু সালফিউরিক এসিড একইরূপ বিক্রিয়া করে।



অপরদিকে তপ্ত গাঢ় সালফিউরিক এসিডের সাথে এ ধাতুর বিক্রিয়ায় সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।



নাইট্রিক এসিড কোনো ঘনমাত্রায়ই অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে না, কেননা, এই এসিড এ ধাতুর উপরিভাগে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের রক্ষাকারী আস্তরণ তৈরি করে।

(৪) ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া : অ্যালুমিনিয়াম ধাতু, কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাসের দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালুমিনেট লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। অ্যালুমিনিয়াম ধাতুকে পাউডার অবস্থায় নিলে বিক্রিয়া দ্রুততর হয়।



সোডিয়াম অ্যালুমিনেটের প্রকৃত সংকেত হচ্ছে NaAl(OH)_4 ; তবে অনেক সময় দুইটি পানির অণুকে বাদ দিয়ে এর সংকেত NaAlO_2 লেখা হয়।

শিখা পরীক্ষা : অ্যালুমিনিয়ামের যৌগসমূহ শিখা পরীক্ষায় কোনো বর্ণ সৃষ্টি করে না।

ব্যবহার : (১) অ্যালুমিনিয়াম খুব হালকা এবং এর যথেষ্ট ভারবহন ক্ষমতা আছে বলে এর ধাতু সংকরসমূহ উড়োজাহাজ, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, ট্রাম প্রভৃতির অংশ নির্মাণ করতে ব্যবহৃত হয়।

(২) বিদ্যুৎ সুপরিবাহী ও কপারের তুলনায় সস্তা বলে বৈদ্যুতিক তার হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়।

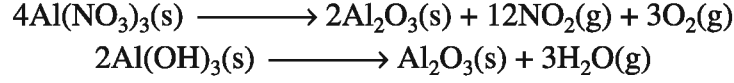
(৩) বাসনপত্র, চেয়ার, বাজ প্রভৃতি তৈরিতে এ ধাতু প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

(৪) এর পাতলা পাত দিয়ে সিগারেট, চকলেট ও অনেক খাদ্য দ্রব্যের মোড়ক তৈরি করা হয়।

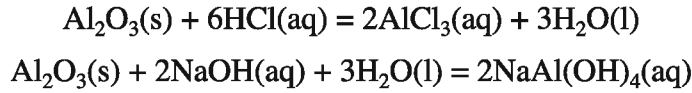
অ্যালুমিনিয়ামের কয়েকটি যৌগ

(১) অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বা অ্যালুমিনা, Al_2O_3 : প্রকৃতিতে বক্সাইট ও অন্যান্য খনিজরূপে অ্যালুমিনিয়াম

অক্সাইড পাওয়া যায়। এছাড়া বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড স্ফটিকাকারেও পাওয়া যায়, একে কোরাভাম বলা হয়। চুনি, নীলা, পান্না প্রভৃতি মূল্যবান পাথরগুলো প্রকৃতপক্ষে অল্প পরিমাণে অন্য ধাতুর অক্সাইড মিশ্রিত Al_2O_3 । এ সকল ধাতুর কারণেই বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হয়। ল্যাবরেটরিতে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, নাইট্রেট বা সালফেটকে উত্তপ্ত করে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড তৈরি করা যায়।



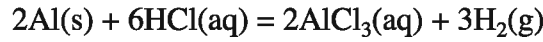
অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড উভধর্মী। এটি অম্ল ও ক্ষার উভয় দ্রবণে দ্রবীভূত হয়।



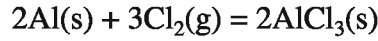
একে যদি অধিক উত্তপ্ত করা হয়, তবে তা আর এসিডে দ্রবীভূত হয় না।

অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। কোরাভাম খুব শক্ত বলে ঘর্ষণ ও পালিশের কাজে এর ব্যবহার আছে। ল্যাবরেটরিতে ক্রোমেটোগ্রাফিতে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ব্যবহৃত হয়। একে সক্রিয় অ্যালুমিনা বলা হয়।

(২) অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, $AlCl_3$: অ্যালুমিনিয়াম ধাতু বা এর অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইডকে হাইড্রোক্লোরিক এসিডে দ্রবীভূত করলে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ উৎপন্ন হয়। এ দ্রবণ হতে $AlCl_3 \cdot 6H_2O$ এর স্ফটিক পাওয়া যায়।

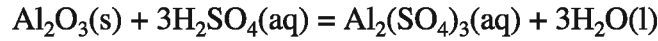


পানিশূন্য লবণ উৎপাদনের জন্য উত্তপ্ত অ্যালুমিনিয়ামের উপর দিয়ে শুষ্ক ক্লোরিন গ্যাস প্রবাহিত করা হয়।



পানিশূন্য ও পানিশূন্য অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড সাদা দানাদার কঠিন পদার্থ। পানিশূন্য অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড বিভিন্ন বিক্রিয়ায় প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

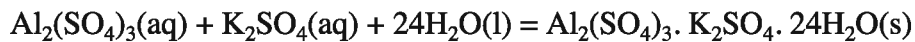
(৩) অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$: বক্সাইট খনিজকে লঘু সালফিউরিক এসিডে দ্রবীভূত করে এ যৌগ উৎপাদন করা হয়।



অ্যালুমিনিয়াম সালফেট সাদা বর্ণের দানাদার কঠিন পদার্থ।

এটি পানি পরিশোধনে ব্যবহৃত হয়।

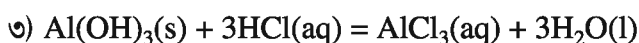
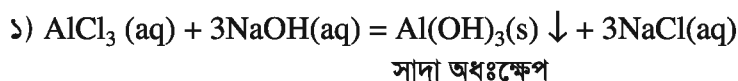
(৪) পটাসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, $Al_2(SO_4)_3 \cdot K_2SO_4 \cdot 24H_2O$: পরীক্ষাগারে পটাসিয়াম সালফেট ও অ্যালুমিনিয়াম সালফেট দ্রবণ যোগ করে কেলাসিত করে এ যৌগ তৈরি করা হয়।



শিল্পক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বা বক্সাইটের সাথে সালফিউরিক এসিডের বিক্রিয়া করে এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ পটাসিয়াম সালফেট যোগ করে এর দ্রবণ তৈরি করা হয়। একে পটাস এলাম বলা হয়। বাংলা ভাষায় এর নাম ফটিকরি। এটি পানি পরিশোধনে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া রঞ্জন শিল্প, চর্ম শিল্প, কাগজ শিল্প প্রভৃতিতে এটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

অ্যালুমিনিয়াম আয়নের পরীক্ষা : অ্যালুমিনিয়াম লবণের দ্রবণে NH_4Cl ও NH_4OH যোগ করলে সাদা রঙের

আঠালো অধঃক্ষেপ পড়ে। এ অধঃক্ষেপ অতিরিক্ত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডে ও এসিডে দ্রবণীয়। কিন্তু অতিরিক্ত NH_4OH এ অদ্রবণীয়

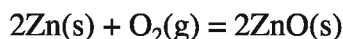


১৩.৩.৬ জিংক বা দস্তা

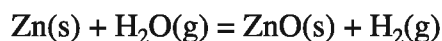
ভৌতধর্ম : জিংক একটি নীলাভ সাদা বর্ণের ধাতু। 100°C তাপমাত্রার নিচে জিংক ভঙ্গুর, কিন্তু $100^\circ-150^\circ\text{C}$ তাপমাত্রায় একে সরু তারে বা পাতে পরিণত করা যায়।

রাসায়নিক ধর্ম : জিংক একটি মধ্যম শক্তিশালী বিজারক। সক্রিয়তা ক্রমে এর অবস্থান অ্যালুমিনিয়ামের নিচে এবং আয়রনের উপরে। এর সর্বশেষ স্তরে দুইটি ইলেকট্রন আছে, এ দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে সহজেই Zn^{2+} আয়ন গঠিত হয়, এ কারণে জিংকের যোজনী ২ এবং যৌগসমূহ আয়নিক প্রকৃতির।

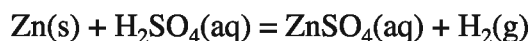
(১) বাতাসের সাথে বিক্রিয়া : বাতাসে রেখে দিলে জিংকের উপরিভাগে জিংক অক্সাইডের একটি পাতলা স্তর তৈরি হয়, যা একে আরো জারণ হতে রক্ষা করে। বাতাস বা অক্সিজেনে উত্তপ্ত করলে জিংক সবুজাভ সাদা শিখাসহ জ্বলে জিংক অক্সাইড উৎপন্ন করে।



(২) পানির সাথে বিক্রিয়া : কক্ষ তাপমাত্রায় জিংক পানির সাথে বিক্রিয়া করে না। উচ্চ তাপমাত্রায় জিংক ধাতুর উপর দিয়ে জলীয় বাষ্প প্রবাহিত করলে জিংক অক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

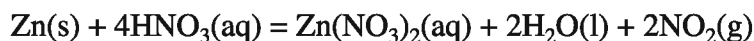


(৩) এসিডের সাথে বিক্রিয়া : সক্রিয়তা ক্রমে জিংকের অবস্থান হাইড্রোজেনের উপরে হওয়ায় জিংক জারণ ধর্মহীন লঘু এসিডসমূহ হতে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে।



তবে বিশুদ্ধ জিংক এ বিক্রিয়া করে না, সাধারণ জিংক এ বিক্রিয়া দেয়।

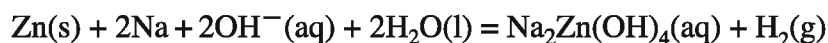
নাইট্রিক এসিডের ঘনমাত্রার ওপর নির্ভর করে জিংকের সাথে বিক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের উৎপাদ তৈরি হয়। তবে সব সময় জিংক নাইট্রেট এবং একই সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ উৎপন্ন হয়। যেমন শীতল ও গাঢ় নাইট্রিক এসিড জিংকের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে।



অপরদিকে শীতল ও মধ্যম গাঢ় নাইট্রিক এসিডের ক্ষেত্রে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়।



(৪) স্কারের সাথে বিক্রিয়া : জিংক উষ্ণ কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাস দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম বা পটাসিয়াম জিংকেট ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।



উল্লেখ্য যে সোডিয়াম জিংকেটের সত্যিকার সংকেত $\text{Na}_2\text{Zn}(\text{OH})_4$; কিন্তু দুইটি পানির অণুকে বাদ দিয়ে Na_2ZnO_2 লেখা হত।

শিখা পরীক্ষা : শিখা পরীক্ষায় জিংক কোনো বর্ণ দেখায় না।

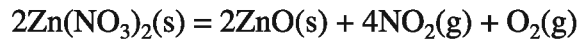
ব্যবহার : (১) লোহার জিনিসকে মরিচার হাত হতে রক্ষার জন্য এর উপর জিংকের প্রলেপ দেওয়া হয়। একে গ্যালভানাইজিং বলা হয়। ঘরের ছাদ হিসেবে যে টিন ব্যবহার করা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে জিংকের প্রলেপযুক্ত ইস্পাতের পাত।

(২) বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সেল, বিশেষ করে ড্রাইসেল বা ব্যাটারি তৈরিতে জিংক ব্যবহৃত হয়।

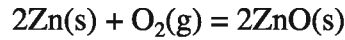
(৩) ব্রাস বা পিতল, জার্মান সিলভার প্রভৃতি ধাতু-সংকর তৈরিতে জিংক ব্যবহৃত হয়।

জিংকের কিছু যৌগ

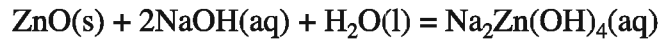
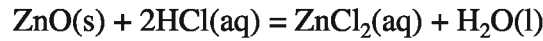
(১) জিংক অক্সাইড; ZnO : জিংক কার্বনেট, নাইট্রেট বা হাইড্রোক্সাইডকে উত্তপ্ত করলে জিংক অক্সাইড উৎপন্ন হয়।



শিল্পক্ষেত্রে জিংক ধাতুকে বাতাসে পুড়িয়ে জিংক অক্সাইড উৎপাদন করা হয়।

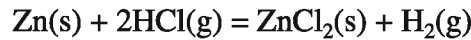
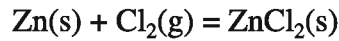


জিংক অক্সাইড সাদা অদানাদার পাউডার। এর বিশেষ ধর্ম হচ্ছে উত্তপ্ত করলে এটি হলুদ বর্ণ ধারণ করে; ঠান্ডা করলে আবার সাদা হয়। এটি পানিতে অদ্রবণীয়। এটি উভধর্মী অক্সাইড; এসিড ও ক্ষার উভয়ের সাথে বিক্রিয়া করে।



জিংক অক্সাইড সাদা রং হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর জীবাণুনাশক ধর্মের জন্য মলম আকারে এবং মেডিকেটেড পাউডারের অংশ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। দাঁতের চিকিৎসায় এটি ব্যবহৃত হয়।

(২) জিংক ক্লোরাইড; $\text{ZnCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$: জিংক ধাতু, জিংক অক্সাইড, হাইড্রোক্সাইড বা কার্বনেটের সাথে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় জিংক ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়া দ্রবণকে গাঢ় করে পানিযুক্ত জিংক ক্লোরাইড $\text{ZnCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ এর স্ফটিক পাওয়া যায়। এছাড়া উত্তপ্ত জিংক ধাতুর সাথে শুষ্ক ক্লোরিন গ্যাস বা শুষ্ক হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের বিক্রিয়ায় পানিশূন্য জিংক ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।



পানিযুক্ত জিংক ক্লোরাইড অত্যন্ত পানিগ্রাহী। জিংক ক্লোরাইডের দ্রবণ জীবাণুনাশক হিসেবে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে কাঠের পচন রোধ করতে।

(৩) জিংক সালফেট, $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$: জিংক ধাতু, এর অক্সাইড বা কার্বনেটকে লঘু সালফিউরিক এসিডে দ্রবীভূত করলে জিংক সালফেটের দ্রবণ পাওয়া যায়। ঐ দ্রবণ গাঢ় করে ঠান্ডা করলে বর্ণহীন $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ কেলাসিত হয়। একে সাদা ভিট্রিয়ল বলা হয়।

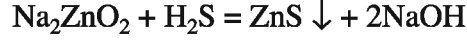
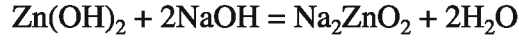
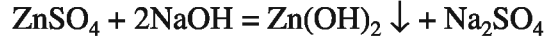


পানিযুক্ত জিংক সালফেট একটি পানিত্যাগী লবণ ও পানিতে অত্যন্ত দ্রবণীয়। উত্তপ্ত করলে এটি সম্পূর্ণ পানিশূন্য হয়ে যায়। জীবাণুনাশক হিসেবে, চামড়া ও কাঠের পচন নিবারণে, বস্ত্র রঞ্জন, ছাপানোর কাজে জিংক সালফেট ব্যবহৃত হয়।

জিংক আয়নের পরীক্ষা

জিংক লবণের দ্রবণে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলে জিংক হাইড্রোক্সাইডের সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে যা অতিরিক্ত

সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডে দ্রবণীয়। তবে উক্ত দ্রবণে H_2S গ্যাস চালনা করলে জিংক সালফাইডের সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে।



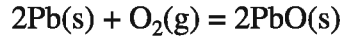
সাদা অধঃক্ষেপ

১৩.৩.৭ লেড বা সীসা

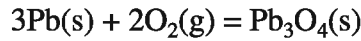
ভৌত ধর্ম : লেড ঈষৎ নীলাভ ধূসর ধাতু। এটি এত নরম যে ছুরি দিয়ে একে কাটা যায়। কাগজের উপর ঘষলে কালো দাগ কাটে।

রাসায়নিক ধর্ম : লেড কম সক্রিয় ধাতু। সক্রিয়তা ক্রমে এর অবস্থান হাইড্রোজেনের ঠিক উপরে। এর যোজনী ২ ও ৪। যে সকল যৌগে লেডের যোজনী ২, তারা আয়নিক প্রকৃতির এবং সাধারণত লবণ। অপরদিকে ৪ যোজনী বিশিষ্ট লেড যৌগসমূহ সমযোজী প্রকৃতির।

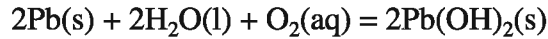
(১) বাতাসের সাথে বিক্রিয়া : সাধারণ তাপমাত্রায় বাতাসের কারণে লেডের উপরিভাগে লেড অক্সাইডের একটি রক্ষাকারী আস্তরণ পড়ে বলে তা আর বিক্রিয়া করে না। বাতাসে লেডকে খুব উত্তপ্ত করলে তা হলুদ বর্ণের লেড অক্সাইড উৎপন্ন করে।



কিন্তু প্রায় $450^\circ C$ তাপমাত্রায় লেডকে উত্তপ্ত করলে লাল বর্ণের লেড অক্সাইড উৎপন্ন হয়, যা রেড লেড নামে পরিচিত।

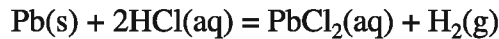


(২) পানির সাথে বিক্রিয়া : বাতাসের অনুপস্থিতিতে বিশুদ্ধ পানিতে লেড বিক্রিয়া করে না, কিন্তু বাতাসের উপস্থিতিতে ধীরে ধীরে লেড হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হয়।



লেড হাইড্রোক্সাইড পানিতে খুব স্বল্পমাত্রায় দ্রবণীয়, আবার লেড লবণসমূহ বিষাক্ত। সুতরাং সীসার তৈরি পাইপে সরবরাহকৃত পানি পানে বিভিন্ন রোগের উৎপত্তি হতে পারে।

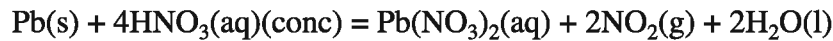
(৩) এসিডের সাথে বিক্রিয়া : HCl বা H_2SO_4 এ লেড দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু উষ্ণ ও গাঢ় HCl এ তা দ্রবীভূত হয়। দ্রবণ শীতল হলে লেড ক্লোরাইডের স্ফটিক পাওয়া যায়।



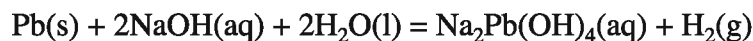
গরম ঘন সালফিউরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় লেড সালফেট ও সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।



লঘু বা গাঢ় নাইট্রিক এসিডে লেডকে দ্রবীভূত করে লেড নাইট্রেট ও নাইট্রোজেনের অক্সাইড উৎপন্ন হয়।



(৪) স্কারের সাথে বিক্রিয়া : কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাস দ্রবণে লেড ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হয় এবং সোডিয়াম বা পটাসিয়াম প্রোসাইট ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়।



শিখা পরীক্ষা : শিখা পরীক্ষায় লেডের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

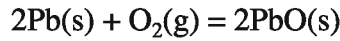
ব্যবহার : (১) নিম্ন গলনাঙ্ক ও কোমলতার জন্য লেড বুলেট ও অন্যান্য ধাতুসংকর তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(২) লেড ধাতু স্টোরেজ ব্যাটারি মোটরগাড়ির ব্যাটারি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

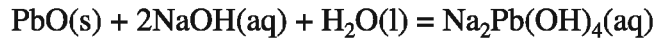
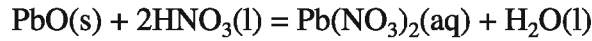
(৩) শ্বেত লেড, ক্রোম হলুদ, লাল লেড প্রভৃতি রং তৈরিতে লেড ব্যবহৃত হয়।

লেডের কয়েকটি যৌগ : লেডের দুই ধরনের যৌগ আছে। যে সকল যৌগে এর যোজনী দুই, তাদেরকে প্লাম্বাস যৌগ বলা হয়। এ ধরনের যৌগ আয়নিক প্রকৃতির। লেডের বিভিন্ন লবণে লেডের যোজনী ২। এ কারণে সাধারণভাবে লেড লবণ বলতে প্লাম্বাস লবণ বুঝায়। কিছু যৌগে লেডের যোজনী ৪। এগুলোকে প্লাম্বিক যৌগ বলা হয়; এরা সমযোজী প্রকৃতির।

(১) লেড মনোক্সাইড **PbO** : গলিত লেডের উপর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত করলে লেড মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়।

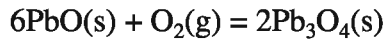


এটি হলুদ বর্ণের দানাদার পদার্থ। এটি উভধর্মী; এসিডে দ্রবীভূত হয়ে প্লাম্বাস লবণ এবং ক্ষারে দ্রবীভূত হয়ে প্লাম্বাইট উৎপন্ন করে।



রং হিসেবে, কাচ প্রস্তুতিতে এবং লেডের বিভিন্ন যৌগ প্রস্তুতিতে এর ব্যবহার আছে।

(২) লাল লেড বা রেড লেড (Red lead), Pb_3O_4 : পরাবর্তক চুল্লিতে বায়ু প্রবাহে লেড মনোক্সাইডকে উত্তপ্ত করে শিল্পক্ষেত্রে রেড লেড উৎপাদন করা হয়।



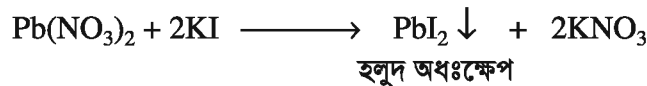
এটি লাল রঙের পাউডার। এই লাল রং এর নামকরণের উৎস। গাঢ় নাইট্রিক এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় এটি লেড নাইট্রেট ও লেড ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে।



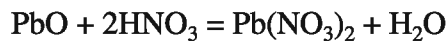
দিয়াশলাই শিল্পে ও কাচ তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।

লেড আয়নের পরীক্ষা : লেড আয়নের শিখা পরীক্ষা নিশ্চিত পরীক্ষা নয়। নিম্নের অর্ধ পরীক্ষা দ্বারা লেড আয়ন শনাক্ত করা হয়।

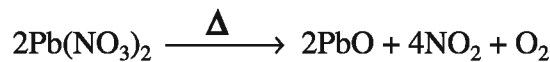
লেড লবণের দ্রবণে পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবণ যোগ করলে লেড আয়োডাইডের হলুদ অধঃক্ষেপ পড়ে।



লেড নাইট্রেট **Pb(NO₃)₂** : লেড বা লেড মনোক্সাইডকে নাইট্রিক এসিডে দ্রবীভূত করলে লেড নাইট্রেট উৎপন্ন হয়।

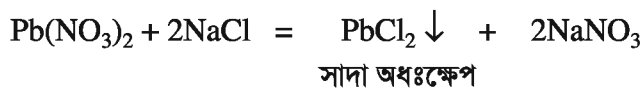
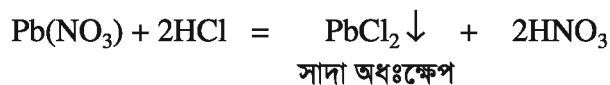


এটি বর্ণহীন দানাদার কঠিন পদার্থ। পানিতে দ্রবণীয়। উত্তপ্ত করলে এটি বিয়োজিত হয়ে লেড মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে :



এটি পরীক্ষাগারে NO_2 প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

(৪) লেড (II) ক্লোরাইড **PbCl₂** : লেড লবণ, যেমন লেড নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণে লঘু HCl বা ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ যোগ করলে লেড ক্লোরাইডের সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে।



লেড ক্লোরাইড ঠান্ডা পানিতে অল্প পরিমাণে দ্রবণীয় কিন্তু ফুটন্ত পানিতে দ্রবণীয়। গাঢ় HCl এ ফুটালে লেড ক্লোরাইড জটিল যৌগ $\text{H}_2[\text{PbCl}_4]$ গঠন করে ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হয় :



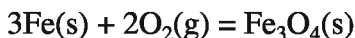
১৩.৩.৮ আয়রন বা লোহা

ভৌতধর্ম : বিশুদ্ধ আয়রন উজ্জ্বল রূপালি বর্ণের ধাতু। এটি নরম, নমনীয় ও ঘাতসহ। এটি চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং একে চুম্বকে পরিণত করা যায়।

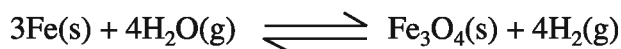
রাসায়নিক ধর্ম : আয়রন একটি মধ্যম সক্রিয় ধাতু। সক্রিয়তা ক্রমে এর অবস্থান হাইড্রোজেনের উপরে, কিন্তু ক্ষারধাতু, মৃৎক্ষারধাতুসমূহ ছাড়াও অ্যালুমিনিয়াম ও জিংকের নিচে। পরিবর্তনশীল যোজনী থাকায় এর যোজনী হচ্ছে ২ ও ৩।

(১) বাতাসের সাথে বিক্রিয়া : সাধারণ তাপমাত্রায় শূন্য বাতাসে আয়রনের কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু আর্দ্র বাতাসে অতি সহজেই বিশুদ্ধ আয়রনের উপর মরিচা পড়ে। মরিচা হচ্ছে প্রধানত পানিযুক্ত আয়রন(III) অক্সাইড, $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ।

আয়রনের গুঁড়োকে বাতাস বা অক্সিজেনে উত্তপ্ত করলে তা পুড়ে ফেরাসোফেরিক অক্সাইড বা আয়রনের চৌম্বকীয় অক্সাইড উৎপন্ন করে।



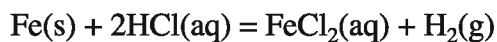
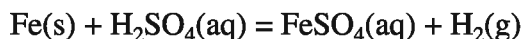
(২) পানির সাথে বিক্রিয়া : সাধারণ তাপমাত্রায় বাতাসের অনুপস্থিতিতে বিশুদ্ধ পানি আয়রনকে আক্রমণ করে না। উত্তপ্ত লাল আয়রনের উপর দিয়ে জলীয় বাষ্প প্রবাহিত করলে ফেরাসোফেরিক অক্সাইড ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়।



এ বিক্রিয়াটি উত্তমুখী।

লক্ষ কর, যদি বাতাস ও পানি একত্রে আয়রনের সাথে বিক্রিয়া করে তবে আয়রন(III) অক্সাইড উৎপন্ন হয়; কিন্তু এরা পৃথকভাবে আয়রনের সাথে বিক্রিয়া করলে ফেরাসোফেরিক অক্সাইড বা ট্রাই আয়রন-টেন্টোঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।

(৩) এসিডের সাথে বিক্রিয়া : আয়রন সক্রিয়তা ক্রমে হাইড্রোজেনের উপরে অবস্থিত হওয়ায় তা লঘু হাইড্রোক্লোরিক ও সালফিউরিক এসিড হতে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করে।



যেহেতু এ সকল বিক্রিয়ায় সহউৎপাদ হাইড্রোজেন একটি বিজারক, সেহেতু এসব ক্ষেত্রে আয়রন (II) লবণ উৎপন্ন হয়।

নিষ্ক্রিয় অবস্থা : এক টুকরো পরিষ্কার আয়রনকে গাঢ় নাইট্রিক এসিডে ডুবালে দৃশ্যত কোনো বিক্রিয়া ঘটে না; কিন্তু আয়রনের টুকরাটি আর পূর্বের ন্যায় আচরণ করে না। যেমন সাধারণ আয়রন টুকরা কপার সালফেটের দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে কপারকে প্রতিস্থাপন করে, লঘু নাইট্রিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে। কিন্তু উপরিউক্ত টুকরাটি তা করে না। অর্থাৎ আয়রনের টুকরাটি নিষ্ক্রিয় (passive) হয়ে যায়। এ নিষ্ক্রিয়তার কারণ হচ্ছে এই যে, গাঢ় নাইট্রিক

এসিড একটি শক্তিশালী জারক, আয়রনের টুকরা এতে প্রবেশ করালে তা আয়রনের সাথে বিক্রিয়া করে ট্রাই আয়রন-ট্রাইক্সাইডের একটি সূক্ষ্ম প্রলেপ তৈরি করে, যা আয়রনের টুকরাকে বিভিন্ন বিক্রিয়কের সংস্পর্শে আসতে দেয় না। এ “নিষ্ক্রিয়” আয়রনের টুকরাকে ঘষা দিয়ে কপার সালফেট দ্রবণ বা লঘু নাইট্রিক এসিডে প্রবেশ করালে দ্রুত বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। অর্থাৎ ঘষার মাধ্যমে রক্ষাকারী আবরণটি দূরীভূত হয়।

শিখা পরীক্ষা : শিখা পরীক্ষায় আয়রনের লবণসমূহ কোনো বর্ণ দেখায় না।

ব্যবহার : আয়রনের ব্যবহার অত্যন্ত বেশি। বিশুদ্ধ আয়রন নরম। তাই শিল্প ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা হয় না। তবে এর সাথে অল্প পরিমাণ কার্বন ও অন্যান্য মৌল যোগ করে বিভিন্ন গুণের আয়রন তৈরি করা হয়। তন্মধ্যে ঢালাই লোহা, পেটালোহা ও ইস্পাত গুরুত্বপূর্ণ।

(ক) ঢালাই লোহা প্রধানত বিভিন্ন ঢালাই কারখানায়, কড়াই, বাটখারা, টিউব-ওয়েলের মাথা ইত্যাদি প্রস্তুতিতে এবং ইস্পাত ও পেটা লোহা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

(খ) ইস্পাত প্রধানত রেলের চাকা ও লাইন, ইঞ্জিন, জাহাজ, যানবাহন, দালান-কোঠার ফ্রেম, বিম, মেশিন গান, ছুরি, কাঁচি, ঘড়ির স্প্রিং, কৃষি ও অস্ত্রোপচার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

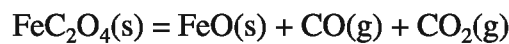
(গ) পেটা লোহা সাধারণত শিকল, তার, তারজালি, বৈদ্যুতিক চুম্বক, পিয়ানোর তার ইত্যাদি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

আয়রনের যৌগসমূহ : Fe(II) যৌগসমূহ সুবিধাজনক জারকের উপস্থিতিতে Fe(III) যৌগ গঠন করতে পারে।

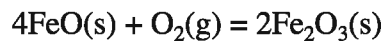
এক্ষেত্রে আয়রনের যোজনী 3। সৃষ্ট যৌগসমূহ আয়রন(III) যৌগ পূর্বে এদেরকে ফেরিক যৌগ বলা হত। নিম্নের সারণিতে আয়রনের গুরুত্বপূর্ণ সরল যৌগসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

	আয়রন(II) আয়ন, Fe^{2+}	আয়রন(III) আয়ন, Fe^{3+}
অক্সাইড	FeO	Fe_2O_3
হাইড্রোক্সাইড	$Fe(OH)_2$	$Fe(OH)_3$
ক্লোরাইড	$FeCl_2$	$FeCl_3$
সালফেট	$FeSO_4$	$Fe_2(SO_4)_3$
	দ্রবণীয় আয়রন(II) লবণসমূহ	দ্রবণীয় আয়রন(III) লবণসমূহ
	হাল্কা সবুজ বর্ণের দ্রবণ তৈরি করে।	হলুদ বা বাদামি বর্ণের দ্রবণ তৈরি করে।

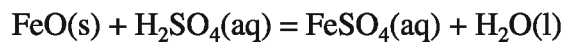
(১) **আয়রন(II) অক্সাইড; FeO :** সাধারণত বাতাসের অনুপস্থিতিতে আয়রন(II) অক্সালেটকে উত্তপ্ত করে আয়রন(II) অক্সাইড তৈরি করা হয়।



এটি কালো রঙের পাউডার, পানিতে অদ্রবণীয়, বাতাসে সহজেই জারিত হয়ে আয়রন(III) অক্সাইড উৎপন্ন করে।



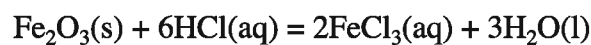
এটি ক্ষারীয় অক্সাইড, সুতরাং জারণ ধর্মহীন এসিডের সাথে এর বিক্রিয়ায় আয়রন(II) লবণ উৎপন্ন হয়।



(২) **আয়রন (III) অক্সাইড Fe_2O_3 :** আয়রন (III) নাইট্রেট/হাইড্রোক্সাইড প্রভৃতিকে উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে আয়রন(III) অক্সাইড পাওয়া যায়।

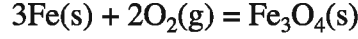
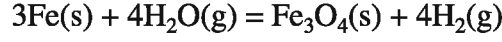


এটি গাঢ় লাল রঙের পাউডার জাতীয় পদার্থ, পানিতে অদ্রবণীয়। এসিডে দ্রবীভূত হয়ে এটি আয়রন(III) লবণ উৎপন্ন করে।

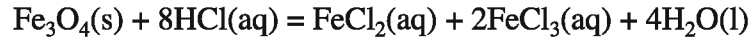


লাল রং রূপে এবং স্পর্শ প্রণালিতে সালফিউরিক এসিড উৎপাদনে প্রভাবকরূপে আয়রন(III) অক্সাইড ব্যবহৃত হয়।

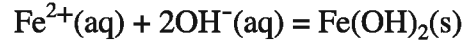
(৩) ট্রাই-আয়রন টেট্রাক্সাইড, Fe_3O_4 : তন্ত লাল আয়রন চূর্ণের উপর দিয়ে স্টিম চালনা করলে বা আয়রন চূর্ণকে পোড়ালে এ যৌগ উৎপন্ন হয়।



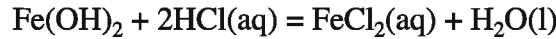
প্রকৃতিতে এটিকে খনিজরূপে পাওয়া যায়। এ খনিজের নাম ম্যাগনেটাইট। এটি কালো বর্ণের কঠিন চৌম্বক পদার্থ। এটি পানিতে অদ্রবণীয়, কিন্তু জারণ ধর্মহীন এসিডে দ্রবীভূত হয়ে ফেরাস ও ফেরিক লবণের মিশ্রণ তৈরি করে।



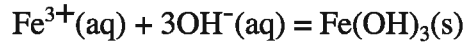
(৪) আয়রন(II) হাইড্রোক্সাইড, Fe(OH)_2 : আয়রন(II) লবণের দ্রবণে সোডিয়াম বা পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ যোগ করলে আয়রন (II) হাইড্রোক্সাইডের সবুজ অধঃক্ষেপ পড়ে।



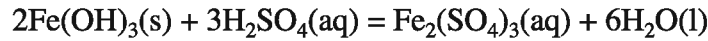
এটি সহজেই বাতাস দ্বারা জারিত হয়ে আয়রন(III) অক্সাইডে পরিণত হয়। এসিডে দ্রবীভূত করলে এটি আয়রন(II) লবণ দেয়।



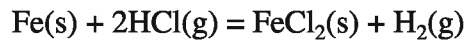
(৫) আয়রন(III) হাইড্রোক্সাইড Fe(OH)_3 : আয়রন(III) লবণের দ্রবণে সোডিয়াম, পটাসিয়াম বা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ যোগ করলে আয়রন(III) হাইড্রোক্সাইডের লালচে বাদামি অধঃক্ষেপ পড়ে।



এটি পানিতে অদ্রবণীয়, কিন্তু এসিডসমূহে দ্রবীভূত হয়ে আয়রন (III) লবণ উৎপন্ন করে।



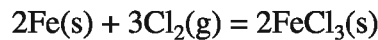
(৬) আয়রন(II) ক্লোরাইড, FeCl_2 : উত্তপ্ত আয়রন চূর্ণের সাথে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের বিক্রিয়ায় পানিশূন্য আয়রন(II) ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।



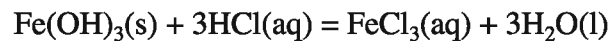
আয়রন ধাতুর সাথে লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় আয়রন(II) ক্লোরাইডের দ্রবণ উৎপন্ন হয়। একে পরিস্রাবণ করে বাতাসের অনুপস্থিতিতে গাঢ় করে ঠান্ডা করলে অর্ধ আয়রন(II) ক্লোরাইডের কেলাস পৃথক হয়ে আসে। পানিযুক্ত আয়রন(II) ক্লোরাইডের অণুতে ৬ অণু পানি থাকে, অতএব এর সংকেত $\text{FeCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ।

পানিশূন্য আয়রন(II) ক্লোরাইড হলুদাভ সবুজ ও পানিগ্রাহী স্ফটিক। পানিযুক্ত যৌগ হালকা সবুজ রঙের স্ফটিক। উভয়েই পানিতে দ্রবণীয় ও সহজে জারিত হয়ে আয়রন(III) লবণে পরিণত হয়।

(৭) আয়রন(III) ক্লোরাইড, FeCl_3 : উত্তপ্ত আয়রন চূর্ণের উপর দিয়ে ক্লোরিন গ্যাস চালনা করলে পানিশূন্য আয়রন(III) ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।

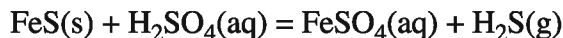


আয়রন(III) অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইডকে লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিডে দ্রবীভূত করলে আয়রন(III) ক্লোরাইড দ্রবণ উৎপন্ন হয়। এ দ্রবণকে গাঢ় ও ঠান্ডা করলে পানিযুক্ত আয়রন(III) ক্লোরাইড, $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ এর কেলাস পাওয়া যায়।



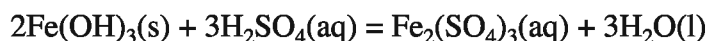
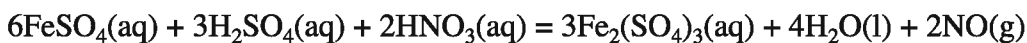
পানিশূন্য আয়রন(III) ক্লোরাইড কালো ঐশ প্রকৃতির, কিন্তু পানিযুক্ত লবণটি গাঢ় হলুদ বর্ণের। উভয়েই পানিগ্রাহী ও পানিতে দ্রবণীয়।

(৮) আয়রন(II) সালফেট, $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$: আয়রন ধাতু, আয়রন(II) সালফাইড বা আয়রন(II) কার্বনেটকে লঘু সালফিউরিক এসিডে দ্রবীভূত করে এ যৌগ তৈরি করা হয়। উৎপন্ন দ্রবণকে গাঢ় ও ঠান্ডা করলে হালকা সবুজ বর্ণের $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ এর ক্রিস্টাল পাওয়া যায়।



পানিস্থ আয়রন(II) সালফেটকে সবুজ ভিট্রিয়লও বলা হয়। এটি লেখার কালি তৈরিতে, মোর লবণ প্রস্তুতিতে এবং ল্যাবরেটরিতে বিকারকরূপে ব্যবহৃত হয়।

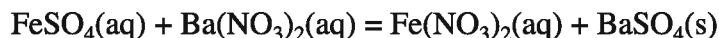
(৯) আয়রন(III) সালফেট, $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$: সালফিউরিক এসিডযুক্ত আয়রন(II) সালফেটকে গাঢ় নাইট্রিক এসিড বা অন্যান্য জারক দ্বারা জারিত করে অথবা আয়রন(III) হাইড্রোক্সাইড বা অক্সাইডকে লঘু সালফিউরিক এসিডে দ্রবীভূত করে আয়রন(III) সালফেট উৎপন্ন করা যায়।



$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ হালকা হলুদ বর্ণের; পানিশূন্য লবণ বর্ণহীন। এটি রঞ্জকরূপে ব্যবহৃত হয়।

(১০) আয়রন(II) নাইট্রেট, $\text{Fe(NO}_3)_2$: এ যৌগে আয়রন(II) আয়ন বিজারক, নাইট্রেট জারক। এ দুইটি বিপরীতধর্মী অংশের কারণে এ যৌগ স্থায়ী নয়।

আয়রন(II) সালফেটের দ্রবণে বেরিয়াম নাইট্রেটের দ্রবণ যোগ করে এ যৌগ তৈরি করা যায়।



এটি সবুজ বর্ণের স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, যা পানিতে অত্যন্ত দ্রবণীয়।

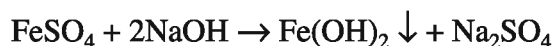
(১১) আয়রন(III) নাইট্রেট, $\text{Fe(NO}_3)_3$: আয়রনকে মধ্যম গাঢ় নাইট্রিক এসিডে দ্রবীভূত করলে এ যৌগ উৎপন্ন হয়।



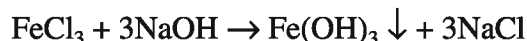
বিক্রিয়া মিশ্রণকে পরিস্রাবণ, ঘনীভবন এবং শেষে শীতল করলে সবুজ বর্ণের $\text{Fe(NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ এর স্ফটিক পাওয়া যাবে। আয়রন(III) নাইট্রেট রঞ্জন শিল্পে রং-বন্ধকরূপে ব্যবহৃত হয়।

আয়রনের শনাক্তকারী বিক্রিয়া :

(১) আয়রন(II) সালফেট দ্রবণের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ যোগ করলে সবুজ বর্ণের আয়রন(II) হাইড্রোক্সাইডের অধঃক্ষেপ পড়ে।



(২) আয়রন(III) লবণের দ্রবণে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ যোগ করলে লালচে বাদামি বর্ণের আয়রন(III) হাইড্রোক্সাইডের অধঃক্ষেপ পড়ে।



(৩) আয়রন(II) লবণ এবং আয়রন(III) লবণের দ্রবণে পৃথকভাবে অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট দ্রবণ যোগ করলে আয়রন(II) এর ক্ষেত্রে কোনো বিক্রিয়া ঘটে না, তবে আয়রন(III) ক্ষেত্রে রক্তের ন্যায় লাল বর্ণের দ্রবণ উৎপন্ন হয়।



রক্ত লাল বর্ণ

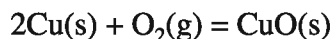
১৩.৩.৯ কপার বা তামা (Copper)

ভৌতধর্ম : কপার ধাতুর লালচে ধরনের একটি বিশেষ রং আছে, যাকে তামাতে বর্ণ বলা হয়।

রাসায়নিক ধর্ম : কপার একটি কম সক্রিয় ধাতু। সক্রিয়তা ক্রমে এর অবস্থান হাইড্রোজেনের নিচে। এটি পরিবর্তনশীল যোজনী দেখায়। এর যোজনী হচ্ছে 1 ও 2। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যোজনী 2 হয়, বহুলভাবে কপার লবণ বলতে কপার(II) লবণ বুঝায়।

(১) বাতাসের সাথে বিক্রিয়া : কপার শুষ্ক বাতাস বা বিশুদ্ধ পানি দ্বারা আক্রান্ত হয় না, কিন্তু খোলা বাতাসে রেখে দিলে এর পৃষ্ঠদেশ ধীরে ধীরে আক্রান্ত হয় এবং একটি সবুজ কঠিন পদার্থের সৃষ্টি হয়। এর সংযুক্তি বিভিন্ন রকম হয়।

বাতাসে কপারকে উত্তপ্ত করলে তার পৃষ্ঠদেশে কপার(II) অক্সাইডের কালো আস্তরের সৃষ্টি হয়।



(২) পানির সাথে বিক্রিয়া : সক্রিয়তা ক্রমে কপারের অবস্থান হাইড্রোজেনের নিচে হওয়ায় এটি পানির সাথে বিক্রিয়া করে না।

(৩) এসিডের সাথে বিক্রিয়া : সক্রিয়তা ক্রমে কপারের অবস্থান হাইড্রোজেনের নিচে বলে এটি এসিডসমূহ হতে সরাসরি হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। ফলে জারণ ধর্মহীন এসিডসমূহের সাথে বিক্রিয়া করে না।

লঘু নাইট্রিক এসিড কপারের সাথে বিক্রিয়া করে কপার নাইট্রেটের সাথে সাথে নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ উৎপন্ন করে, প্রধানত নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়।



গরম ঘন সালফিউরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় কপার(II) সালফেট এবং সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।



(৪) ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া : ক্ষারের সাথে কপারের কোনো বিক্রিয়া নেই।

শিখা পরীক্ষা : কপার লবণসমূহ শিখা পরীক্ষায় সবুজাভ নীল রং প্রদর্শন করে।

ব্যবহার : (১) কপার খুব ভালো বিদ্যুৎ পরিবাহী বলে বিদ্যুৎ শিল্পের, যেমন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং বৈদ্যুতিক তার নির্মাণে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

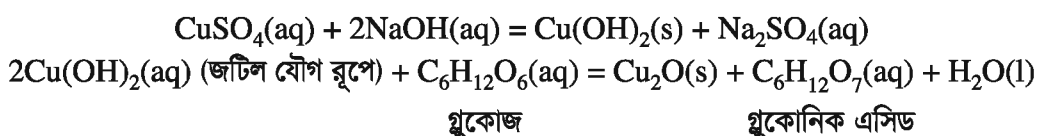
(২) তড়িৎ প্রলেপনে এবং তড়িৎ মুদ্রাক্ষর প্রস্তুতিতে কপার ব্যবহৃত হয়।

(৩) উচ্চ তাপ পরিবাহিতা এবং ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণে এটি বিভিন্ন বয়লার, শীতক, গৃহস্থালি বাসনপত্র প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

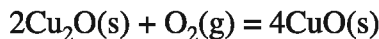
(৪) বিভিন্ন ধাতু-সংকর, যেমন পিতল, কাঁসা, জার্মান সিলভার প্রস্তুতিতে কপার ব্যবহৃত হয়।

কপারের যৌগসমূহ : কপারের পরিবর্তনশীল যোজনী থাকায় এর দুই ধরনের যৌগ বিদ্যমান। Cu(II) যৌগসমূহ সাধারণত নীল বা সবুজ বর্ণের। Cu(I) অক্সাইড লাল কিন্তু অন্যান্য যৌগ সাদা হয়। অনেক Cu(II) যৌগ পানিতে দ্রবণীয়, প্রায় সকল Cu(I) যৌগ পানিতে অদ্রবণীয়।

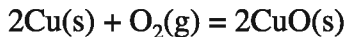
(১) কপার(I) অক্সাইড; Cu_2O : কপার(II) লবণের ক্ষারীয় দ্রবণকে গ্লুকোজসহ উত্তপ্ত করলে লাল বর্ণের কপার(I) অক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বহুমূত্র রোগীর প্রস্রাবে এভাবে গ্লুকোজের পরীক্ষা করা হয়।



কপার(I) অক্সাইড লাল বর্ণের কঠিন পদার্থ, যা পানিতে অদ্রবণীয়। বাতাসে উত্তপ্ত করলে এটি কপার(II) অক্সাইডে পরিণত হয়।



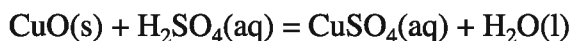
(২) কপার(II) অক্সাইড, CuO : শিল্পক্ষেত্রে কপার চূর্ণকে বাতাসে দীর্ঘক্ষণ উত্তপ্ত করে কপার(II) অক্সাইড উৎপাদন করা হয়।



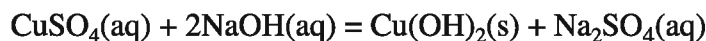
পরীক্ষাগারে কপার(II) কার্বনেট, নাইট্রেট বা হাইড্রোক্সাইডকে উত্তপ্ত করে এ যৌগ তৈরি করা যায়।



কপার(II) অক্সাইড কালো বর্ণের কঠিন পদার্থ, যা পানিতে অদ্রবণীয়। এটি ক্ষারকীয় অক্সাইড; সূত্রাং এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কপার(II) লবণ তৈরি করে।



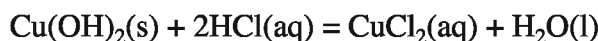
(৩) কপার(II) হাইড্রোক্সাইড, Cu(OH)_2 : কপার(II) লবণের দ্রবণে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণ যোগ করলে কপার(II) হাইড্রোক্সাইডের অধঃক্ষেপ পড়ে।



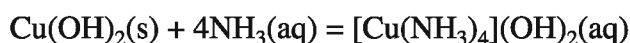
কপার(II) হাইড্রোক্সাইড নীলাভ কঠিন পদার্থ, যা পানিতে অদ্রবণীয়। উত্তপ্ত করে এটি কপার(II) অক্সাইড ও পানিতে বিয়োজিত হয়।



এটি মৃদু ক্ষারকীয় এবং এ কারণে এসিডে দ্রবীভূত হয়ে কপার(II) লবণ তৈরি করে।

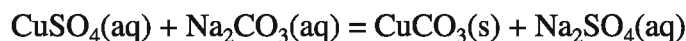


এটি অন্যান্য ক্ষারে অদ্রবণীয় হলেও অ্যামোনিয়া দ্রবণে সহজেই দ্রবীভূত হয়ে গাঢ় নীল বর্ণের টেট্রা-অ্যামিন কপার(II) হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণ তৈরি করে।



টেট্রা-অ্যামিন কপার(II) হাইড্রোক্সাইড রেয়ন উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

(৪) কপার(II) কার্বনেট, CuCO_3 : কপার(II) লবণসমূহের দ্রবণে সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করলে কপার(II) কার্বনেটের অধঃক্ষেপ পড়ে।

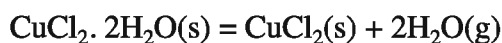


কপার কার্বনেট হালকা সবুজ বর্ণের পাউডার। প্রকৃতিতে ক্ষারীয় কার্বনেট হিসেবে একে পাওয়া যায়। এটি বিভিন্ন এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কপার(II) লবণ, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে।

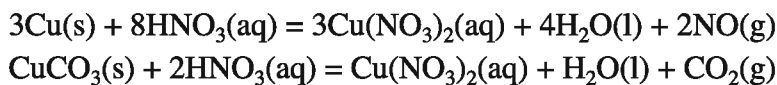
(৫) কপার(II) ক্লোরাইড, CuCl_2 : কপার(II) অক্সাইড, হাইড্রোক্সাইড বা কার্বনেটকে গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিডে দ্রবীভূত করে দ্রবণকে গাঢ় ও শীতল করলে কপার(II) ক্লোরাইড; $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ এর নীলাভ সবুজ স্ফটিক পাওয়া যায়।



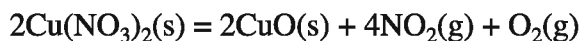
একে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে নিরুদক (dehydrating agent) কপার(II) ক্লোরাইড পাওয়া যায়।



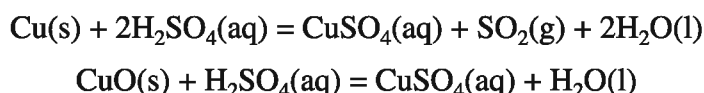
(৬) কপার(II) নাইট্রেট, $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$: কপার ধাতু, কপার(II) অক্সাইড, হাইড্রোক্সাইড বা কার্বনেটকে লঘু নাইট্রিক এসিডে দ্রবীভূত করলে কপার(II) নাইট্রেট উৎপন্ন হয়।



এটি গাঢ় সবুজ বর্ণের পানিগ্রাহী স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ, যা পানি ও অ্যালকোহলে খুব দ্রবণীয়। উত্তপ্ত করলে এটি বিয়োজিত হয়।

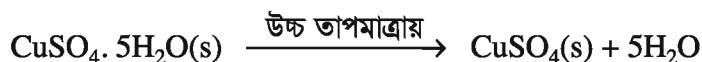


(৭) কপার(II) সালফেট, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$: কপার কুচি গাঢ় সালফিউরিক এসিডের সাথে উত্তপ্ত করে অথবা কপার(II) অক্সাইড, হাইড্রোক্সাইড বা কার্বনেটকে লঘু সালফিউরিক এসিডে দ্রবীভূত করলে কপার(II) সালফেট উৎপন্ন হয়।



বিক্রিয়া মিশ্রণকে গাঢ় করে শীতল করলে নীল রঙের কপার(II) সালফেট পেন্টাহাইড্রেট, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ এর স্ফটিক পাওয়া যায়। একে ব্লু ভিট্রিয়ল বলা হয়। বানিয়া দোকানে এর নাম হচ্ছে তুঁতে।

একে মুক্ত বাতাসে উত্তপ্ত করলে 250°C তাপমাত্রায় পানির সর্বশেষ অণুটিও বিতাড়িত হয় এবং পানিশূন্য কপার(II) সালফেট উৎপন্ন হয়।



পানিশূন্য কপার(II) সালফেট সাদা পাউডার। এটি পানির সংস্পর্শে নীল বর্ণের পেন্টাহাইড্রেটে পরিণত হয়। বৈদ্যুতিক প্রলেপন, কপারের তড়িৎ বিশোধনে এটি ব্যবহৃত হয়। জীবাণু ও কীটনাশক হিসেবে কৃষিতে এবং কাঠ ও চামড়া সংরক্ষণে এর ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে।

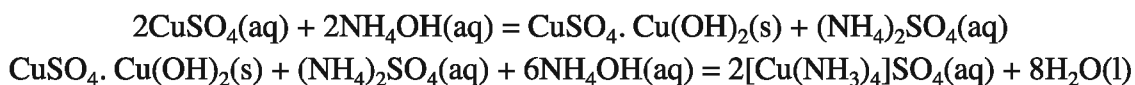
কপার(II) অ্যানায়নের শনাক্তকরণ

(ক) শূষ্ক পরীক্ষা

(১) শিখা পরীক্ষা : ঘন হাইড্রোক্লোরিক এসিড সিক্ত কপার লবণ অনুজ্জ্বল শিখায় প্রবেশ করালে সবুজাভ নীল রং প্রদান করে।

(খ) আর্দ্র পরীক্ষা

(১) কপার(II) লবণের দ্রবণে ধীরে ধীরে অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ করলে প্রথমে হালকা নীল রঙের ক্ষারকীয় লবণের অধঃক্ষেপ পড়ে। অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ করলে ঐ অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত হয়ে গাঢ় নীল রঙের দ্রবণ তৈরি করে।



এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

মৌলসমূহের প্রকারভেদ : ধর্ম অনুযায়ী মৌলসমূহকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়—ধাতু ও অধাতু।

ধাতু : যে মৌল কঠিন ও গলিত উভয় অবস্থায় তড়িৎ পরিবহণ করে তা ধাতু। এদের পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ করে ক্যাটায়ন উৎপন্ন করে।

অধাতু : যে মৌল কঠিন বা অন্য অবস্থায় তড়িৎ পরিবহণ করে না তা অধাতু। কার্বন একমাত্র ব্যতিক্রম। এদের পরমাণু সাধারণত ইলেকট্রন গ্রহণ করে অ্যানায়ন উৎপন্ন করে। অধাতু হয় আয়ন তৈরি করে না অথবা ইলেকট্রন গ্রহণ করেই তা করে।

ধাতুর বৈশিষ্ট্যমূলক ভৌতধর্মসমূহ : ধাতুসমূহ তাপ ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী, এদের বিশেষ দ্যুতি আছে। এরা ঘাতসহ, প্রসারণ ক্ষমতা বেশি। এসকল ধর্মকে পূর্বে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হলেও বর্তমানে রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ধাতুর বৈশিষ্ট্যমূলক রাসায়নিক ধর্মসমূহ : (১) ধাতুর অক্সাইড ক্ষারকীয় এবং পানিতে দ্রবণীয় হলে ক্ষারীয় দ্রবণ উৎপন্ন করে। (২) ধাতুসমূহ এসিডের হাইড্রোজেন আয়নকে প্রতিস্থাপন করতে এবং এভাবে লবণ তৈরি করতে পারে। (৩) ধাতুসমূহ আয়নিক যৌগ উৎপন্ন করে। (৪) ধাতুসমূহ সাধারণত হাইড্রোজেনের সাথে যৌগ গঠন করতে চায় না। (৫) ধাতুসমূহ বিজারক।

অধাতুর বৈশিষ্ট্যমূলক রাসায়নিক ধর্মসমূহ : (১) অধাতুর বৈশিষ্ট্যমূলক অক্সাইড অম্লীয়। অন্য অক্সাইডসমূহ হয় অম্লীয় অথবা নিরপেক্ষ। (২) একটি অধাতু কখনোই একটি এসিডের হাইড্রোজেন আয়নকে প্রতিস্থাপন করে লবণ উৎপন্ন করবে না। (৩) অধাতুসমূহ সমযোজী যৌগ উৎপন্ন করে। (৪) অধাতুসমূহ হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন সমযোজী হাইড্রাইড উৎপন্ন করে। (৫) অধাতুসমূহ জারক।

সক্রিয়তা ক্রম এবং বিভিন্ন ধাতুর ভৌত ও রাসায়নিক সক্রিয়তা : সক্রিয়তা ক্রমে একটি ধাতুর অবস্থান যত উপরে সেটি তত তীব্রভাবে বাতাস, পানি ও এসিডসহ বিভিন্ন বস্তুর সাথে বিক্রিয়া করে। সক্রিয়তা ক্রমে যতই নিচের দিকে যাওয়া যায়, বিক্রিয়ার তীব্রতা তত হ্রাস পায়, এক সময় কোনো বিক্রিয়া হয় না। যেমন পটাসিয়াম সাধারণ তাপমাত্রায় পানির সাথে এত তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে যে আগুন ধরে যায়, সোডিয়াম তার চেয়ে একটু কম তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে। এর নিচের ধাতুগুলো কক্ষ তাপমাত্রায় পানির সাথে বিক্রিয়া করে না। ম্যাগনেসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম কিছুটা উচ্চ তাপমাত্রায় এবং জিংক ও আয়রন লোহিত তপ্ত অবস্থায় পানির সাথে বিক্রিয়া করে। এদের নিচের লেড, কপার প্রভৃতি ধাতু উচ্চ তাপমাত্রায়ও পানির সাথে বিক্রিয়া করে না।

সোডিয়াম রূপালি বর্ণের উজ্জ্বল ধাতু; নরম, পানি অপেক্ষা হালকা, বিদ্যুৎ ও তাপ সুপরিবাহী।

সোডিয়াম খুব ক্রিয়াশীল। এটি একযোজী; সর্বদা আয়নিক যৌগ গঠন করে। উত্তাপে বাতাসে পুড়ে, কক্ষ তাপমাত্রায়ও ধীরে ধীরে বাতাসের সাথে বিক্রিয়া করে, সাধারণ তাপমাত্রায় পানির সাথে তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে; বিভিন্ন অধাতুর সাথে সহজেই যুক্ত হয়, এমনকি উত্তপ্ত অবস্থায় হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে হাইড্রাইড লবণ উৎপন্ন করে। সোডিয়াম শিখা পরীক্ষায় উজ্জ্বল সোনালি হলুদ বর্ণ দেখায়।

পটাসিয়ামের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সোডিয়ামের অনুরূপ। পটাসিয়াম শিখা পরীক্ষায় বেগুনি বর্ণ প্রদর্শন করে।

ক্যালসিয়ামের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সোডিয়ামের মতো, তবে ক্যালসিয়ামের যোজনী ২ হওয়ায় এর যৌগসমূহের সংকেত অন্যরূপ। শিখা পরীক্ষায় ক্যালসিয়াম ইটের ন্যায় লাল বর্ণ দেখায়, যা ক্ষণস্থায়ী।

ম্যাগনেসিয়ামের রাসায়নিক ধর্ম ক্যালসিয়ামের অনুরূপ, তবে তা ক্যালসিয়াম অপেক্ষা কম সক্রিয়। যেমন ম্যাগনেসিয়াম কক্ষমাত্রায় পানির সাথে বিক্রিয়া করে না। ম্যাগনেসিয়াম শিখা পরীক্ষায় কোনো বর্ণ দেখায় না। ম্যাগনেসিয়াম লবণের দ্রবণে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ যোগ করলে সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে। তা থেকে ম্যাগনেসিয়াম আয়নের শনাক্তকরণ হয়।

অ্যালুমিনিয়াম উজ্জ্বল রূপালি বর্ণের ধাতু। ভালো তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী। এর ঘাত সহনশীলতা ও প্রসারণ ক্ষমতা বেশি। রাসায়নিকভাবে এটি মোটামুটি সক্রিয়, তবে এর সক্রিয়তা ম্যাগনেসিয়ামের চেয়ে কিছুটা কম, রাসায়নিক ধর্ম ম্যাগনেসিয়ামের অনুরূপ। এর যোজনী তিন। এটি শিখা পরীক্ষায় কোনো বর্ণ দেখায় না। এর লবণের দ্রবণে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের আঠালো সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে, যা থেকে অ্যালুমিনিয়াম আয়নের শনাক্তকরণ হয়।

জিংক নীলাভ সাদা বর্ণের ধাতু। এটি মধ্যম শক্তিশালী বিজারক। সক্রিয়তা ক্রমে এর অবস্থান অ্যালুমিনিয়ামের নিচে, কিন্তু হাইড্রোজেনের উপরে; সুতরাং এটি মধ্যম সক্রিয়। জিংকের যোজনী ২। রাসায়নিক ধর্ম ম্যাগনেসিয়ামের অনুরূপ। তবে কম সক্রিয়। জিংক লবণের দ্রবণে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করলে জিংক ক্লোরাইডের সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে। এভাবেই জিংক আয়নের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়।

লেড ঈষৎ নীলাভ ধূসর ধাতু, খুব নরম এবং খুব ভারী। বিদ্যুৎ ও তাপ সুপরিবাহী। লেড কম সক্রিয় ধাতু। সক্রিয়তা ক্রমে এর অবস্থান হাইড্রোজেনের ঠিক উপরে। এর যোজনী ২ ও ৪। সাধারণ লবণসমূহে লেডের যোজনী ২, এরা আয়নিক প্রকৃতির। ৪ যোজনী বিশিষ্ট যৌগসমূহ সমযোজী প্রকৃতির। লেড লবণের দ্রবণে পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবণ যোগ করলে হলুদ অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়, যাদের বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্ম বিদ্যমান। তা হতে লেড আয়নের শনাক্তকরণ হয়।

আয়রন বিশুদ্ধ অবস্থায় উজ্জ্বল রূপালি বর্ণের ধাতু। এটি নরম, নমনীয় ও ঘাতসহ। এটি চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং একে চুম্বকে পরিণত করা যায়। তাপ ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী।

আয়রন মধ্যম সক্রিয় ধাতু, সক্রিয়তা ক্রমে এর অবস্থান হাইড্রোজেনের উপরে, তবে অনেক ধাতুর নিচে। এটি পরিবর্তনশীল যোজনী দেখায়। এর যোজনী ২ ও ৩। দ্রবণীয় আয়রন(II) লবণ হালকা সবুজ বর্ণের দ্রবণ তৈরি করে। অপরদিকে দ্রবণীয় আয়রন(III) লবণসমূহ হলুদ বা বাদামি বর্ণের দ্রবণ তৈরি করে। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ যোগ করলে আয়রন(II) যৌগসমূহের দ্রবণ হতে সবুজ বর্ণের আয়রন(II) হাইড্রোক্সাইডের অধঃক্ষেপ পড়ে; কিন্তু আয়রন(III) যৌগসমূহের ক্ষেত্রে লালচে বাদামি বর্ণের আয়রন(III) হাইড্রোক্সাইডের অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়। আয়রন(II) যৌগসমূহকে জারিত করে আয়রন(III) যৌগসমূহ পাওয়া যায়। বিপরীতক্রমে আয়রন(III) যৌগসমূহের বিজারণের মাধ্যমে আয়রন(II) যৌগসমূহ তৈরি করা যায়।

পরীক্ষার আয়রনের খণ্ডকে ঘন নাইট্রিক এসিডে ডুবালে দৃশ্যত কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু খণ্ডের পৃষ্ঠদেশে ট্রাইআয়রন টেট্রাক্সাইডের একটি পাতলা স্তরের সৃষ্টি হয়, যা খণ্ডটিকে বিভিন্ন বিক্রিয়কের সংস্পর্শে আসতে দেয় না। ফলে খণ্ডটি বিভিন্ন বিক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে না। এ অবস্থাকে নিষ্ক্রিয় অবস্থা বলা হয়। খণ্ডটিকে ঘষা দিলে রক্ষাকারী আস্তরণটি দূরীভূত হয়, তখন এ নিষ্ক্রিয় অবস্থাও থাকে না। কপার ধাতুর বর্ণ তামাটে। এটি অত্যন্ত ঘাতসহ ও প্রসার্যতা কম। উচ্চ গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট। খুবই ভাল তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী। কপার কম সক্রিয় ধাতু। সক্রিয়তা ক্রমে এর অবস্থান হাইড্রোজেনের নিচে হওয়ায় এটি পানি ও জারণ ধর্মহীন এসিডসমূহের সাথে বিক্রিয়া করে না। এর যোজনী হচ্ছে ১ ও ২; তবে অধিকাংশ যৌগে যোজনী ২ কার্যকর। কপার(I) যৌগসমূহ সাদা বা লাল রঙের, অপরদিকে কপার(II) যৌগসমূহ সবুজ বা নীল বর্ণের। কপার লবণ শিখা পরীক্ষায় সবুজাভ নীল রং প্রদর্শন করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কক্ষ তাপমাত্রায় পানির সাথে বিক্রিয়ার সময় কোন ধাতুতে আগুন ধরে যায়?

- | | |
|------------------|----------------|
| ক. পটাসিয়াম | খ. ক্যালসিয়াম |
| গ. ম্যাগনেসিয়াম | ঘ. কপার |

২. চুনের সাথে পানি যোগ করলে—

- তাপ উৎপন্ন হয়
- তাপ শোষিত হয়
- কলিচুন উৎপন্ন হয়

কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৩. + HCl = CaCl₂ + H₂O + CO₂

শূন্যস্থানে কোন যৌগটি ব্যবহার করলে সমীকরণটি সঠিক হবে?

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| ক. CaCl ₂ | খ. Na ₂ CO ₃ |
| গ. CaCO ₃ | ঘ. Ca(OH) ₂ |

৪। 2Na + H₂ ———→ 2NaH

উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগে হাইড্রোজেন থাকে—

- ধনাত্মক আয়ন হিসেবে
- ঋনাত্মক আয়ন হিসেবে
- চার্জহীন অবস্থায়

কোনটি সঠিক?

- | | |
|--------|------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. iii | ঘ. i ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

লেড আয়ন শনাক্তকরণের জন্য লেড নাইট্রেট দ্রবণের সাথে পটাসিয়াম আয়োডাইড যোগ করে লেড আয়োডাইডকে অধঃক্ষিপ্ত করা হয়। এ পরীক্ষাটি করার জন্য ০.৫ মোল লেড নাইট্রেট দ্রবণ ৫টি পৃথক পরীক্ষা নলে নেয়া হল। প্রত্যেক পরীক্ষানলে বিভিন্ন আয়তনের ০.৫ মোল পটাসিয়াম আয়োডাইড ০.৫ মি. লি. দাগ কাটা সিরিঞ্জের সাহায্যে যোগ করা হল। পরীক্ষানলগুলো কিছুক্ষণের জন্য স্ট্যান্ডে রাখা হল এবং কিছু সময় পর পর ট্যাপের পানিতে আস্তে আস্তে শীতল করা হল, যাতে অধঃক্ষেপটি ভালোভাবে জমাট বাঁধে। পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল নিচের ছকে দেখানো হল :

	পরীক্ষানল-১	পরীক্ষানল-২	পরীক্ষানল-৩	পরীক্ষানল-৪	পরীক্ষানল-৫
পটাসিয়াম আয়োডাইডের পরিমাণ	৫ মি. লি.	৭.৫ মি. লি.	১০ মি. লি.	১২.৫ মি. লি.	১৫ মি. লি.
অধঃক্ষেপের পুরুত্ব	১. সে. মি.	১.৫ সে. মি.	২ সে. মি.	২ সে. মি.	২ সে. মি.

- লেড নাইট্রেটের সংকেত লেখ।
- এ পরীক্ষায় লেড আয়োডাইডের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
- ০.৫ মোল পটাসিয়াম আয়োডাইডের ভর নির্ণয় করে।
- সারণিতে প্রদত্ত পটাসিয়াম আয়োডাইডের আয়তন এবং অধঃক্ষেপের পুরুত্ব ব্যবহার করে পরীক্ষণের ফলাফল লেখচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

কতিপয় প্রয়োজনীয় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধাতুর রসায়ন

বিষয়বস্তু : কার্বন, সিলিকন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, অক্সিজেন, সালফার এবং হ্যালোজেনসমূহের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার এবং তাদের কিছু যৌগের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার। অজৈব যৌগে ক্লোরাইড, নাইট্রেট, কার্বনেট, সালফেট, সালফাইড এবং অ্যামোনিয়াম আয়নের উপস্থিতির পরীক্ষা।

১৪.১ কার্বন

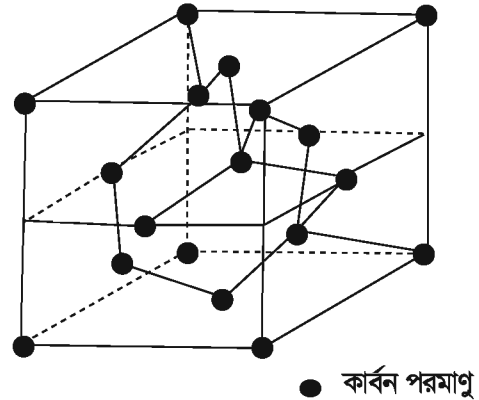
কার্বন মৌলের সংকেত C, এর পারমাণবিক সংখ্যা 6, ইলেকট্রন বিন্যাস 2, 4। এটি গ্রুপ IV এর সদস্য এবং ২য় পর্যায়ে অবস্থিত। এটি একটি অধাতু। কার্বনের সাধারণ যোজনী 4। এটি প্রধানত সমযোজী বন্ধন তৈরি করে। কার্বন খুবই গুরুত্বপূর্ণ মৌল, কেননা সমগ্র প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ প্রধানত এর যৌগসমূহ দ্বারা গঠিত। এছাড়া কার্বন যৌগের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেশি। অন্য সকল মৌল দ্বারা গঠিত যৌগসমূহের সংখ্যার চেয়ে কার্বন যৌগের সংখ্যা বহুগুণ বেশি।

কার্বনের অবস্থান : প্রকৃতিতে কার্বন মুক্ত ও যৌগ উভয় অবস্থাতেই বিদ্যমান। মুক্ত কার্বনের মধ্যে হীরা এবং গ্রাফাইট রয়েছে। কয়লার অধিকাংশই কার্বন যৌগ অবস্থায় কার্বন ডাইঅক্সাইড হিসেবে বায়ুমণ্ডলে, হাইড্রোকার্বন রূপে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসে, বিভিন্ন ধাতুর কার্বনেটরূপে খনিজে এবং জটিল জৈব যৌগরূপে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে বিদ্যমান।

কার্বনের বহুরূপতা : যদি কোনো মৌল ভিন্ন ভিন্ন রূপে থাকতে পারে তখন তার এ ধর্মকে বহুরূপতা বলা হয়। কার্বন একটি বহুরূপী মৌল। এ রূপভেদগুলোর মধ্যে ডায়মন্ড বা হীরা এবং গ্রাফাইট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা স্ফটিকাকার। কার্বনের অন্যান্য উৎস হচ্ছে কয়লা, কাঠ কয়লা, প্রাণিজ কয়লা, কোক কয়লা, ভুসা কয়লা ও গ্যাস কার্বন। এরা অতি ক্ষুদ্র গ্রাফাইট কণা দ্বারা গঠিত।

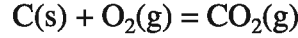
ডায়মন্ড বা হীরার গঠন : হীরকের গঠনে কার্বনের চারটি যোজ্যতাই ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি কার্বন পরমাণু একটি সুষম চতুষ্তলকের কেন্দ্রে অবস্থিত থেকে এর চারদিকে চতুষ্তলকের চারটি কোণে অবস্থিত অপর চারটি কার্বন পরমাণুর সাথে তাদের যোজ্যতা ইলেকট্রনের মাধ্যমে শক্তিশালী সমযোজী বন্ধন সৃষ্টি করে। এভাবে অসংখ্য কার্বন পরমাণু পরস্পরের সাথে বন্ধনযুক্ত হয়ে অতি বৃহৎ একটি অণু তৈরি করে। প্রকৃতপক্ষে এক একটি হীরক খণ্ড এক একটি অতি বৃহৎ অণু। একটি হীরক খণ্ডকে টুকরো করতে হলে অনেকগুলো শক্তিশালী সমযোজী বন্ধন ছিন্ন করতে হয়। এ কারণে হীরক অত্যন্ত শক্ত, প্রকৃতপক্ষে সকল বস্তুর মধ্যে কঠিনতম। গলনে সমযোজী বন্ধন ছিন্ন করতে হয় বলে হীরকের গলনাঙ্ক খুবই বেশি।

হীরকের প্রতিটি কার্বনের সকল যোজ্যতা ইলেকট্রন অপর চারটি কার্বনের সাথে বন্ধন সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়, এ কারণে তাতে কোনো মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না। অতএব হীরক বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না। বিভিন্ন রাসায়নিক বিকারক সহজে ডায়মন্ডকে আক্রমণ করতে পারে



চিত্র ১৪.১ : ডায়মন্ডের গঠন

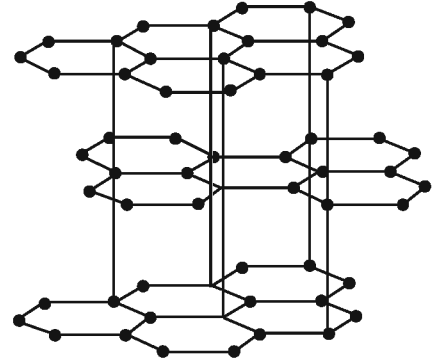
না। যেমন একে বায়ুতে অন্তত 900°C উত্তপ্ত করলে তবেই জারিত হয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে।



হীরকের ব্যবহার : হীরক সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন। এটি গহনা তৈরিতে ও কাচ কাটায় ব্যবহৃত হয়। এছাড়া অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরিতেও হীরক ব্যবহৃত হয়।

গ্রাফাইটের গঠন : গ্রাফাইটে কার্বন পরমাণুসমূহ সমতলীয় স্তরাকারে অবস্থিত। প্রতিটি কার্বন পরমাণু অপর তিনটি কার্বন পরমাণুর সাথে বন্ধন সৃষ্টি করে। আবার ছয়টি কার্বন পরমাণু একটি সুষম ষড়ভুজের সৃষ্টি করে। সুতরাং প্রতিটি স্তরে একটি ষড়ভুজী জালের সৃষ্টি হয়। কার্বন পরমাণুসমূহ এ জালের প্রতিটি কোণে অবস্থিত। এ ধরনের অসংখ্য স্তর পরস্পরের সমান্তরালভাবে অবস্থিত। এ স্তরসমূহের মধ্যে দুর্বল ভ্যান ডার ওয়ালস্ আকর্ষণ শক্তি বিদ্যমান। স্তরসমূহের মধ্যে কোনো রাসায়নিক বন্ধন না থাকায় এরা একে অন্যের উপর দিয়ে চলাচল করতে পারে। এ কারণে গ্রাফাইট নরম ও পিচ্ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে প্রতিটি পরমাণুর চারটি যোজ্যতা ইলেকট্রনের মধ্যে তিনটি ইলেকট্রন তিনটি কার্বন পরমাণুর সাথে বন্ধন সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়। অপর ইলেকট্রনগুলো মোটামুটিভাবে মুক্ত থাকে। এ মুক্ত ইলেকট্রনগুলো গ্রাফাইটের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহণ করে। ফলে গ্রাফাইটই একমাত্র অধাতু যা বিদ্যুৎ সুপরিবাহী।

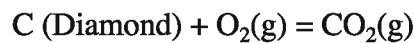
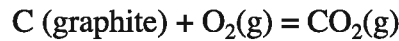
গ্রাফাইটের ধর্ম ও ব্যবহার : গ্রাফাইট গাঢ় ধূসর রঙের কঠিন পদার্থ। এটি নরম ও পিচ্ছিল। এ পিচ্ছিলতার জন্য এবং এর গলনাঙ্ক উচ্চ বলে চূর্ণকরণ যন্ত্রপাতিতে ঘর্ষণ রোধের জন্য গ্রাফাইটকে কঠিন মসৃণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কাগজের উপর একে ঘষলে কালো দাগ পড়ে। এ কারণে কাঠপেন্সিলের সীস হিসেবে গ্রাফাইট ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎ পরিবাহী বলে অনেক বৈদ্যুতিক যন্ত্রে এর ব্যবহার আছে। যেমন বৈদ্যুতিক চুল্লিতে, ল্যাকলেস সেল ও ড্রাই সেলে ইলেকট্রোডরূপে। এছাড়া বিভিন্ন গলিত লবণের তড়িৎ বিশ্লেষণে অ্যানোডে গ্রাফাইট ব্যবহৃত হয়, বিশেষত যখন ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয়। কেননা ক্লোরিন বিভিন্ন ধাতুকে আক্রমণ করে, কিন্তু গ্রাফাইটকে করে না। এছাড়া পারমাণবিক চুল্লিতে মণ্ডরক হিসেবে গ্রাফাইট ব্যবহৃত হয়।



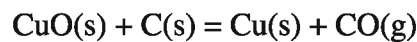
চিত্র ১৪.২ : গ্রাফাইটের গঠন

গ্রাফাইট রাসায়নিকভাবে মোটামুটি নিষ্ক্রিয়। উচ্চ তাপমাত্রায় ($600-700^{\circ}\text{C}$) উত্তপ্ত করলে এটি বাতাসে বা অক্সিজেনে জ্বলে।

ডায়মন্ড ও গ্রাফাইট যে একই মৌলের রূপভেদ, তার প্রমাণ : তোমরা নিশ্চয় ভাবছ গ্রাফাইট ও ডায়মন্ডের ধর্মে এত তফাৎ, অথচ কীভাবে বুঝা যায় যে, এরা একই মৌলের দুইটি রূপভেদ মাত্র। এটি নিম্নরূপে প্রমাণিত হয়। গ্রাফাইট ও ডায়মন্ড উভয়কে অক্সিজেনে পোড়ালে শুধুমাত্র কার্বন ডাইঅক্সাইড পাওয়া যায়।



কার্বন একটি বিজারক : কার্বন একটি অধাতু হলেও এটি বিজারক; কেননা তা অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হতে চায়। সাধারণ তাপমাত্রায় এটি নিষ্ক্রিয় হলেও উচ্চ তাপমাত্রায় এটি জারিত হয়ে কার্বন মনোঅক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। বায়ুর মুক্ত অক্সিজেন ছাড়াও, বিভিন্ন কম সক্রিয় ধাতুর অক্সাইডের সাথে কার্বন বিক্রিয়া করে নিজে জারিত হয় এবং ধাতুর অক্সাইডকে বিজারিত করে ধাতুতে রূপান্তরিত করে।

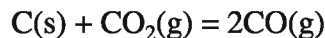


এ ধর্মের কারণে কিছু কম সক্রিয় ধাতুর নিষ্কাশনে কার্বন বিজারণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

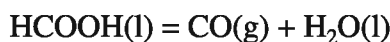
কার্বনের অক্সাইডসমূহ : কার্বনের দুইটি প্রধান অক্সাইড হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড CO এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড CO₂। এ অক্সাইড দুইটিতে কার্বনের যোজনী হচ্ছে যথাক্রমে 2 ও 4।

(ক) কার্বন মনোক্সাইড : প্রস্তুতি

(১) উত্তপ্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডকে কার্বন দ্বারা বিজারিত করলে কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হয়।

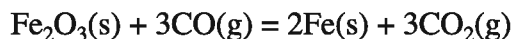


(২) পরীক্ষাগারে মিথানয়িক বা ফরমিক এসিডকে গাঢ় সালফিউরিক এসিডের সাথে মৃদু তাপ দিলে কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে নিরুদক বিক্রিয়া, গাঢ় সালফিউরিক এসিড এখানে নিরুদক হিসেবে কাজ করে।



ধর্ম : কার্বন মনোক্সাইড একটি বর্ণহীন, স্বাদহীন ও গন্ধহীন গ্যাস। এটি নিরপেক্ষ এবং পানিতে খুব কম দ্রবণীয়। এটি বাতাস অপেক্ষা ঈষৎ হাল্কা।

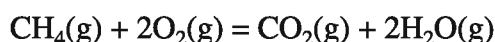
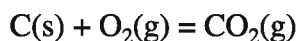
এটি বাতাসে নীল শিখাসহ জ্বলে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে। এটিই এ গ্যাসের শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু এ যৌগ অন্যান্য যৌগ হতে সহজেই অক্সিজেন দূরীভূত করে, সেহেতু এটি একটি বিজারক। এটি অনেক ধাতুর অক্সাইডকে বিজারিত করে ধাতুতে পরিণত করে এবং সে সময় নিজে কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়।



কার্বন মনোক্সাইড খুবই বিষাক্ত। রক্তে লাল হিমোগ্লোবিন বিদ্যমান, যা শ্বাস গ্রহণের সময় অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সি-হিমোগ্লোবিনে রূপান্তরিত হয়। এটি রক্তের সাথে শরীরের বিভিন্ন অংশে যায় এবং তাদেরকে অক্সিজেন সরবরাহ করে। শ্বাসের সাথে কার্বন মনোক্সাইড ফুসফুসে উপস্থিত হলে তা হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে কার্বোক্সি-হিমোগ্লোবিন উৎপন্ন করে, যা রক্তে অক্সিজেন শোষিত হওয়া বন্ধ করে। যে ব্যক্তি শ্বাসের সংগে কার্বন মনোক্সাইড গ্রহণ করে সে শীঘ্র অসুস্থ হয়ে পড়ে, এমনকি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কার্বন ডাইঅক্সাইড : বাতাসে সামান্য পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বিদ্যমান। তবে পরিমাণ কম হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা উদ্ভিদে সালোক সংশ্লেষণের জন্য এটি অতীব প্রয়োজনীয়। বস্তুতপক্ষে এর মাধ্যমেই কার্বন চক্র চলে। এছাড়া বিভিন্ন খনিজে এটি কার্বনেট হিসেবে বিদ্যমান।

প্রস্তুতি : (১) কার্বনকে এবং বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন জৈব যৌগকে পর্যাপ্ত বাতাসে পোড়ালে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।



(২) বিভিন্ন কার্বনেটকে উত্তপ্ত করলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়।

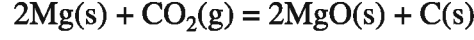


(৩) পরীক্ষাগারে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সাথে লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় এ গ্যাস তৈরি করা হয়।

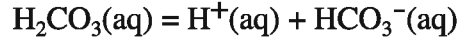
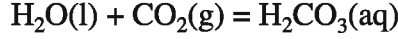


ভৌত ধর্ম : কার্বন ডাইঅক্সাইড বর্ণহীন, মৃদু গন্ধযুক্ত ও অস্বাদ বিশিষ্ট গ্যাস। এটি পানিতে অল্প দ্রবণীয়। চাপ প্রয়োগে একে সহজে তরলে পরিণত করা যায়। তরল কার্বন ডাইঅক্সাইডকে দ্রুত বাষ্পায়িত করতে গেলে এর কিছু অংশ জমে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। একে শুষ্ক বরফ (dry ice) বলা হয়। এটি বিষাক্ত নয়, তবে কোনো স্থানে বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড জমে থাকলে সেখানে অক্সিজেনের অভাবে মানুষের প্রাণহানি হতে পারে। যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাস অপেক্ষা ভারী বলে গুহা বা পুরানো কুয়ায় সঞ্চিত হতে থাকে। এসব স্থানে প্রবেশ করলে অক্সিজেনের অভাবে প্রাণহানি ঘটে।

রাসায়নিক ধর্ম : (১) কার্বন ডাইঅক্সাইড সুস্থিত যৌগ, যা সহজে বিয়োজিত হয় না। এ কারণে এটি সাধারণ বস্তুসমূহের দহনে সাহায্য করে না, নিজেও জ্বলে না। তবে কয়েকটি অতি সক্রিয় ধাতু যেমন পটাসিয়াম, সোডিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম জ্বলন্ত অবস্থায় এ গ্যাসে প্রবেশ করালে তারা জ্বলতে থাকে এবং কার্বনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা নির্গত হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বনের একটি যৌগ।

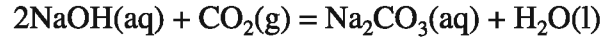


(২) কার্বন ডাইঅক্সাইড অম্লধর্মী, এটি পানিতে দ্রবীভূত হয়ে দুর্বল কার্বনিক এসিড তৈরি করে; ফলে এ গ্যাসের দ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল করে।

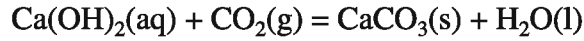


এ এসিডটি স্থিতিশীল নয়, দ্রবণেই শুধু এর অস্তিত্ব আছে; একে বিশুদ্ধভাবে পৃথক করা যায় না। তবে এর লবণসমূহ স্থিতিশীল এবং ধাতুর কার্বনেট হিসেবে প্রকৃতিতে বিদ্যমান।

অম্লীয় হওয়ার কারণে এ গ্যাস ক্ষার ও ক্ষারীয় অক্সাইড দ্বারা শোষিত হয়।



(৩) এ গ্যাসকে পরিষ্কার চূনের পানি অর্থাৎ ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণের মধ্য দিয়ে চালনা করলে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের অধঃক্ষেপ সৃষ্টির কারণে ঘোলাটে হয়।



অতিরিক্ত গ্যাস চালনা করলে ঘোলাটে মিশ্রণটি আবার স্বচ্ছ হয়ে যায়। এ সময় অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেটে পরিণত হয়।



এটি কার্বন ডাইঅক্সাইডের শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়।

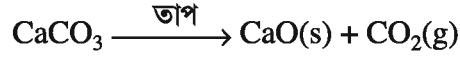
ব্যবহার : (১) কার্বন ডাইঅক্সাইড নিজে দাহ্য নয় এবং সাধারণভাবে অপরকে দহনে সাহায্য করে না বলে অগ্নিনির্বাপক হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

(২) মৃদু পানীয় তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়। তোমরা কোকাকোলা, পেপসিকোলা প্রভৃতির বোতলের মুখ খুললে গ্যাসের বুদবুদ তৈরি হতে দেখ। এ বুদবুদ হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের। এসকল পানীয় তৈরির সময় এ গ্যাসকে অতিরিক্ত চাপ দিয়ে পানিতে অধিক পরিমাণে দ্রবীভূত করা হয় এবং সে অবস্থাতেই বোতলের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বোতলের মুখ খুললে উপরের চাপ কমে বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান হয়, ফলে পানিতে এ গ্যাসের দ্রবণীয়তা হ্রাস পায়। তাই এ গ্যাস বুদবুদ আকারে বের হতে থাকে।

(৩) এটি কাপড় ধোয়ার সোডা ও খাওয়ার সোডা প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

(৪) কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড বা শুষ্ক বরফ শীতলকারক হিসেবে এবং নাট্যক্ষেত্রে ধোঁয়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

কার্বনেটসমূহ : পূর্বেই বলা হয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত হয়ে একটি অস্থিতিশীল যৌগ গঠন করে, যা কার্বনিক এসিড নামে পরিচিত। এটি একটি অতি দুর্বল এসিড। এ এসিডের হাইড্রোজেনকে ধাতু পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত করলে যে লবণসমূহ সৃষ্টি হয়, তাদেরকে কার্বনেট বলা হয়। এদের মধ্যে পটাসিয়াম ও সোডিয়াম কার্বনেট পানিতে দ্রবণীয় এবং উদ্ভাপেও বিয়োজিত হয় না। ক্ষার ধাতু ব্যতীত অন্যান্য ধাতুসমূহের কার্বনেট পানিতে অদ্রবণীয় এবং উদ্ভাপে ধাতুর অক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইডে বিয়োজিত হয়।



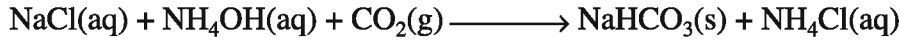
অ্যামোনিয়াম কার্বনেট ক্ষার ধাতুর কার্বনেটসমূহের ন্যায় পানিতে দ্রবণীয়, তবে সকল অ্যামোনিয়াম লবণের ন্যায় বিয়োজিত হয়।

সকল কার্বনেট এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে।

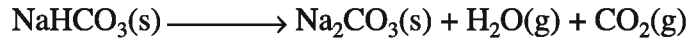


চুনের পানির সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে শনাক্ত করা যায় (ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে)। এভাবেই কোনো অজৈব লবণের নমুনায় কার্বনেট মূলকের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে জানা যায়।

সোডিয়াম কার্বনেট, Na_2CO_3 : শিল্পক্ষেত্রে সলভে পদ্ধতিতে সোডিয়াম কার্বনেট উৎপাদন করা হয়। সাধারণ লবণের খুব ঘন দ্রবণ অ্যামোনিয়া গ্যাস দ্বারা সম্পৃক্ত করা হয় এবং এরপর এর ভেতর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা করা হয়। এভাবে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট উৎপাদিত হয়, যা খুব দ্রবণীয় নয় বলে অধঃক্ষিপ্ত হয়।

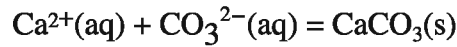


এ অধঃক্ষেপকে পরিস্রাবণের মাধ্যমে পৃথক করে উত্তপ্ত করলে অনার্দ্র সোডিয়াম কার্বনেট তৈরি হয়।



সোডিয়াম কার্বনেটের ব্যবহার : (১) **কাচ প্রস্তুতিতে :** সোডিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সিলিকা এবং অল্প পরিমাণ কার্বনের মিশ্রণকে উত্তপ্ত করে সাধারণ কাচ তৈরি করা হয়।

(২) **পানির খরতা দূরীকরণে :** পানির খরতার মূল কারণ হচ্ছে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়নের উপস্থিতি। সোডিয়াম কার্বনেট যোগে এরা অদ্রবণীয় কার্বনেট হিসেবে অধঃক্ষিপ্ত হয়।



(৩) **কাপড় ধোয়ার কাজে :** আর্দ্র সোডিয়াম কার্বনেট বাজারে কাপড় ধোয়ার সোডা নামে পরিচিত। বেশি ময়লা কাপড় চোপড় ধোয়ার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

ক্যালসিয়াম কার্বনেট, CaCO_3 : প্রকৃতিতে এটি চুনাপাথর, মার্বেল পাথর, চক ও অন্যান্যরূপে বিদ্যমান। পরীক্ষাগারে ক্যালসিয়াম লবণের সাথে সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করে এটি তৈরি করা যায়।



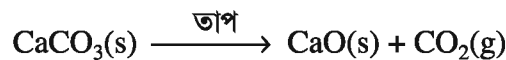
প্রকৃতিতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় বলে এটির শিল্পোৎপাদনের প্রয়োজন নেই। অন্যান্য সকল কার্বনেটের ন্যায় এটি এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে, সাথে ক্যালসিয়াম লবণ উৎপন্ন হয়।



যদিও বিশুদ্ধ পানিতে অদ্রবণীয়, এটি কার্বন ডাইঅক্সাইড মিশ্রিত পানিতে দ্রবীভূত হয়। তখন দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট উৎপন্ন হয়।

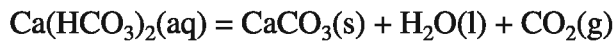


উদ্ভাপে এটি বিয়োজিত হয়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা কলিচুন উৎপন্ন করে।

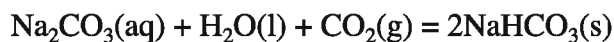


সিমেন্ট, চুন, কাচ, ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রভৃতির উৎপাদনে এবং ধাতু নিষ্কাশনে বিগলক হিসেবে চুনাপাথররূপী ক্যালসিয়াম কার্বনেট ব্যবহৃত হয়। মার্বেল পাথররূপে অট্টালিকা, ভাস্কর্য প্রভৃতি নির্মাণে, কড়িমাটিরূপে রং, চক ও দাঁতের মাজন তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।

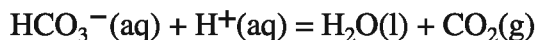
হাইড্রোজেন কার্বনেটসমূহ : কার্বনিক এসিডের অণু হতে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু ধাতু পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে হাইড্রোজেন-কার্বনেটসমূহ উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন-কার্বনেটসমূহ অস্থিতিশীল; উত্তাপে সহজেই বিয়োজিত হয়ে কার্বনেট উৎপন্ন করে। অনেক ধাতুর হাইড্রোজেন-কার্বনেটসমূহ এত অস্থিতিশীল যে তাদের পৃথক করে শনাক্ত করা যায় না।



সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট, NaHCO_3 : সলভে পদ্ধতিতে এটি প্রথমে উৎপাদিত হয়, পরে একে বিয়োজিত করেই সোডিয়াম কার্বনেট তৈরি করা হয়। বিপরীতক্রমে সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা করে একে তৈরি করা যায়।



লঘু এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় অন্যান্য হাইড্রোজেন কার্বনেটের ন্যায় এটি কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত করে।

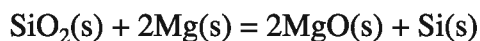


এটি বাজারে খাবার সোডা নামে পরিচিত। বেকিং পাউডারের একটি উপাদান হিসেবে এটি বেকারিতে ব্যবহৃত হয়।

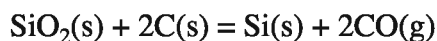
১৪.২ সিলিকন (Silicon)

সিলিকন মৌলের সংকেত Si, এর পারমাণবিক সংখ্যা 14, ইলেকট্রন বিন্যাস 2, 8, 4। সিলিকন গ্রুপ IV এর সদস্য এবং তৃতীয় পর্যায়ে এর অবস্থান। এর যোজনী 4। প্রাচুর্যের দিক হতে অক্সিজেনের পরেই সিলিকনের স্থান। একে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। অক্সিজেনের প্রতি এর বিশেষ আসক্তির কারণে এর অক্সাইড যৌগসমূহ পাওয়া যায়। ধাতুর সিলিকেট হিসেবে সকল ধরনের প্রস্তরখণ্ডে এটি বিদ্যমান। কাদামাটির প্রধান উপাদান হচ্ছে বিভিন্ন অ্যালুমিনোসিলিকেট। বালুর প্রধান উপাদান সিলিকন ডাইঅক্সাইড (সিলিকা)।

প্রস্তুতি : (১) শুষ্ক সিলিকা কণাকে ম্যাগনেসিয়াম গুঁড়ার সাথে মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে সিলিকন পাওয়া যায়।



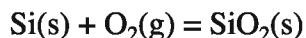
(২) শিল্পক্ষেত্রে সিলিকা ও কোকচূর্ণকে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে উত্তপ্ত করে দানাদার সিলিকন তৈরি করা হয়।



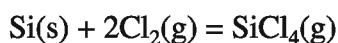
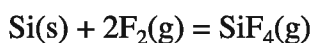
ভৌতধর্ম : সিলিকনের দুইটি রূপভেদ আছে। যথা : (ক) দানাদার (খ) অদানাদার।

(ক) দানাদার সিলিকন হালকা ধূসর বর্ণের এবং এর কিছুটা ধাতব দ্যুতি আছে। (খ) অদানাদার সিলিকন ঘন বাদামি বর্ণের পানিগ্রাসী পাউডার।

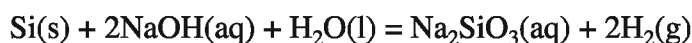
রাসায়নিক ধর্ম : (১) সিলিকন নিষ্ক্রিয় ধরনের মৌল; তবে বাতাস বা অক্সিজেনে সিলিকনকে উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে এটি পুড়ে সিলিকা উৎপন্ন করে।



(২) সাধারণ তাপমাত্রায় এটি ফ্লোরিনের সাথে এবং উচ্চ তাপমাত্রায় ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে SiF_4 ও SiCl_4 উৎপন্ন করে।



(৩) গলিত ও উত্তপ্ত জলীয় ক্ষারে এটি দ্রবীভূত হয়ে সিলিকেট ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।



ব্যবহার : কয়েক ধরনের ইস্পাত ও ব্রোঞ্জ নির্মাণে এবং সিলিকোন (silicones) নামক জৈব সিলিকন যৌগ প্রস্তুতিতে এবং ট্রানসিস্টার ও মাইক্রোচিপস্ তৈরিতে সিলিকন ব্যবহৃত হয়।

কার্বন ও সিলিকনের তুলনা

সাদৃশ্য

- (১) কার্বন ও সিলিকন উভয়েই অধাতু।
- (২) IV শ্রেণীর মৌল হওয়ার কারণে উভয়ের সর্ববহিঃস্থ শেলে চারটি ইলেকট্রন থাকায় এদের রাসায়নিক ধর্মে যথেষ্ট মিল আছে। যেমন এদের যোজনী চার এবং সাধারণত সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে এরা যৌগ গঠন করে। ফলে এদের হ্যালাইড, হাইড্রাইড প্রভৃতি যৌগ অনুরূপ। যেমন- CH_4 ও SiH_4 , CCl_4 ও SiCl_4
- (৩) উভয় মৌলের বহুরূপতা আছে।
- (৪) লঘু এসিডে উভয় মৌলই অদ্রবণীয়।
- (৫) উভয় মৌলই সাধারণ তাপমাত্রায় সক্রিয় নয়।
- (৬) উভয় মৌলই উত্তম অবস্থায় অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে অক্সাইড উৎপন্ন করে। এদের স্বাভাবিক অক্সাইড হচ্ছে যথাক্রমে CO_2 ও SiO_2 । উভয় অক্সাইডই অম্লধর্মী এবং এরা ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।

বৈসাদৃশ্য

- (১) কার্বন-কার্বন বন্ধনের মাধ্যমে শিকল যৌগ বা বৃহৎ অণু গঠন করার প্রবণতা কার্বনের খুব বেশি; কিন্তু সিলিকনের এরূপ ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ।
- (২) কার্বন পরমাণু অন্য কার্বন পরমাণুর সাথে একক বন্ধন ছাড়াও স্থিতিশীল দ্বিবন্ধন ও ত্রিবন্ধন সৃষ্টি করে; যেমন $\text{CH}_2=\text{CH}_2$, $\text{CH}\equiv\text{CH}$ প্রভৃতি। সিলিকনের এ ধরনের ক্ষমতা নেই।
- (৩) কার্বন ডাইঅক্সাইড একটি একক অণু; ফলে এটি সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাসীয়। অপরদিকে SiO_2 একটি উচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট কঠিন যৌগ।
- (৪) কার্বনের হ্যালাইড ও হাইড্রাইডসমূহ খুব স্থিতিশীল; অপরদিকে সিলিকনের এ যৌগসমূহ সহজেই আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়।
- (৫) সিলিকনের তুলনায় কার্বনের গলনাঙ্ক অস্বাভাবিকভাবে বেশি।
- (৬) কার্বনের একটি বহুরূপ গ্রাফাইট, বিদ্যুৎ সুপরিবাহী। সিলিকন বিদ্যুৎ অর্ধপরিবাহী।

সিলিকন ডাইঅক্সাইড বা সিলিকা, SiO_2

সিলিকার গঠন : প্রতিটি সিলিকন পরমাণু চতুস্তলকীয়ভাবে চারটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে একক সমযোজী বন্ধন দ্বারা যুক্ত। প্রতিটি অক্সিজেন পরমাণু দুইটি সিলিকন পরমাণুর সাথে যুক্ত। এভাবে অতি বৃহৎ একটি অণুর সৃষ্টি হয়। বৃহদাকার অণু হওয়ার কারণে সিলিকার গলনাঙ্ক এত বেশি।

ধর্ম ও ব্যবহার : প্রকৃতিতে সিলিকা বালু ও কোয়ার্টজরূপে বিদ্যমান। কোয়ার্টজ সিলিকার বিশুদ্ধ রূপ, এর গলনাঙ্ক (1600°C উপরে) সাধারণ কাচের অনেক উপরে এবং এটি বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয় না বলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাচের যন্ত্রপাতির বদলে কোয়ার্টজের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়।

সিলিকা জেল সহজেই জলীয় বাষ্প শোষণ করে। গ্যাস শুষ্ক করার জন্য এবং প্রভাবক হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। জলীয় বাষ্প শোষণ করার পর একে উত্তপ্ত করলে এটি জলীয় বাষ্প ছেড়ে দেয়, তখন একে আবার জলীয় বাষ্প শোষণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। পেট্রোলিয়াম হতে সালফার যৌগ দূরীকরণেও এটি ব্যবহৃত হয়।

সিলিকা বা বালু উচ্চ তাপমাত্রায় স্কার ও মৃৎক্ষার ধাতুসমূহের অক্সাইড, হাইড্রোক্সাইড ও কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া করে কাচ উৎপন্ন করে। সুতরাং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাচ উৎপন্ন করতে বালুকে এভাবে ব্যবহার করা হয়।

সিলিকেটসমূহ : ধাতু অক্সাইড ও সিলিকা যুক্ত হয়ে যে সকল যৌগ গঠন করে, তাদেরকে সিলিকেট বলা হয়। প্রকৃতিতে অনেক খনিজ সিলিকেট বিদ্যমান।

কাচ : আমরা যে কাচ দেখি, তা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সিলিকেটের মিশ্রণ। সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সাথে বালির বিক্রিয়ার মাধ্যমে সাধারণ কাচ উৎপাদন করা হয়।

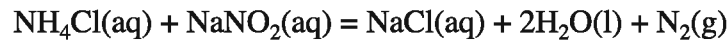
বিভিন্ন ধাতু ও অন্যান্য যৌগ মিশ্রিত করে বিভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট কাচ তৈরি করা হয়। যেমন লেড অক্সাইড মিশ্রিত করে উপরিউক্ত বিক্রিয়া করলে সাথে সাথে লেড সিলিকেটও উৎপন্ন হয়। উচ্চ আলোক প্রতিসরণ ক্ষমতার কারণে এ কাচ লেন্স তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বোরন অক্সাইড যোগ করা হলে বোরো সিলিকেট গ্লাস তৈরি হয়, যা উন্নত মানের ব্যুরেট, পিপেট ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন অবস্থান্তর ধাতুর অক্সাইড যোগ করলে রঙিন কাচ পাওয়া যায়। যেমন কোবাল্ট হতে নীল কাচ, ক্রোমিয়াম হতে সবুজ কাচ পাওয়া যায়।

১৪.৩ নাইট্রোজেন

নাইট্রোজেন মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ৭। এর ইলেকট্রন বিন্যাস ২, ৫। পর্যায় সারণিতে এর অবস্থান ২য় পর্যায়ে গ্রুপে V এ। নাইট্রোজেনের যোজনী ৩ ও ৫।

অবস্থান : বাতাসে ৭৮% হচ্ছে নাইট্রোজেন, যা মৌলিক অবস্থায় আছে। এ ছাড়া নাইট্রোজেনের অনেক যৌগ প্রচুর পরিমাণে প্রকৃতিতে বিদ্যমান।

প্রস্তুতি : (১) পরীক্ষাগারে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম নাইট্রাইডের ১:১ আণবিক অনুপাতের মিশ্রণে গাঢ় দ্রবণকে উত্তপ্ত করে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন উৎপন্ন করা হয়।



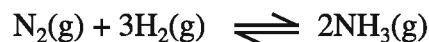
(২) বাণিজ্যিকভাবে বাতাস হতে নাইট্রোজেনকে পৃথক করা হয়। এ উদ্দেশ্যে বায়ুকে ঠান্ডা করে তরল করা হয়। বাতাসের দুইটি প্রধান উপাদান হচ্ছে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। তরল বাতাসকে আংশিক পাতন করলে প্রথমে অধিকতর উদ্বায়ী নাইট্রোজেন বাষ্পীভূত হয় এবং অক্সিজেন তরল অবস্থায় থেকে যায়। এভাবে উভয় মৌলকে পরস্পর হতে পৃথক করা যায়। বস্তুতপক্ষে যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে অক্সিজেন উৎপাদন করা হয় সেখানেই নাইট্রোজেন একটি সহ-উৎপাদ হিসেবে পাওয়া যায়।

ভৌত ধর্ম : নাইট্রোজেন বর্ণহীন, স্বাদহীন ও গন্ধহীন গ্যাস। এটি পানিতে খুব অল্প মাত্রায় দ্রবীভূত হয়।

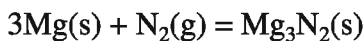
রাসায়নিক ধর্ম : নাইট্রোজেন অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এর কারণ হচ্ছে নাইট্রোজেনের অণুতে দুইটি নাইট্রোজেন পরমাণু অত্যন্ত শক্তিশালী সমযোজী ত্রি-বন্ধনী দ্বারা যুক্ত। নাইট্রোজেন অণুর গঠন হচ্ছে $\text{N} \equiv \text{N}$ ।

নাইট্রোজেন নিজে দাহ্য নয় এবং অন্যের দহনে সাহায্য করে না। কক্ষ তাপমাত্রায় নাইট্রোজেন কোনো বিক্রিয়া না করলেও উচ্চ তাপমাত্রায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

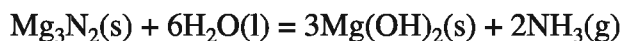
(১) উচ্চ তাপমাত্রায় ও উচ্চ চাপে নাইট্রোজেন হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে।



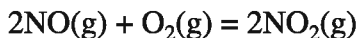
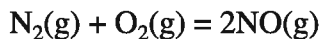
(২) উচ্চ তাপমাত্রায় এটি কিছু সক্রিয় ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে নাইট্রাইড যৌগ উৎপন্ন করে।



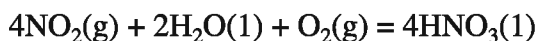
এ সকল নাইট্রাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে।



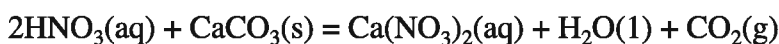
(৩) বিদ্যুৎ স্ফুলিজের উচ্চ তাপমাত্রায় নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ উৎপন্ন করে।



এখানে উল্লেখ্য যে, আকাশে বিদ্যুৎ ক্ষরণের ফলে এভাবে নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ তৈরি হয়, যা পানির সাথে মিশে নাইট্রিক এসিড উৎপন্ন করে।



এ নাইট্রিক এসিড বৃষ্টির পানির সাথে মিশে মাটিতে পতিত হয় এবং জমির ক্ষারীয় উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন করে।



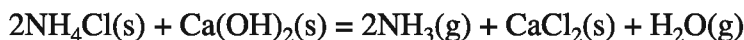
উদ্ভিদ এ নাইট্রেট গ্রহণ করে প্রোটিনে রূপান্তরিত করে, যা প্রাণী সকল গ্রহণ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন অবসানের পর পচন ক্রিয়ায় প্রোটিনের কিছু অংশ নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। এভাবে প্রকৃতিতে “নাইট্রোজেন চক্র” চলে।

ব্যবহার : অ্যামোনিয়া, নাইট্রিক এসিড এবং ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রভৃতি সার উৎপাদনে নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রোজেনের যৌগসমূহ

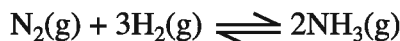
অ্যামোনিয়া

প্রস্তুতি : (১) পরীক্ষাগারে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাথে চুন বা সোডা লাইম উত্তপ্ত করে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করা হয়।



(২) 450 – 500°C তাপমাত্রায় 200 atm চাপে লৌহচূর্ণ প্রভাবকের উপস্থিতিতে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যামোনিয়ার বাণিজ্যিক উৎপাদন করা হয়।

(নবম অধ্যায়ে লা শাতেলিয়ে নীতির প্রয়োগ দেখ)।



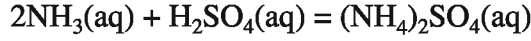
ভৌত ধর্ম : অ্যামোনিয়া ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস। এতে চাপ ও শৈত্য প্রয়োগে সহজে তরল করা যায়। এটি পানিতে খুব দ্রবণীয়।

রাসায়নিক ধর্ম : (১) অ্যামোনিয়া ক্ষারধর্মী। যেমন এটির জলীয় দ্রবণ লাল লিটমাসকে নীল করে। জলীয় দ্রবণে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া হয়, হাইড্রোক্সাইড আয়ন তৈরি হওয়ায় ক্ষারধর্ম প্রদর্শিত হয়।



এ কারণে অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণকে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড বলা হয়। ক্ষারধর্মের কারণে অ্যামোনিয়া গ্যাস ও এর জলীয় দ্রবণ সকল এসিডের সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়াম লবণ তৈরি করে।



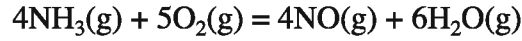


এসিড উদ্বায়ী হলে, যেমন HCl এর ক্ষেত্রে সাদা ধোঁয়া হিসেবে অ্যামোনিয়াম লবণ তৈরি হয়।

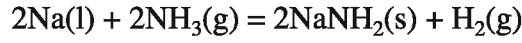
(২) সাধারণ অবস্থায় অ্যামোনিয়া বিজারক হিসেবে ক্রিয়া না করলেও উচ্চ তাপমাত্রায় করে। যেমন উত্তপ্ত কপার অক্সাইডকে এটি কপার ধাতুতে বিজারিত করে এবং নিজে নাইট্রোজেনে জারিত হয়।



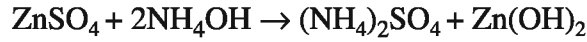
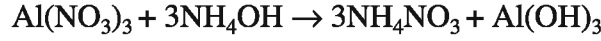
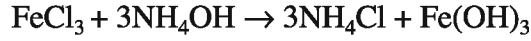
(৩) অ্যামোনিয়াকে বাতাস বা অক্সিজেনের সাথে মিশিয়ে উত্তপ্ত প্লাটিনাম-জালি ও প্রভাবকের উপর দিয়ে চালনা করলে এটি জারিত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। নাইট্রিক এসিডের শিল্প উৎপাদন এ বিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।



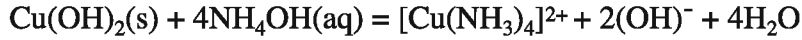
(৪) উত্তপ্ত সোডিয়াম ধাতুর উপর দিয়ে শুষ্ক অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রবাহিত করলে সোডামাইড উৎপন্ন হয়।



(৫) অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ OH^- আয়ন তৈরি করে বলে তা অনেক ধাতুর লবণের জলীয় দ্রবণ হতে সে ধাতুর হাইড্রোক্সাইডকে অধঃক্ষিপ্ত করে।



কোনো কোনো ধাতুর হাইড্রোক্সাইড জটিল যৌগ গঠনের মাধ্যমে অতিরিক্ত অ্যামোনিয়াতে দ্রবীভূত হয়।

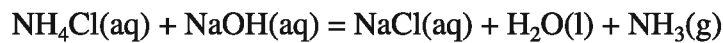


শনাক্তকরণ : বিশিষ্ট ঝাঁঝালো গন্ধ দ্বারা অ্যামোনিয়া সহজেই শনাক্ত করা যায়। গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে এটি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি করে; তা দ্বারাও একে শনাক্ত করা যায়।

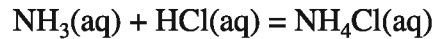
ব্যবহার : (১) সলভে পদ্ধতিতে সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুতিতে অ্যামোনিয়া ব্যবহৃত হয়। (২) শিল্পক্ষেত্রে নাইট্রিক এসিড তৈরিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়ার প্রয়োজন হয়। (৩) ইউরিয়া, বিভিন্ন অ্যামোনিয়াম লবণ ও সার প্রস্তুতিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া ব্যবহৃত হয়।

অ্যামোনিয়াম লবণসমূহ : অ্যামোনিয়া বিভিন্ন এসিডের সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়াম লবণ উৎপন্ন করে। এ সকল লবণে অ্যামোনিয়াম মূলক একযোজী ক্যাটায়ন, NH_4^+ হিসেবে থাকে। সকল অ্যামোনিয়াম লবণ পানিতে দ্রবণীয়।

অ্যামোনিয়াম লবণের পরীক্ষা : যে কোনো অ্যামোনিয়াম লবণের সাথে ক্ষার যোগ করলে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়, যা এর ঝাঁঝালো গন্ধ, গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে সাদা ধোঁয়া উৎপাদন করা থেকে শনাক্ত করা যায়।

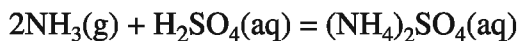


অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, NH_4Cl : অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।



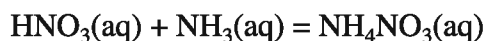
সলভে পদ্ধতিতে সোডিয়াম কার্বনেট তৈরিতে সহ-উৎপাদ হিসেবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপাদিত হয়। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সাদা দানাদার পদার্থ। ল্যাবরেটরিতে বিকারক হিসেবে, লেকলেস ও ড্রাই সেল তৈরিতে এবং বিভিন্ন শিল্পে এটি ব্যবহৃত হয়।

অ্যামোনিয়াম সালফেট; $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$: সালফিউরিক এসিডের সাথে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়ায় এ যৌগ উৎপন্ন হয়।

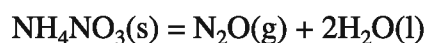


এটি সাদা দানাদার পদার্থ। এটি নাইট্রোজেন যুক্ত সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট; NH_4NO_3 : নাইট্রিক এসিডের সাথে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উৎপন্ন করা হয়।



অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট পানিতে খুব দ্রবণীয়। এটিকে উত্তপ্ত করলে বিযোজিত হয়ে নাইট্রোজেন(I) অক্সাইড বা নাইট্রাস অক্সাইড তৈরি করে।



অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ : নাইট্রোজেনের বেশ কয়েকটি অক্সাইড আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—

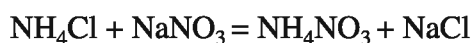
(১) নাইট্রাস অক্সাইড, N_2O

(২) নাইট্রিক অক্সাইড, NO

(৩) নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, NO_2

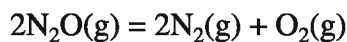
নাইট্রাস অক্সাইড, N_2O

প্রস্তুতি : (১) সোডিয়াম নাইট্রেট ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় দ্রবণকে উত্তপ্ত করলে N_2O পাওয়া যায়।

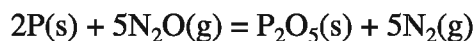
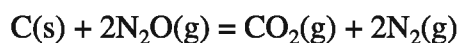


ভৌত ধর্ম : নাইট্রাস অক্সাইড বর্ণহীন গ্যাস। এর মৃদু মিষ্টি গন্ধ আছে। নিঃশ্বাসের সাথে অল্প পরিমাণে গ্রহণ করলে এটি হাসির উদ্বেক করে। এ জন্য একে লারিং গ্যাস (Laughing gas) বলা হয়।

রাসায়নিক ধর্ম : নাইট্রাস অক্সাইড কক্ষ তাপমাত্রায় খুবই নিষ্ক্রিয়; এ অবস্থায় তা প্রায় কোনো কিছুর সাথে বিক্রিয়া করে না; কিন্তু উচ্চ তাপমাত্রায় এটি বিশেষ ক্রিয়াশীল। উত্তাপে এটি নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনে বিযোজিত হয়।



এ অক্সিজেনই বিভিন্ন পদার্থের দহনে সাহায্য করে :

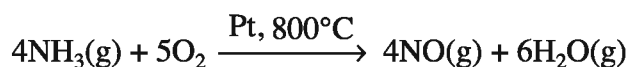


নাইট্রিক অক্সাইড, NO

প্রস্তুতি : (১) পরীক্ষাগারে কপার কুটির সাথে মধ্যম গাঢ় নাইট্রিক এসিডের বিক্রিয়ায় নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করা হয় :

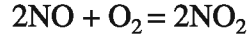


(২) শিল্পক্ষেত্রে প্লাটিনাম প্রভাবকের উপস্থিতিতে অ্যামোনিয়ার জারণ দ্বারা NO উৎপাদিত হয় :



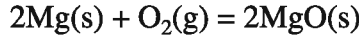
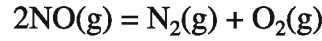
ভৌত ধর্ম : নাইট্রিক অক্সাইড একটি বর্ণহীন গ্যাস, যা পানিতে খুব অল্প মাত্রায় দ্রবণীয়।

রাসায়নিক ধর্ম : (১) নাইট্রিক অক্সাইড বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসলেই বাদামি বর্ণের NO_2 -এ পরিণত হয়।



নাইট্রিক অক্সাইড ফেরাস সালফেট দ্রবণে সহজে শোষিত হয়ে বাদামি বর্ণের নাইট্রোসোফেরাস সালফেট তৈরি করে।

(২) নাইট্রিক অক্সাইড নিজে জ্বলে না এবং সাধারণত অপরের দহনেও সহায়তা করে না। কিন্তু উজ্জ্বলভাবে প্রজ্বলিত ফসফরাস বা ম্যাগনেসিয়াম এ গ্যাসে জ্বলতে থাকে। কেননা, অধিক তাপমাত্রায় নাইট্রিক অক্সাইড বিয়োজিত হয়ে N_2 ও O_2 উৎপন্ন করে এবং এ অক্সিজেন দহনে ব্যবহৃত হয় :

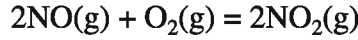


নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (Nitrogen dioxide, NO_2)

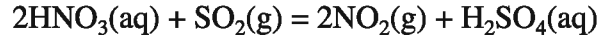
প্রস্তুতি : (১) শুষ্ক $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ এর তাপীয় বিয়োজন দ্বারা এর প্রস্তুতির সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি :



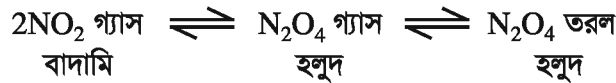
(২) নাইট্রিক অক্সাইডের সাথে অধিক পরিমাণ অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় এটি উৎপন্ন হয় :



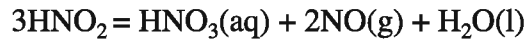
(৩) ঘন নাইট্রিক এসিডকে বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা বিজারিত করলেও NO_2 উৎপন্ন হয় :



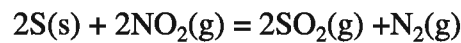
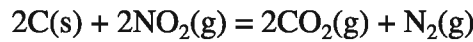
ধর্ম : বাদামি বর্ণের নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শীতল করলে হলুদ বর্ণের ডাই নাইট্রোজেন টেট্রাঅক্সাইডে (N_2O_4) পরিণত হয়। আরো শীতল করলে হলুদ তরল N_2O_4 পাওয়া যায়। তরল N_2O_4 উত্তপ্ত করলে প্রথমে হলুদ বর্ণের N_2O_4 গ্যাস তৈরি হয়, যা আরো উত্তপ্ত করলে বাদামি বর্ণের NO_2 গ্যাসে পরিণত হয়। দেখা যাচ্ছে, পরিবর্তনগুলো উভধর্মী।



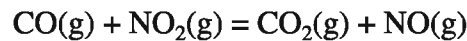
রাসায়নিক বিক্রিয়া : (১) NO_2 পানিতে সহজে দ্রবীভূত হয়ে নাইট্রিক এসিড উৎপন্ন করে :



(২) NO_2 একটি উত্তম জারক পদার্থ। C, P ও S কে সহজেই জারিত করে অক্সাইডে পরিণত করে।

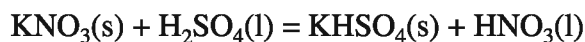


(৩) NO_2 কার্বন মনোঅক্সাইডকে জারিত করে CO_2 -এ পরিণত করে।

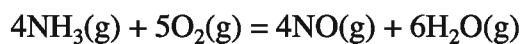


নাইট্রিক এসিড, HNO_3

প্রস্তুতি : যে কোনো নাইট্রেট লবণের সাথে গাঢ় সালফিউরিক এসিডের বিক্রিয়ায় নাইট্রিক এসিড উৎপন্ন হয়; তবে পরীক্ষাগারে পটাসিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা হয়। বিক্রিয়া মিশ্রণকে উত্তপ্ত করে নাইট্রিক এসিডকে পাতিত করা হয়।



শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন : আধুনিক পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়ার জারণের মাধ্যমে নাইট্রিক এসিড উৎপাদিত হয়। অ্যামোনিয়াকে বাতাসের সাথে মিশ্রিত করে উত্তপ্ত প্লাটিনাম তারজালির ভেতর দিয়ে চালনা করা হয়। এ সময় অ্যামোনিয়া জারিত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়।



উৎপাদিত নাইট্রিক অক্সাইডকে দ্রুত শীতল করা হয়, যখন তা বাতাসের অতিরিক্ত অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে।

অতঃপর এ গ্যাসে পানি বা লঘু নাইট্রিক এসিডের ধারা ধীরে প্রবাহিত করলে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড বাতাসের অক্সিজেন ও পানির সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রিক এসিড উৎপন্ন করে।



প্রাপ্ত লঘু নাইট্রিক এসিডকে প্রয়োজনে বিশেষ ব্যবস্থায় পাতিত করে গাঢ় করা হয়।

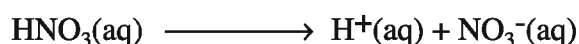
ভৌত ধর্ম : বিশুদ্ধ নাইট্রিক এসিড বর্ণহীন স্বচ্ছ তরল পদার্থ। এটি পানির সাথে যে কোনো অনুপাতে মিশ্রণীয়। সাধারণ নাইট্রিক এসিডে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড মিশ্রিত থাকে বলে এর বর্ণ বাদামি হয়। এটি খুবই ক্ষয়কারক এসিড। তাই খুব সাবধানতা অবলম্বন করে নাইট্রিক এসিড দিয়ে কাজ করতে হয়।

রাসায়নিক ধর্ম : নাইট্রিক এসিড দুই ভাবে ক্রিয়া করে :

(১) খুব শক্তিশালী এসিড হিসেবে;

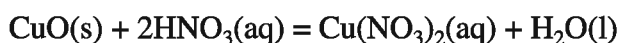
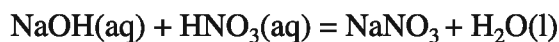
(২) শক্তিশালী জারক হিসেবে।

এসিড হিসেবে নাইট্রিক এসিড : নাইট্রিক এসিড খুবই শক্তিশালী এসিড; লঘু জাতীয় দ্রবণে এটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয় এবং হাইড্রোজেন ও নাইট্রেট আয়ন তৈরি করে।



এভাবে আয়নিত হওয়ার কারণেই এর এসিড ধর্মের সৃষ্টি হয়, যা এর জারক ধর্মের কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তিত হয়।

(১) নাইট্রিক এসিড ক্ষারকসমূহকে প্রশমিত করে, এ সময় নাইট্রেট লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়।

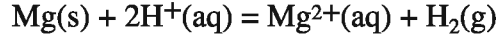


(২) অন্য এসিডসমূহের ন্যায় এটি ধাতু কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

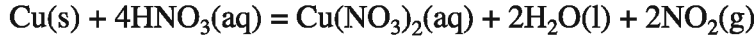


(৩) সকল শক্তিশালী এসিড লঘু দ্রবণে সক্রিয় ধাতুসমূহের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।

সুতরাং নাইট্রিক এসিড হতেও নিম্ন ধরনের বিক্রিয়া আশা করা যায়।



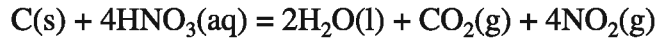
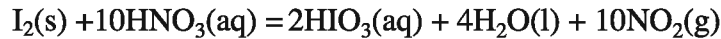
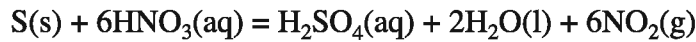
কিন্তু নাইট্রিক এসিডের সাথে এ ধরনের সরল বিক্রিয়া হয় না। কারণ নাইট্রিক এসিডের শক্তিশালী জারণ ধর্মের কারণে ধাতুর সাথে নাইট্রিক এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হাইড্রোজেন পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং নাইট্রিক এসিড বিজারিত হয়। ঘন নাইট্রিক এসিডের সাথে ধাতুর বিক্রিয়ায় (যেমন কপারের বিক্রিয়ায়) প্রধান বিক্রিয়া নিম্নরূপ :



যদি গাঢ় নাইট্রিক এসিডের সাথে সমান আয়তনের পানি মিশ্রিত করে কপারের সাথে বিক্রিয়া করানো হয়, তবে প্রধান উৎপাদ হিসেবে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হয়।



জারক হিসেবে নাইট্রিক এসিড : নাইট্রিক এসিড অনেক অধাতু এবং কিছু যৌগকেও জারিত করে। যেমন তপ্ত গাঢ় নাইট্রিক এসিড সালফার, ফসফরাস, আয়োডিনকে যথাক্রমে সালফিউরিক, ফসফরিক ও আয়োডিক এসিডে এবং কার্বনকে কার্বন ডাইঅক্সাইডে জারিত করে।



ব্যবহার : (১) অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট তৈরি করতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রিক এসিড ব্যবহৃত হয়।

(২) বিভিন্ন বিস্ফোরক তৈরির জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

(৩) নাইট্রো-জৈব যৌগ তৈরির জন্য এর প্রচুর ব্যবহার বিদ্যমান।

নাইট্রেট লবণসমূহ (Nitrates) : নাইট্রিক এসিডের লবণকে নাইট্রেট বলা হয়, এগুলোতে NO_3^- আয়ন বিদ্যমান। সকল নাইট্রেট লবণ পানিতে দ্রবণীয়, অধিকাংশ খুবই দ্রবণীয় এবং দানাদার অবস্থায় পানিগ্রাসী। সকল নাইট্রেট উত্তাপে বিয়োজিত হয়। তবে বিয়োজনের প্রকৃতি সক্রিয়তা ক্রমে ধাতুর অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়।

নাইট্রেট আয়নের পরীক্ষা : (১) **শুষ্ক পরীক্ষা :** একটি টেস্ট টিউবে অল্প পরিমাণ নাইট্রেট লবণ ও কপার চূর্ণ নিয়ে তাতে ১ বা ২ ফোঁটা গাঢ় সালফিউরিক এসিড যোগ করে তাপ দাও। নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের লালচে বাদামি বর্ণের ধোঁয়া সৃষ্টি হলে নাইট্রেট আয়নের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে জানা যায়।

(২) **আর্দ্র পরীক্ষা, বলয় পরীক্ষা :** একটি টেস্ট টিউবে নাইট্রেট দ্রবণ নিয়ে তাতে সম আয়তনের সদ্য প্রস্তুত আয়রন(II) সালফেটের দ্রবণ যোগ করে ঝাঁকে মিশ্রিত কর। এরপর টেস্ট টিউবকে যথাসম্ভব কাত করে সাবধানে এর গা বেয়ে গাঢ় সালফিউরিক এসিড যোগ কর, যেন তা নিচে একটি পৃথক স্তর তৈরি করে। এ দুইটি দ্রবণের সংযোগস্থলে বাদামি বর্ণের বলয় সৃষ্টি হলে নাইট্রেট আয়নের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়।

১৪.৪ ফসফরাস

ফসফরাসের সংকেত P। এর পারমাণবিক সংখ্যা 15। ইলেকট্রন বিন্যাস 2, 8, 5।

ফসফরাস নাইট্রোজেনের ন্যায় গ্রুপ V মৌল। এটি তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থিত। এটি একটি অধাতু। এর যোজনী 3 ও 5।

সক্রিয় হওয়ায় একে মৌলরূপে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। যৌগরূপে, বিশেষ করে ফসফেট হিসেবে এটি প্রকৃতিতে বিদ্যমান। ফসফেট খনিজের বিজারণ হতে ফসফরাস মৌল তৈরি করা যায়। ফসফরাস একটি বহুরূপী মৌল। এর দুইটি প্রধান রূপভেদ আছে: সাদা ফসফরাস এবং লাল ফসফরাস। শেযোক্তটি সুস্থিত।

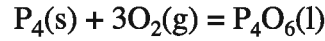
শ্বেত বা সাদা ফসফরাস : শ্বেত ফসফরাস খুব সক্রিয়। একে আলোতে রাখলে এর উপর হলুদ বর্ণের আস্তরণ পড়ে, এ কারণে একে হলুদ ফসফরাসও বলা হয়। এটি কক্ষ তাপমাত্রায় অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে জারিত হয়; সে সময় ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়, এবং আগুন ধরে যেতে পারে। এ কারণে একে পানির নিচে রাখা হয়। এটি খুব বিষাক্ত। লাল ফসফরাসকে নিষ্ক্রিয় পরিবেশে 550°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে ফসফরাস বাষ্পকে শীতল করলে সাদা ফসফরাস পাওয়া যায়।

লোহিত বা লাল ফসফরাস : এটি কম সক্রিয়, কক্ষ তাপমাত্রায় অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে না, সুতরাং একে খোলা জায়গায় রাখা যায়। এটি বিষাক্ত নয়। সামান্য পরিমাণ আয়োডিন প্রভাবকের উপস্থিতিতে শ্বেত ফসফরাসকে 200–250°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে তা লোহিত ফসফরাসে রূপান্তরিত হয়।

ফসফরাসের ব্যবহার : ফসফরাস দেয়াশলাই শিল্পে, ইঁদুর মারার বিষ তৈরিতে, আগুনে বোমা এবং যুদ্ধের সময় ধূম্রজাল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। 80% ফসফরাস ফসফরিক এসিড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, যার অধিকাংশ ফসফেট সার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন কীটনাশক তৈরিতে এবং ফসফরাসের বিভিন্ন যৌগ তৈরিতে ফসফরাস ব্যবহৃত হয়।

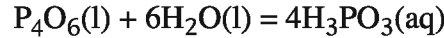
ফসফরাসের অক্সাইডসমূহ : ফসফরাসের দুইটি প্রধান অক্সাইড হল : ফসফরাস(III) অক্সাইড বা ফসফরাস ট্রাই অক্সাইড P_2O_3 বা P_4O_6 এবং ফসফরাস(V) অক্সাইড বা ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইড P_2O_5 বা P_4O_{10} ।

ফসফরাস (III) অক্সাইড, P_4O_6 : সীমিত পরিমাণ বায়ুর সরবরাহে ফসফরাসকে উত্তপ্ত করলে এ যৌগ উৎপন্ন হয়।

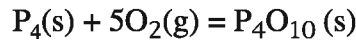


একই সাথে কিছু P_4O_{10} উৎপন্ন হয়। উৎপাদিত মিশ্রণকে উত্তপ্ত করে P_4O_6 যৌগকে বাষ্পীভূত করে পৃথক করা হয়।

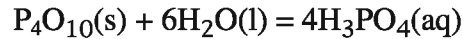
ফসফরাস (III) অক্সাইড সাদা উদ্বায়ী পদার্থ। এটি সহজেই পানির সাথে বিক্রিয়া করে ফসফরিক এসিড উৎপন্ন করে।



ফসফরাস (V) অক্সাইড, P_4O_{10} : অতিরিক্ত পরিমাণ শুষ্ক বায়ু প্রবাহে ফসফরাসকে দহন করলে এ যৌগ উৎপন্ন হয়।



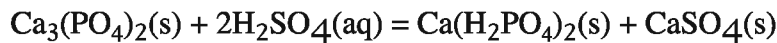
এটি সাদা কঠিন পদার্থ, যা তীব্রভাবে পানির সাথে বিক্রিয়া করে। এ কারণে এটি খুব ভালো নিরুদক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গরম পানির সাথে বিক্রিয়া করে এটি ফসফরিক এসিড তৈরি করে।



ফসফরিক এসিডের লবণকে ফসফেট বলা হয়। ক্ষারধাতু ভিন্ন সকল ধাতুর ফসফেট পানিতে অদ্রবণীয়।

ফসফেট সারসমূহ : জমির উর্বরতার জন্য ফসফরাস একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মৌল।

অস্থিচূর্ণ ও খনিজ ফসফেটে ক্যালসিয়াম ফসফেট $Ca_3(PO_4)_2$ বিদ্যমান। কিন্তু তা পানিতে প্রায় অদ্রবণীয় বলে উদ্ভিদ অতি ধীরে তা শোষণ করতে পারে। এ কারণে অধিকতর দ্রবণীয় ফসফেটের প্রয়োজন হয়। এর সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ গাঢ় সালফিউরিক এসিড যোগ করে ‘সুপার ফসফেট’ এবং ‘ট্রিপল সুপার ফসফেট’ প্রস্তুত করা হয়।

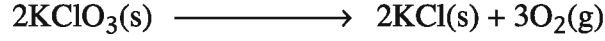


১৪.৫ অক্সিজেন

অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৮, ইলেকট্রন বিন্যাস ২, ৬। এটি গ্রুপ IV মৌল এবং পর্যায় সারণিতে ২য় পর্যায়ে অবস্থিত।

অবস্থান : মৌলসমূহের মধ্যে পৃথিবীতে অক্সিজেনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। ভূত্বকে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রায় 49.0%, অর্থাৎ অন্যান্য মৌল একত্রিত হয়ে ভূত্বকের অর্ধেক ভরের সমান, একা অক্সিজেন বাকি অর্ধেক ভরের সমান। ভূ-ত্বকে পানি, বিভিন্ন সিলিকেট ও সিলিকা এবং ধাতু অক্সাইডরূপে অক্সিজেন বিদ্যমান। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ আয়তন হিসেবে 21%, ভর হিসেবে 23%। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন মৌল হিসেবে থাকে। তখন এর সংকেত O_2 ।

প্রস্তুতি : (১) পরীক্ষাগারে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড প্রভাবকের উপস্থিতিতে পটাসিয়াম ক্লোরেটকে উত্তপ্ত করে অক্সিজেন তৈরি করা যায়।



শিল্পোৎপাদন : যেহেতু বায়ুতে প্রচুর পরিমাণ মুক্ত অক্সিজেন বিদ্যমান, সেহেতু তা থেকেই শিল্পক্ষেত্রে অক্সিজেন সংগ্রহ করা হয়। বায়ুকে তরলীকরণ করে এর আংশিক পাতন করলে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পৃথকভাবে পাওয়া যায়।

ব্যবহার : (১) শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত বা অতি দুর্বল রোগীকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন সরবরাহ করতে হয়। এ জন্য হাসপাতালে বিশুদ্ধ অক্সিজেন প্রয়োজন। এ ছাড়া পানির নিচে ডুবুরিদের, উড়োজাহাজে এবং পর্বতারোহীদের অক্সিজেন প্রয়োজন হয়।

(২) অক্সি-হাইড্রোজেন, অক্সি-অ্যাসিটিলিন প্রভৃতি বিভিন্ন শিখা উৎপাদনের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। এ সকল শিখায় অতি উচ্চ তাপমাত্রা অর্জিত হয়, ফলে তা দিয়ে ধাতু গলানো ও ঝালাইয়ের কাজ করা হয়।

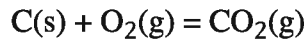
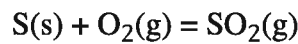
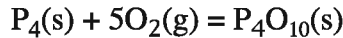
(৩) রকেটের জ্বালানি হিসেবে বিভিন্ন দাহ্য তরলকৃত গ্যাস এবং সে সাথে জারক হিসেবে তরল অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়।

ভৌত ধর্ম : অক্সিজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন গ্যাস। এটি পানিতে দ্রবণীয়। তবে এ দ্রবণীয়তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। পানিতে বিদ্যমান উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ পানিতে অল্প দ্রবীভূত অক্সিজেন দ্বারাই তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস চালায়।

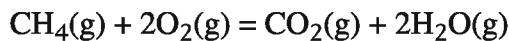
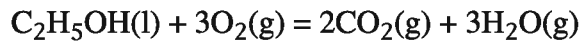
রাসায়নিক ধর্ম : অক্সিজেন ঋণাত্মকধর্মী সক্রিয় মৌল। এর যোজনী দুই। এটি শক্তিশালী জারক। অবশ্য এটির অধিকাংশ বিক্রিয়া উচ্চ তাপমাত্রায় ঘটে। এটি বিভিন্ন ধাতু ও অধাতুর সাথে তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে অক্সাইড উৎপন্ন করে।

(১) **ধাতুসমূহের সাথে বিক্রিয়া :** সক্রিয়তা ক্রমের খুব নিচের দিকের ধাতুসমূহ ছাড়া অন্যান্য সকল ধাতু অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ধাতু অক্সাইড উৎপন্ন করে। বিস্তারিত বিবরণ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

(২) **অধাতুর সাথে বিক্রিয়া :** অক্সিজেন অন্যান্য তীব্র ঋণাত্মকধর্মী মৌল (যেমন হ্যালোজেনসমূহ) এর সাথে সাধারণত বিক্রিয়া করে না। তবে উচ্চ তাপমাত্রায় কম ঋণাত্মকধর্মী মৌল, যেমন সালফার, কার্বন ও ফসফরাসের সাথে বিক্রিয়া করে অক্সাইড উৎপন্ন করে।



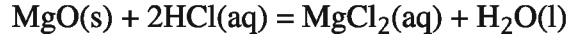
(৩) **বিভিন্ন জৈব যৌগের সাথে বিক্রিয়া :** জৈব যৌগসমূহ উচ্চ তাপমাত্রায় বায়ু বা অক্সিজেনে তাপ ও আলোকসহ জারিত হয়। এ সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয়। জৈব যৌগে C, H, O ছাড়া অন্য মৌল থাকলে অন্যান্য যৌগও গঠিত হয়।



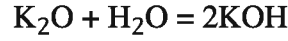
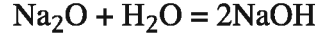
অক্সাইডসমূহের শ্রেণীবিভাগ : অক্সিজেন এবং অন্য কোনো মৌল পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে যে সকল দ্বি-মৌল যৌগ উৎপন্ন করে, তাদেরকে অক্সাইড বলা হয়। অক্সাইডসমূহের চারটি প্রধান শ্রেণীবিভাগ বিদ্যমান।

(১) **ক্ষারকীয় অক্সাইডসমূহ :** ক্ষারকীয় অক্সাইডসমূহ হচ্ছে ধাতুর অক্সাইড। এরা এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ

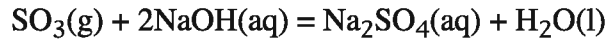
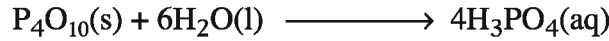
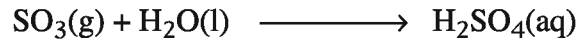
ও পানি উৎপন্ন করে। যেমন ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড।



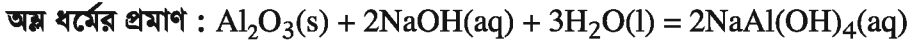
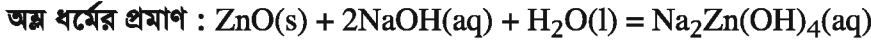
কিছু ধাতব অক্সাইড পানিতে অতিমাত্রায় দ্রবণীয়। এদের দ্রবণকে ক্ষার বলা হয়। যেমন—



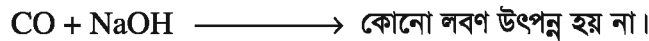
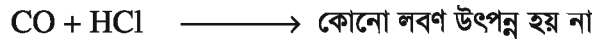
(২) অম্লীয় অক্সাইড : অম্লীয় অক্সাইডসমূহ হচ্ছে অধাতুর অক্সাইড। এরা পানিতে দ্রবীভূত হলে পানির সাথে বিক্রিয়া করে এসিড উৎপন্ন করে। ক্ষারের সাথে এদের বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়। যেমন, সালফার ডাইঅক্সাইড, ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইড।



(৩) উভধর্মী অক্সাইড : যে সকল অক্সাইড ক্ষারকীয় ও অম্লীয় উভয় ধরনের ধর্ম প্রদর্শন করে, তাদেরকে উভধর্মী অক্সাইড বলা হয়। যেমন জিংক অক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। এরা ক্ষার ও অম্ল উভয়ের সাথে বিক্রিয়া করে শূন্যমাত্র লবণ ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পানি উৎপন্ন করে।



(৪) নিরপেক্ষ অক্সাইড : যে অক্সাইড অম্লীয় বা ক্ষারকীয় কোনো ধর্ম প্রদর্শন করে না, তাদেরকে নিরপেক্ষ অক্সাইড বলা হয়। যেমন কার্বন মনোঅক্সাইড।



১৪.৬ সালফার

সালফারের পারমাণবিক সংখ্যা ১৬। এর ইলেকট্রন বিন্যাস ২, ৮, ৬। অতএব এটি গ্রুপ-IV মৌল এবং পর্যায় সারণিতে তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থিত। প্রকৃতিতে এটি মুক্ত এবং যৌগ উভয় অবস্থাতে বিদ্যমান।

খনি হতে সালফার নিষ্কাশন : মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে সালফার পাওয়া যায় বলে একে খনি হতে সরাসরি আহরণ করা হয়। মাটির অনেক নিচে সালফারের খনি পাওয়া যায়। খনি থেকে আহরণের জন্য বিভিন্ন ব্যাসের তিনটি এককেন্দ্রিক নল সালফার স্তরের গভীর পর্যন্ত প্রবেশ করানো হয়। সর্ববহিঃস্থ নল দিয়ে উচ্চচাপে ১৮০°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প প্রবেশ করানো হয়। এর তাপমাত্রা সালফারের গলনাঙ্ক ১১৯°C হতে বেশি হওয়ায় ভূগর্ভে সালফার গলে যায়। সবচেয়ে মধ্যের নল দিয়ে উচ্চ চাপে গরম বাতাস প্রবেশ করানো হয়। চাপে গলিত সালফার মাঝখানের নল দিয়ে উপরের দিকে বের হয়ে আসে। একে ফ্রাশ (Frasch) পদ্ধতি বলা হয়।

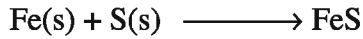
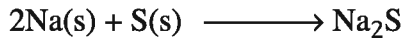
ভৌত ধর্ম : সাধারণ সালফার হালকা হলুদ রঙের ভজুর কঠিন পদার্থ। এর গলনাঙ্ক ১১৯°C। সালফারের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক পার্শ্ববর্তী ফসফরাস ও ক্লোরিন অপেক্ষা এত বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে সালফারের অণুতে ৪টি সালফার

মাধ্যমিক রসায়ন

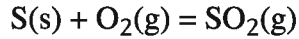
পরমাণু বিদ্যমান। সুতরাং প্রাকৃতিক সালফারের সত্যিকার সংকেত S_8 লেখা উচিত; তবে সরলতার জন্য সমীকরণে এর আণবিক সংকেত S দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সালফার একটি বহুরূপী মৌল। এর কয়েকটি রূপভেদ আছে, তবে সাধারণত অষ্টতলকীয় দানাদার সালফার পাওয়া যায়, এটিই সবচেয়ে সুস্থিত রূপ।

রাসায়নিক ধর্ম : সালফার অধাতু। কক্ষ তাপমাত্রায় এটি বেশ নিষ্ক্রিয়, কিন্তু উত্তপ্ত হলে বেশ সক্রিয় হয়। এটির যোজনী ২, ৪ ও ৬।

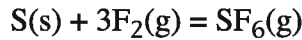
(১) **ধাতুর সাথে বিক্রিয়া :** উত্তপ্ত অবস্থায় সালফার বিভিন্ন ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে ধাতু সালফাইড তৈরি করে। একমাত্র ক্ষার ধাতু ভিন্ন সকল ধাতুর সালফাইড পানিতে অদ্রবণীয়।



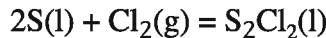
(২) **বায়ু বা অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া :** উত্তপ্ত অবস্থায় সালফার বাতাসে বা অক্সিজেনে পুড়ে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।



(৩) **হ্যালোজেনের সাথে বিক্রিয়া :** সালফার কক্ষ তাপমাত্রায় ফ্লোরিনের মধ্যে জ্বলে উঠে সালফার হেক্সাফ্লোরাইড উৎপন্ন করে।



গলিত সালফারের মধ্য দিয়ে ক্লোরিন গ্যাস প্রবাহিত করলে সালফার ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।



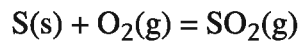
ব্যবহার : (১) সালফারের প্রধান ব্যবহার সালফার ডাইঅক্সাইড ও সালফিউরিক এসিড তৈরিতে। (২) রবারের ভলকানাইজিং—এর জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। (৩) চর্মরোগের মলম, বিভিন্ন সালফাড্রাগ ও অন্যান্য ওষুধ তৈরিতে সালফার ব্যবহৃত হয়। (৪) দিয়াশলাই, বারুদ, ফটোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হাইপোসফিট বিভিন্ন দ্রব্য তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।

সালফারের যৌগসমূহ : সালফারের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অক্সাইড ও সালফিউরিক এসিড সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

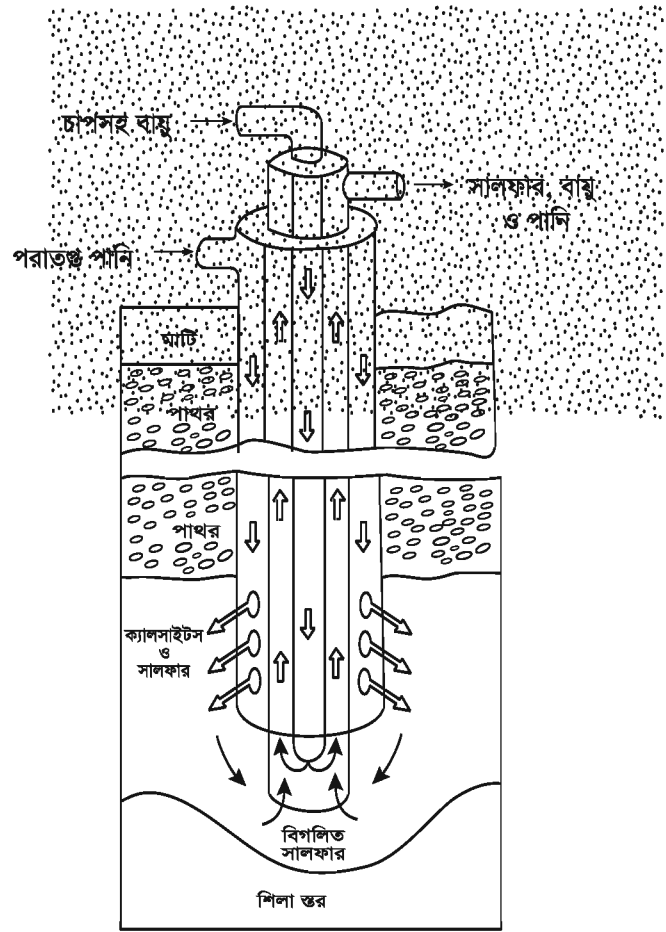
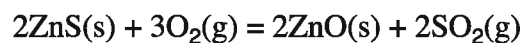
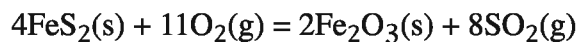
সালফারের অক্সাইডসমূহ : সালফারের বিভিন্ন অক্সাইডের মধ্যে SO_2 ও SO_3 গুরুত্বপূর্ণ।

সালফার ডাইঅক্সাইড, SO_2 : সালফারের অক্সাইডসমূহের মধ্যে এটি সবচেয়ে সুস্থিত এবং একে বিভিন্নভাবে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা হয় :

(১) শিল্প কারখানায় সালফারকে পুড়িয়ে এটি প্রস্তুত করা হয় :



(২) বিভিন্ন খনিজ ধাতব সালফাইডকে পুড়িয়ে বিভিন্ন কারখানায় SO_2 প্রস্তুত করা যায় :



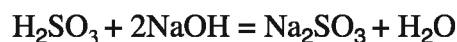
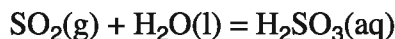
চিত্র ১৪.৩ : ফ্রাশ পদ্ধতিতে সালফার নিষ্কাশন

(৩) পরীক্ষাগারে সাধারণত কপার কুটির সাথে উত্তপ্ত গাঢ় সালফিউরিক এসিডের বিক্রিয়ার মাধ্যমে সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করা হয় :

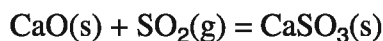


ভৌত ধর্ম : সালফার ডাইঅক্সাইড একটি বর্ণহীন, তীব্র বাঁঝালো এবং শ্বাসরোধকারী গ্যাস। এ গ্যাস পানিতে খুব বেশি দ্রবণীয়।

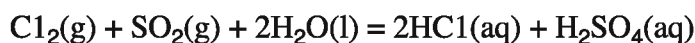
রাসায়নিক ধর্ম : (১) সালফার ডাইঅক্সাইড একটি অম্লধর্মী অক্সাইড। এটি পানিতে দ্রবীভূত হয়ে সালফিউরাস এসিড উৎপন্ন করে, যা নীল লিটমাসকে লাল করে এবং ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।



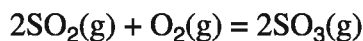
এটি ক্ষারকীয় অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে সালফাইট লবণ উৎপন্ন করে।



(২) সালফার ডাইঅক্সাইড একটি বিজারক। এটি জলীয় মাধ্যমে হ্যালোজেন, ফেরিক ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড প্রভৃতি জারক পদার্থকে বিজারিত করে এবং সাথে সাথে নিজে সালফিউরিক এসিডে রূপান্তরিত হয় :



(৩) সালফার ডাইঅক্সাইডের সাথে অক্সিজেন বিক্রিয়া করলে সালফার ট্রাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।

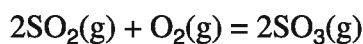


এটি সালফিউরিক এসিডের শিল্পোৎপাদনের স্পর্শ প্রণালির ভিত্তি।

ব্যবহার : সালফার ডাইঅক্সাইডের প্রধান ব্যবহার হচ্ছে সালফিউরিক এসিডের শিল্পোৎপাদনে। এ ছাড়া জীবাণু ও কীটনাশক হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। বিরঞ্জক হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হয়। এটি ফলমূলের পচন রোধে ব্যবহৃত হয়।

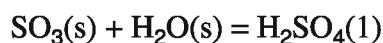
সালফার ট্রাইঅক্সাইড, SO_3

প্রস্তুতি : (১) শিল্পক্ষেত্রে প্লাটিনাম বা ভ্যানাডিয়াম পেন্টাঅক্সাইডকে প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করে 400°C – 500°C তাপমাত্রায় SO_2 —এর সাথে বাতাসের অক্সিজেনের বিক্রিয়ার মাধ্যমে SO_3 প্রস্তুত করা হয় :

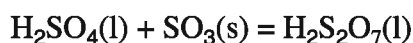


ভৌত ধর্ম : সাধারণ তাপমাত্রায় এটি একটি বর্ণহীন গ্যাস।

রাসায়নিক ধর্ম : সালফার ট্রাইঅক্সাইড পানির সাথে যুক্ত হয়ে সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন করে।



পানির প্রতি প্রবল আকর্ষণের কারণে উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় প্রচুর তাপের সৃষ্টি হয়। এটি গাঢ় H_2SO_4 —এ দ্রবীভূত হয়ে পাইরোসালফিউরিক এসিড উৎপন্ন করে। এ এসিড ধূমায়মান সালফিউরিক এসিড (fuming sulphuric acid) হিসেবে পরিচিত।



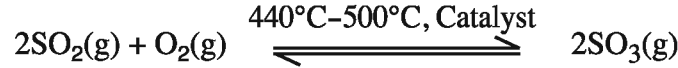
ব্যবহার : সালফিউরিক এসিডের স্পর্শ প্রণালিতে শিল্প উৎপাদনে SO_3 একটি মধ্যবর্তী যৌগ। তবে সেক্ষেত্রে একে সাধারণত পৃথক করা হয় না; সরাসরি সালফিউরিক এসিডে রূপান্তরিত করা হয়।

সালফিউরিক এসিড, H_2SO_4

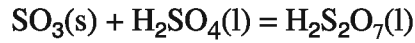
সব রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে সালফিউরিক এসিড সবচেয়ে বেশি পরিমাণে উৎপন্ন ও ব্যবহার করা হয়। স্পর্শ পদ্ধতিতে H_2SO_4 —এর শিল্পোৎপাদন করা হয়।

স্পর্শ পদ্ধতি

মূলনীতি : সাধারণ অবস্থায় সালফার ডাইঅক্সাইড বাতাসের অক্সিজেন দ্বারা জারিত না হলেও $400^\circ C - 500^\circ C$ তাপমাত্রায় প্রভাবকের সংস্পর্শে সালফার ডাইঅক্সাইড অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে সালফার ট্রাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে।



এ বিক্রিয়ায় প্রভাবক হিসেবে প্লাটিনাম চূর্ণ বা ভ্যানাডিয়াম পেন্টাঅক্সাইড ব্যবহার করা হয়। উৎপন্ন সালফার ট্রাইঅক্সাইডকে গাঢ় সালফিউরিক এসিড দ্বারা শোষণ করা হয়। তখন ধূমায়মান সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন হয়। পরে পানিতে ধীরে ধীরে এই এসিড যোগ করে প্রয়োজনীয় ঘনমাত্রার H_2SO_4 প্রস্তুত করা হয়।



সুতরাং স্পর্শ প্রণালিতে SO_2 হতে সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতির প্রধান ধাপ দুইটি হল : (১) SO_2 হতে SO_3 প্রস্তুতি এবং (২) SO_3 হতে H_2SO_4 প্রস্তুতি। তন্মধ্যে প্রথম ধাপটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এ সম্পর্কে নবম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে পুনরাবৃত্তি করা হল না।

সালফার ট্রাইঅক্সাইড হতে সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতকরণের শর্তাবলি : সালফার ট্রাইঅক্সাইডের সাথে পানির সরাসরি বিক্রিয়ার মাধ্যমেই সালফিউরিক এসিড তৈরি হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা করা কঠিন। SO_3 কে সরাসরি পানিতে শোষণ করাতে গেলে সালফিউরিক এসিডের ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হয়। কেননা, তরল পানির উপরিভাগে জলীয় বাষ্পের সাথে SO_3 বিক্রিয়া করে H_2SO_4 —এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সৃষ্টি করে। এ কুয়াশা ঘনীভূত করা খুব কঠিন এবং তা কারখানার পরিবেশ দূষিত করে। SO_3 কে 98% H_2SO_4 —এ শোষণ করা হয় এবং প্রাপ্ত এসিডকে পানির সাথে মিশ্রিত করে প্রয়োজনমতো লঘু করা হয়।

সালফিউরিক এসিডের ভৌত ধর্ম : বিশুদ্ধ সালফিউরিক এসিড ঘন তৈলাক্ত তরল পদার্থ, যা পানিতে সকল অনুপাতে মিশ্রণীয়। পানির সাথে মিশানোর সময় প্রচুর তাপ নির্গত হয়। সালফিউরিক এসিডে পানি যোগ করলে উত্তাপে পানি বিস্ফোরণাকারে ফুটে এসিড ছিটকে শরীরে পড়তে পারে। এ কারণে সালফিউরিক এসিডকে লঘু করতে হলে সর্বদা নাড়ানো অবস্থায় পানিতে ফোঁটায় ফোঁটায় যোগ করতে হবে। মিশ্রণ বেশি গরম হলে অপেক্ষা করতে হবে। তা ঠান্ডা হলে আবার এসিড যোগ করতে হবে।

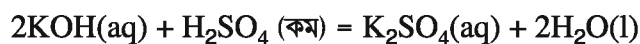
রাসায়নিক ধর্ম : সালফিউরিক এসিডের রাসায়নিক ধর্মসমূহ :

(ক) এসিড হিসেবে, (খ) জারক হিসেবে, (গ) নিরুদক হিসেবে।

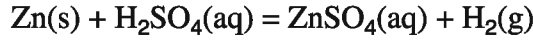
(ক) এসিড হিসেবে : জলীয় দ্রবণে সালফিউরিক এসিড দুইধাপে বিয়োজিত হয় :



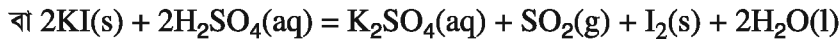
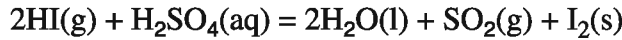
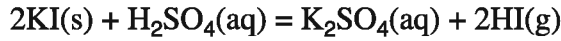
এটি একটি শক্তিশালী দ্বি-ক্ষারকীয় এসিড। এটি ক্ষারককে প্রশমিত করে দুই প্রকারের লবণ, যথা হাইড্রোজেন সালফেট বা সালফেট এবং পানি উৎপন্ন করে :



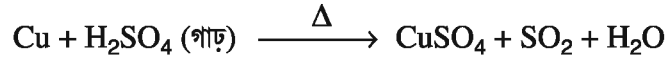
যে সব ধাতু সক্রিয়তা ক্রমে হাইড্রোজেনের উপরে অবস্থিত সে সব ধাতু লঘু সালফিউরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে সে ধাতুর সালফেট ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।



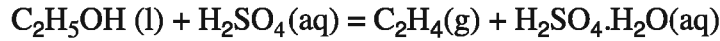
(খ) জারক হিসেবে : লঘু H_2SO_4 —এর জারক ধর্ম নেই। কিন্তু ঘন H_2SO_4 এসিড মোটামুটি শক্তিশালী জারক পদার্থ; বিশেষত, উত্তপ্ত অবস্থায়। এ কারণে ধাতব ব্রোমাইড, আয়োডাইড প্রভৃতি লবণের সাথে ঘন H_2SO_4 বিক্রিয়ায় HBr , HI প্রভৃতি পাওয়া যায় না। এরা প্রথমে তৈরি হলেও সাথে সাথে ঘন সালফিউরিক এসিড দ্বারা ব্রোমিন ও আয়োডিনে জারিত হয়।



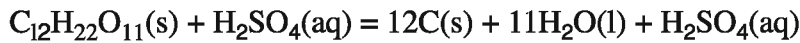
যদিও লঘু H_2SO_4 কোনো কোনো ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে, ঘন সালফিউরিক এসিড প্রায় সব ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে। এ জন্য ধাতুকে সক্রিয়তা ক্রমে হাইড্রোজেনের উপরে থাকার প্রয়োজন নেই :



(গ) নিরুদক (Dehydrating agent) : পানির প্রতি সালফিউরিক এসিডের আকর্ষণ খুব বেশি, পূর্বেই বলা হয়েছে। H_2SO_4 —এর সাথে পানি মিশালে প্রচুর তাপ নির্গত হয়। পানির প্রতি ঘন H_2SO_4 —এর প্রবল আসক্তির কারণে তা বিভিন্ন যৌগ হতে পানি বের করে নিতে পারে; যেমন,

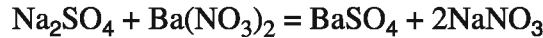


H_2SO_4 বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট হতে পানির অণু বের করে নিয়ে কার্বনে রূপান্তরিত করে। এ কারণে চিনি, কাগজ প্রভৃতিতে H_2SO_4 দিলে তা সাথে সাথে কালো হয়। একই কারণে মানুষের চামড়ার সংস্পর্শে আসলে তা বিষাক্ত ক্ষত ও দাহের সৃষ্টি করে।



ব্যবহার : বহু রাসায়নিক শিল্পে সালফিউরিক এসিড ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে অ্যামোনিয়াম সালফেট ও সুপার ফসফেট প্রভৃতি বিভিন্ন সার উৎপাদনে, বিভিন্ন বিস্ফোরক; সাবান জাতীয় পদার্থ এবং বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ তৈরিতে, পেট্রোলিয়াম শোধনে এবং ধাতু নিষ্কাশনে এর ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সালফেট আয়নের পরীক্ষা : যে কোনো সালফেট লবণের জলীয় দ্রবণকে হাইড্রোক্লোরিক বা নাইট্রিক এসিড দ্বারা অম্লীয় করে তাতে বেরিয়াম নাইট্রেট বা বেরিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ যোগ করলে বেরিয়াম সালফেটের সাদা অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হয়।

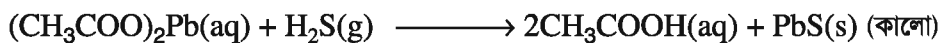


এখানে লক্ষ কর, এই অধঃক্ষেপ হাইড্রোক্লোরিক ও নাইট্রিক এসিডে অদ্রবণীয়।

সালফাইড আয়নের পরীক্ষা : ধাতু সালফাইডকে একটি পরীক্ষা নলে নিয়ে তাতে মধ্যম গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ করে একটু তাপ দিলে ডিম পচা গন্ধযুক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস সৃষ্টি হয়। (কপার সালফাইডসহ কিছু সালফাইড এ পরীক্ষা দেয় না)।



লেড অ্যাসিটেট কাগজ এ গ্যাসে ধরলে তা তৎক্ষণাৎ কালো হয়।



১৪.৭ হ্যালোজেনসমূহ (Halogens)

পর্যায় সারণির VII গ্রুপে পাঁচটি মৌল আছে : ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন ও অ্যাস্টেটিন। তন্মধ্যে সর্বশেষ মৌলকে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না বললেই চলে এবং তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ গ্রুপকে হ্যালোজেন গ্রুপও বলা হয়। এখানে প্রধানত ক্লোরিন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। প্রকৃতিতে এদের মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না, বিভিন্ন ধাতুর যৌগ (হ্যালাইড) হিসেবে পাওয়া যায়। মৌল অবস্থায় এরা দ্বি-পরমাণুক।

ভৌত ধর্মসমূহ : গ্রুপ মৌলসমূহের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভৌত ধর্মসমূহের ক্রম পরিবর্তন দেখা যায়।

(ক) **ভৌত অবস্থা এবং বর্ণ :** F_2 ও Cl_2 সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাস, Br_2 তরল, I_2 কঠিন পদার্থ। পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের বর্ণের গাঢ়তা বৃদ্ধি পায়। ফ্লোরিন ফিকে হলুদ, ক্লোরিন সবুজাভ হলুদ, ব্রোমিন লাল এবং আয়োডিন গাঢ় বেগুনি।

রাসায়নিক ধর্মসমূহ

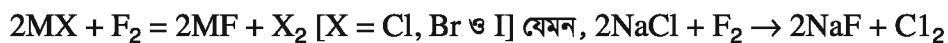
(১) **যোজনী ও জারণ সংখ্যা :** গ্রুপ VII এর মৌলসমূহের শেষ কক্ষপথে ৭টি ইলেকট্রন আছে। অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় গ্যাস অপেক্ষা এদের একটি ইলেকট্রন কম আছে। এ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস এরা সহজে দুইটি উপায়ে অর্জন করতে পারে।

(ক) অন্য কোনো পরমাণু হতে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে এ পরমাণুসমূহ একক ঋণাত্মক আধানযুক্ত আয়নে পরিণত হতে পারে। এভাবে আয়নিক হ্যালাইড গঠিত হয়। সুতরাং এ ধরনের যৌগে হ্যালোজেনসমূহের যোজনী ১।

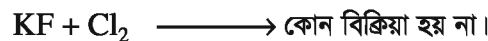
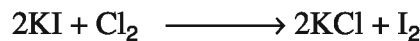
(খ) অন্য একটি পরমাণুর সাথে একটি একক সমযোজী বন্ধন গঠন করেও হ্যালোজেন পরমাণুসমূহ অষ্টক পূর্ণ করতে পারে। ফলে সমযোজী যৌগেও এদের যোজনী সাধারণত এক হয়।

(২) **হ্যালোজেনসমূহের জারণ বিক্রিয়া :** হ্যালোজেনসমূহের মধ্যে ফ্লোরিন সবচেয়ে শক্তিশালী জারক, ক্লোরিন এটি অপেক্ষা অনেক কম শক্তিশালী জারক, ব্রোমিন ক্লোরিন অপেক্ষা একটু কম শক্তিশালী জারক এবং আয়োডিনের জারণ ক্ষমতা খুবই কম।

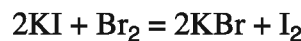
হ্যালোজেনসমূহের জারণ ক্ষমতার এ পার্থক্যের দরুন একটি ধাতব হ্যালাইড হতে তা অপেক্ষা হাল্কা হ্যালোজেন পরবর্তী হ্যালোজেনকে অপসারণ করে। যেমন : ফ্লোরিন যে কোনো ধাতুর ফ্লোরাইড, ব্রোমাইড ও আয়োডাইডের সাথে বিক্রিয়া করে সে ধাতুর ফ্লোরাইড এবং মুক্ত ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন উৎপন্ন করে :



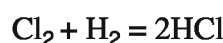
অনুরূপভাবে ক্লোরিন যে কোনো ধাতুর ব্রোমাইড বা আয়োডাইড হতে ব্রোমিন ও আয়োডিনকে মুক্ত করতে পারে; কিন্তু ধাতব ফ্লোরাইডের সাথে কোনোরূপ বিক্রিয়া করতে পারে না।



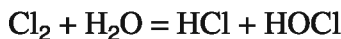
ধাতুর আয়োডাইড দ্রবণ থেকে ব্রোমিন আয়োডিনকে মুক্ত করে। কিন্তু ফ্লোরাইড ও ক্লোরাইডের সাথে বিক্রিয়া করে না।



(৩) **হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া :** সব হ্যালোজেন হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন হ্যালাইড উৎপন্ন করতে পারে; তবে সেজন্য ভিন্ন ভিন্ন শর্তের প্রয়োজন হয়। নিম্ন তাপমাত্রায় এবং অন্ধকারেও ফ্লোরিন হাইড্রোজেনের সাথে বিস্ফোরণাকারে যুক্ত হয়। অপরদিকে ক্লোরিন সূর্যালোকে অথবা একটু উচ্চ তাপমাত্রায় তীব্রভাবে হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়।



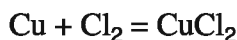
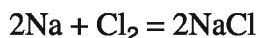
(৪) পানির সাথে বিক্রিয়া : পানির সাথে ক্লোরিন নিম্নরূপে বিক্রিয়া করে :



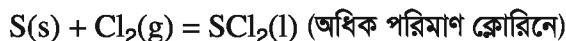
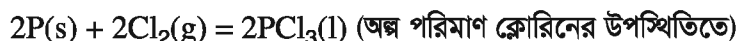
দীর্ঘ সময় রাখলে ক্লোরিন পানিতে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া ঘটে :



(৫) ধাতুর সাথে বিক্রিয়া : প্রতিটি ধাতুই প্রায় প্রতিটি হ্যালোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ধাতব হ্যালাইড উৎপন্ন করে। যেমন :

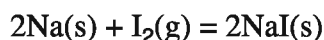
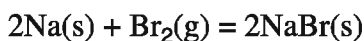
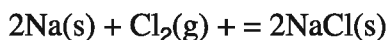


(৬) অধাতুর সাথে বিক্রিয়া : হ্যালোজেনসমূহ কয়েকটি অধাতুর সাথেও সরাসরি বিক্রিয়া করে; যেমন : সালফার, ফসফরাস প্রভৃতি।

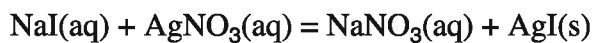
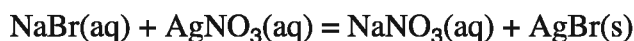
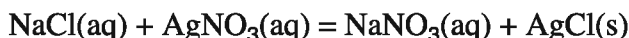


হ্যালোজেনসমূহ যে একই গ্রুপের মৌল তার পরীক্ষামূলক প্রমাণ : ইলেকট্রন বিন্যাস হতে সহজেই বুঝা যায় যে হ্যালোজেনসমূহ একই গ্রুপের মৌল। কিন্তু এটি হচ্ছে তাত্ত্বিক প্রমাণ। নিম্নরূপে পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাওয়া যায় :

তিন টুকরা সোডিয়াম ধাতু নিয়ে পৃথকভাবে ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন বাষ্পে উত্তপ্ত কর। সকল ক্ষেত্রে সোডিয়াম তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে সাদা দানাদার লবণ উৎপন্ন করবে।



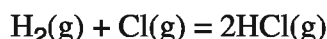
এ তিনটি লবণকে তিনটি পৃথক পরীক্ষা নলে নিয়ে কিছু পানি যোগ কর। দেখবে সকল ক্ষেত্রে বর্ণহীন দ্রবণ তৈরি হবে। এরপর সকল পরীক্ষা নলে অল্প পরিমাণ লঘু নাইট্রিক এসিড যোগ করে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ যোগ কর। তৎক্ষণাৎ সাদা হতে হালকা হলুদ বর্ণের সিলভার লবণের অধঃক্ষেপ পড়বে।



এ তিনটি অধঃক্ষেপই লঘু নাইট্রিক এসিডে অদ্রবণীয়।

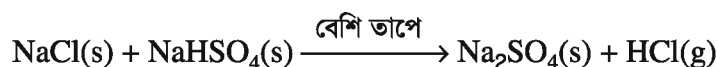
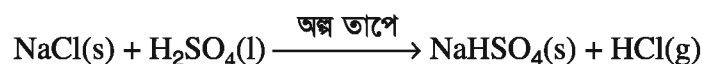
এ পরীক্ষা ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন এ তিনটি মৌলকে পৃথকভাবে নিয়ে এ সকল কাজ করা হয়েছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে একই ধরনের ফলাফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ এদের রাসায়নিক ধর্ম একই ধরনের। সুতরাং এরা একই গ্রুপের মৌল।

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, **HCl** : প্রস্তুতি : (১) সম আয়তন হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন গ্যাসের মিশ্রণকে সূর্যালোকে রাখলে বা উত্তপ্ত করলে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। আধুনিক শিল্পে এভাবে এর সংশ্লেষণ করা হয়।



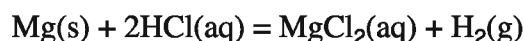
(২) পরীক্ষাগারে ধাতুর ক্লোরাইডকে (সাধারণত সোডিয়াম ক্লোরাইড) গাঢ় সালফিউরিক এসিডের সাথে উত্তপ্ত করলে

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়া দুইধাপে অনুষ্ঠিত হয়।



ভৌত ধর্ম : হাইড্রোজেন ক্লোরাইড একটি বর্ণহীন গ্যাস, যার তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ আছে। এটি পানিতে খুব দ্রবণীয়। এর জলীয় দ্রবণকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড বলা হয়। সাধারণ রাসায়নিক সমীকরণে উভয়ের সংকেত HCl লেখা হলেও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের সত্যিকার সংকেত হচ্ছে HCl(g) বা তরল অবস্থায় HCl। অপরদিকে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সংকেত HCl(aq)।

রাসায়নিক ধর্ম : (১) হাইড্রোক্লোরিক এসিড একটি শক্তিশালী এসিড। সক্রিয়তা ক্রমে যে সকল ধাতু হাইড্রোজেনের উপরে তারা এ এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।



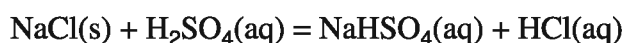
(খ) হাইড্রোক্লোরিক এসিডের জারণ, বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড হতে ক্লোরিন প্রস্তুত করা : যদিও হাইড্রোক্লোরিক এসিড সাধারণভাবে জারক বা বিজারক হিসেবে কাজ করে না, শক্তিশালী জারকসমূহ একে জারিত করলে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

যেমন, ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের সাথে হাইড্রোক্লোরিক এসিড উত্তপ্ত করলে ক্লোরিন উৎপন্ন হয়।

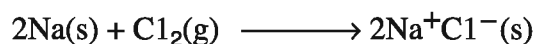


ক্লোরিন ও ক্লোরাইড আয়নের পারস্পরিক রূপান্তর

(১) ক্লোরাইড আয়ন হতে ক্লোরিন প্রস্তুতি : ক্লোরাইড লবণের সাথে গাঢ় সালফিউরিক এসিড ও ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মিশ্রিত করে উত্তপ্ত করলে ক্লোরিন পাওয়া যায়। সালফিউরিক এসিডের প্রভাবে ধাতু ক্লোরাইড হতে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড বা এর দ্রবণ উৎপন্ন হয়, MnO₂ তাকে জারিত করে।

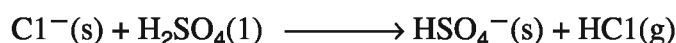
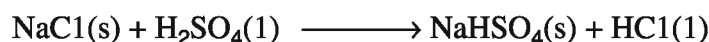


ক্লোরিন হতে ক্লোরাইড আয়ন প্রস্তুতি : ধাতুর সাথে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগে ক্লোরাইড আয়ন বর্তমান থাকে।

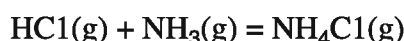


ক্লোরাইড আয়নের পরীক্ষা

শুষ্ক পরীক্ষা : (১) ক্লোরাইড লবণ নিয়ে তাতে গাঢ় সালফিউরিক এসিড যোগ করে উত্তপ্ত করলে বর্ণহীন ঝাঁঝালো গন্ধ বিশিষ্ট হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সৃষ্টি হয়।

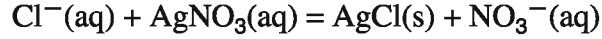


পরীক্ষানলের মুখে অ্যামোনিয়া সিক্ত কাচ দণ্ড ধরলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়।



আর্দ্র পরীক্ষা : ক্লোরাইড লবণের জলীয় দ্রবণে কয়েক ফোঁটা নাইট্রিক এসিড যোগ করে অম্লীয় করে সিলভার নাইট্রেট

দ্রবণ যোগ করলে দখির ন্যায় সিলভার ক্লোরাইডের অধঃক্ষেপ পড়ে।



এ অধঃক্ষেপ লঘু নাইট্রিক এসিডে অদ্রবণীয়, কিন্তু অ্যামোনিয়া দ্রবণে দ্রবণীয়।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

কার্বন : কার্বন অধাতু এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌল। কেননা; সমগ্র প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ এর যৌগসমূহ দ্বারা গঠিত। এছাড়া কার্বন যৌগের সংখ্যা অস্বাভাবিক বেশি। অন্য সকল মৌল দ্বারা গঠিত যৌগসমূহের সংখ্যার চেয়ে কার্বন যৌগের সংখ্যা বহুগুণ বেশি। কার্বন সমযোজী বন্ধন সৃষ্টি করে এবং এর স্বাভাবিক যোজনী ৪। এটি গ্রুপ IV মৌল এবং পর্যায় সারণিতে ২য় পর্যায়ে অবস্থিত।

বহুরূপতা : যদি কোনো মৌল ভিন্ন ভিন্ন রূপে থাকতে পারে, তবে এ ধর্মকে বহুরূপতা বলা হয়। সে মৌলকে বহুরূপী মৌল বলা হয়।

কার্বনের বহুরূপতা : কার্বন একটি বহুরূপী মৌল। এর দুইটি প্রধান রূপভেদ হচ্ছে ডায়মন্ড বা হীরক এবং গ্রাফাইট।

হীরকের আণবিক গঠন : হীরক একটি অতি বৃহৎ অণু, যেখানে প্রতিটি কার্বন পরমাণু চতুষ্তলকীয়ভাবে অপর চারটি পরমাণুর সাথে বন্ধনযুক্ত। কোনো মুক্ত ইলেকট্রন না থাকায় এটি বিদ্যুৎ অপরিবাহী।

গ্রাফাইটের আণবিক গঠন : গ্রাফাইট একটি অতি বৃহৎ অণু। এখানে প্রতিটি কার্বন পরমাণু একই তলে অবস্থিত অপর তিনটি কার্বন পরমাণুর সাথে বন্ধনযুক্ত। কার্বন পরমাণুসমূহ এভাবে বহু একতলীয় স্তর তৈরি করে, যারা পরস্পরের সাথে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। স্তরসমূহের মধ্যে কোনো রাসায়নিক বন্ধন নেই, দুর্বল আকর্ষণ বিদ্যমান। এ কারণে স্তরসমূহ পরস্পরের উপর দিয়ে সমান্তরালভাবে চলাচল করতে পারে, তাই গ্রাফাইট নরম ও পিচ্ছিল। প্রতিটি কার্বন পরমাণুতে চারটি ইলেকট্রন আছে, তন্মধ্যে তিনটি ইলেকট্রন অপর তিনটি কার্বন পরমাণুর সাথে বন্ধন সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়, একটি ইলেকট্রন মোটামুটিভাবে মুক্ত থাকায় গ্রাফাইট বিদ্যুৎ পরিবাহী।

হীরক ও গ্রাফাইট একই মৌল হওয়ার প্রমাণ : হীরক ও গ্রাফাইটকে পৃথকভাবে বিশুদ্ধ অক্সিজেনে পোড়ালে শুধুমাত্র কার্বন ডাইঅক্সাইড পাওয়া যায়। 12g হীরক বা গ্রাফাইট হতে 1 মোল অর্থাৎ 44g কার্বন ডাইঅক্সাইড পাওয়া যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে উভয়েই বিশুদ্ধ কার্বন।

কার্বনের অক্সাইডসমূহ : কার্বনের দুইটি প্রধান অক্সাইড হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড। কার্বন মনোক্সাইড বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন গ্যাস। পানিতে খুব কম দ্রবণীয়। এটি নিজে জ্বলে। এটি অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস। এটি নিরপেক্ষ যৌগ। উচ্চ তাপমাত্রায় এটি একটি বিজারক। অপরদিকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বর্ণহীন, মৃদু গন্ধযুক্ত ও অল্পস্বাদ বিশিষ্ট গ্যাস। পানিতে অল্প দ্রবণীয়, দ্রবণে কার্বনিক এসিড তৈরি হওয়ায় তা ঈষৎ অম্লীয়। এটি নিজে জ্বলে না, এটি বিষাক্ত নয়। তবে এটি কোথাও প্রচুর পরিমাণে থাকলে সেখানে অক্সিজেনের অভাব হয় বলে প্রাণীরা সেখানে মারা পড়ে।

কার্বনেটসমূহ : অস্থিতিশীল দুর্বল অম্ল কার্বনিক এসিডের লবণকে কার্বনেট বলা হয়। এতে কার্বনেট আয়ন, CO_3^{2-} বিদ্যমান। সোডিয়াম ও পটাসিয়াম কার্বনেট পানিতে দ্রবণীয়, এরা উত্তাপে বিয়োজিত হয় না। অন্যান্য সকল কার্বনেট পানিতে অদ্রবণীয়, উত্তাপে ধাতু অক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড বিয়োজিত হয়। সকল কার্বনেট লঘু এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে, যা চুনের পানিকে ঘোলা করে। বেশি গ্যাস প্রবাহিত করলে ঘোলা দ্রবণ আবার স্বচ্ছ হয়। এটিই কার্বনেট আয়নের নিশ্চিত পরীক্ষা।

সিলিকন : পর্যায় সারণিতে ৩য় পর্যায়ের গ্রুপ IV মৌল হচ্ছে সিলিকন। প্রাচুর্যের দিক হতে এটি দ্বিতীয় মৌল। ভর অনুপাতে ভূ-ত্বকের শতকরা ২৪ ভাগই সিলিকন। বালু, মাটি এসব হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সিলিকেট। সিলিকন একটি নিষ্ক্রিয় ধরনের মৌল। এর যোজনী ৪।

কাচ : কাচ হচ্ছে সিলিকেটসমূহের মিশ্রণ। সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে বালু অর্থাৎ সিলিকার সাথে উত্তপ্ত করে সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম সিলিকেটের মিশ্রণ তৈরি করা হয়, এটিই সাধারণ কাচ। এতে বিভিন্ন ধাতুর অক্সাইড যোগ করে বিভিন্ন ধরনের কাচ তৈরি করা হয়।

নাইট্রোজেন : নাইট্রোজেন একটি অধাতু। এটি গ্রুপ V মৌল, যা দ্বিতীয় পর্যায়ে অবস্থিত। বাতাসে প্রায় 78% নাইট্রোজেন। নাইট্রোজেন গ্যাস তুলনামূলকভাবে নিষ্ক্রিয়। নাইট্রোজেন উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় মৌল বলে বিভিন্ন নাইট্রোজেন যৌগ সার হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। তন্মধ্যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ইউরিয়া ও অ্যামোনিয়াম সালফেট গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যামোনিয়া : অ্যামোনিয়ার সংকেত NH_3 । এটি একটি গ্যাস, যা পানিতে অত্যধিক দ্রবণীয়, দ্রবণ ক্ষারীয়। অ্যামোনিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌগ, কেননা এর মাধ্যমে অনেক নাইট্রোজেন যৌগ তৈরি করা যায়। শিল্পক্ষেত্রে উচ্চ চাপে অত্যনুকূল তাপমাত্রায় ($450-500^\circ\text{C}$) প্রভাবকের উপস্থিতিতে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের সংযোগে অ্যামোনিয়ার উৎপাদন করা হয়।

অ্যামোনিয়াম লবণ : অ্যামোনিয়ার সাথে বিভিন্ন এসিডের বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম লবণ তৈরি হয়। অ্যামোনিয়াম আয়ন (NH_4^+) ক্ষার ধাতুর আয়নের ন্যায় আচরণ করে। অ্যামোনিয়াম লবণসমূহ প্রায় সকলেই পানিতে ভালো দ্রবণীয়। অ্যামোনিয়াম লবণের সাথে ক্ষার যোগ করলে অ্যামোনিয়া নির্গত হয়, যা দ্বারা অ্যামোনিয়াম আয়ন শনাক্ত হয়।

নাইট্রিক এসিড : এটি একটি অতি শক্তিশালী এসিড, আবার শক্তিশালী জারকও। প্রভাবকের উপস্থিতিতে অ্যামোনিয়াকে বাতাস দ্বারা জারিত করে নাইট্রোজেন অক্সাইড তৈরি করা হয়, যা বাতাস ও পানির সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রিক এসিড তৈরি করে। নাইট্রিক এসিড প্রায় সকল ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে ধাতুর নাইট্রেট ও নাইট্রিক এসিডের বিভিন্ন বিজারণ উৎপাদ তৈরি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ উৎপন্ন হয়। বলয় পরীক্ষায় নাইট্রেট আয়নের শনাক্তকরণ হয়।

ফসফরাস : ফসফরাস গ্রুপ V মৌল, এটি তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থিত। ফসফরাস বহুরূপী মৌল, এর দুইটি প্রধান রূপভেদ আছে। শ্বেত ফসফরাস খুব সক্রিয় ও বিষাক্ত; লোহিত ফসফরাস তুলনামূলকভাবে কম সক্রিয়, এটি অবিষাক্ত। ফসফরাস দিয়াশলাই শিল্পে ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদের জন্য ফসফরাস একটি প্রয়োজনীয় মৌল। অতএব, সুপার ফসফেটকে ও ট্রিপল সুপার ফসফেট সার হিসেবে জমিতে প্রয়োগ করা হয়।

অক্সিজেন : অক্সিজেন গ্রুপ VI মৌল, এটি দ্বিতীয় পর্যায়ে অবস্থিত। অক্সিজেন নিজে জ্বলে না, কিন্তু দহনে সাহায্য করে; বস্তুতপক্ষে সাধারণ দহনে অক্সিজেনের সাথেই বিভিন্ন বস্তুর বিক্রিয়া ঘটে। পৃথিবীতে সকল মৌলের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।

অক্সাইডসমূহ : অক্সিজেন ও অন্য কোনো মৌল পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে যে সকল দ্বি-মৌল যৌগ গঠন করে, তাদেরকে অক্সাইড বলা হয়। অক্সাইডসমূহের চারটি প্রধান শ্রেণীবিভাগ আছে— (১) ক্ষারকীয় অক্সাইড, (২) অম্লীয় অক্সাইড, (৩) উভধর্মী অক্সাইড (৪) নিরপেক্ষ অক্সাইড। ধাতুর অক্সাইডসমূহ সাধারণত ক্ষারকীয়, কিছু কিছু উভধর্মী, কয়েকটি অম্লীয়। অপরদিকে অধাতুর অক্সাইডসমূহ হয় অম্লীয় অথবা নিরপেক্ষ।

নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ : নাইট্রোজেনের বেশ কিছু অক্সাইড আছে। এরা সমযোজী যৌগ হওয়ায় গ্যাসীয় বা উদ্বায়ী কঠিন পদার্থ। এদের কয়েকটি অম্লীয়, অন্যগুলো নিরপেক্ষ।

ফসফরাসের অক্সাইডসমূহ : ফসফরাসের দুইটি প্রধান অক্সাইড হচ্ছে ফসফরাস(III) ও ফসফরাস(V) অক্সাইড। উভয়েই উদ্বায়ী কঠিন পদার্থ এবং অম্লীয়। পানির সাথে যুক্ত হয়ে এরা যথাক্রমে ফসফরাস ও ফসফরিক এসিড তৈরি করে।

সালফারের অক্সাইডসমূহ : সালফারের দুইটি প্রধান অক্সাইড হচ্ছে সালফার ডাই ও ট্রাইঅক্সাইড। উভয়েই অম্লধর্মী এবং পানির সাথে যুক্ত হয়ে যথাক্রমে সালফিউরাস ও সালফিউরিক এসিড তৈরি করে।

সালফার : সালফার একটি গ্রুপ VI মৌল, যা তৃতীয় পর্যায়ে অবস্থিত। সালফার হলুদ বর্ণের ভজুর কঠিন পদার্থ ও অধাতু। প্রকৃতিতে মুক্ত ও যৌগ উভয় অবস্থাতে পাওয়া যায়। উচ্চ তাপ, জলীয় বাষ্প ও বায়ুর সাহায্যে মাটির নিচের সালফারকে পাইপের মাধ্যমে উপরে তুলে আনা হয়। সালফার সক্রিয় মৌল। এটি বিভিন্ন ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে ধাতু সালফাইড এবং বাতাসে পুড়ে সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে। সালফারের বহুরূপতা বিদ্যমান।

সালফিউরিক এসিড : এটিকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ বলে। এটি একটি শক্তিশালী দ্বি-ক্ষারকীয় এসিড। লঘু অবস্থায় এটি সক্রিয় ধাতুসমূহের সাথে বিক্রিয়া করে ধাতু সালফেট ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। গাঢ় সালফিউরিক এসিডের জারক ধর্মও বিদ্যমান। গাঢ় উত্তপ্ত সালফিউরিক এসিড প্রায় সকল ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে ধাতু সালফেট তৈরি করে এবং সে নিজে বিজারিত হয়ে সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে।

হ্যালোজেনসমূহ : গ্রুপ VII মৌলসমূহকে হ্যালোজেন বলা হয়; তবে সাধারণভাবে হ্যালোজেন বলতে ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন বুঝায়। এরা ধাতু পরমাণু হতে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে হ্যালাইড আয়নে পরিণত হয়। সে সময় ধাতু হ্যালাইডসমূহ উৎপন্ন হয়। আয়নিক যৌগ হওয়ায় ধাতু হ্যালাইডসমূহ অনুদায়ী কঠিন পদার্থ এবং অধিকাংশ পানিতে দ্রবণীয়। অধাতুসমূহের সাথে হ্যালোজেনসমূহ সমযোজী যৌগ গঠন করে, যারা উদায়ী তরল বা কঠিন পদার্থ। এরা সাধারণত পানি দ্বারা বিয়োজিত হয়।

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড : হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সংযোগে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। এটি একটি সমযোজী যৌগ এবং সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাস। এটি পানিতে অত্যধিক দ্রবণীয় এবং এর জলীয় দ্রবণকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড বলা হয়। হাইড্রোজেন ক্লোরাইডকে HCl(g) এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিডকে HCl(aq) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। হাইড্রোক্লোরিক এসিড শক্তিশালী এসিড। হাইড্রোজেন ক্লোরাইডকে MnO_2 দ্বারা জারিত করলে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

ক্লোরিন ও ক্লোরাইড আয়নের পারস্পরিক রূপান্তর : ধাতু ক্লোরাইডের সাথে MnO_2 যোগ করে গাঢ় সালফিউরিক এসিডের সাথে উত্তপ্ত করলে ক্লোরাইড আয়ন জারিত হয়ে ক্লোরিন উৎপন্ন করে। অপরদিকে ক্লোরিনকে ধাতু বা হাইড্রোজেন দ্বারা বিজারিত করলে ক্লোরাইড আয়ন তৈরি হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোনটি বহুরূপী মৌল?

- | | |
|---------------|-------------------|
| ক. কার্বন | খ. হিলিয়াম |
| গ. হাইড্রোজেন | ঘ. অ্যালুমিনিয়াম |

২। হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের দ্রবণে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড যোগ করলে উৎপন্ন হয়—

- H_2
- O_2
- Cl_2

কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. iii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটকে উত্তপ্ত করলে নিম্নের বিক্রিয়াটি ঘটে :



উপরের বিক্রিয়া অবলম্বনে নিচের ৩ ও ৪ নং প্রশ্ন দুইটির উত্তর দাও :

৩. 'X' চিহ্নিত যৌগটির নাম কী?

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ক. নাইট্রিক অক্সাইড | খ. নাইট্রাস অক্সাইড |
| গ. নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড | ঘ. নাইট্রোজেন ট্রাইঅক্সাইড |

৪. 'X' গ্যাসটি অধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে কোন মৌলিক গ্যাসটি উৎপন্ন করে?

- | | |
|-----------------|------------------|
| ক. N_2 | খ. O_2 |
| গ. H_2 | ঘ. Cl_2 |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

চট্টগ্রামের কুমিরা নামক স্থানে পুরানো পরিত্যক্ত জাহাজ কেটে খণ্ড খণ্ড করে লৌহজাত নির্মাণ সামগ্রী যেমন সিট, রড ইত্যাদি প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়। ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে কোনো এক দিন হঠাৎ বৃষ্টি হওয়ার পর দেখা গেল যে ঐ স্থানের ফসল ও ছোট ছোট গাছপালা হলদে হয়ে গেল এবং হাঁস-মুরগিসহ বিভিন্ন গবাদি পশুর গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হল। এ বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ঐ স্থানে সে সময় যে জাহাজটি কাটা হয়েছিল, তা সালফার বহন করত। অক্সিজেনসিটিলিন শিখার সাহায্যে জাহাজটি কাটার ফলে ঐ জায়গায় মূলত এসিড বৃষ্টি হয়েছিল।

- এসিড বৃষ্টি কী?
- কুমিরাতে এসিড বৃষ্টি কেন হয়েছিল?
- কুমিরায় কীভাবে এসিড বৃষ্টি সৃষ্টি হয়েছিল তা রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বর্ণনা কর।
- উদ্দীপকে প্রদত্ত কারণ ছাড়াও এসিড বৃষ্টি হওয়ার অন্যান্য কারণ উল্লেখপূর্বক পরিবেশের ওপর এর প্রভাব মূল্যায়ন কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

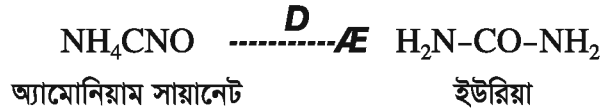
জৈব যৌগ

বিষয়বস্তু : জৈব রসায়ন; জৈব যৌগ ও তাদের শ্রেণীবিভাগ; কার্যকরীমূলক ও সমগোত্রীয় শ্রেণী; হাইড্রোকার্বন, অ্যালকোহল ও ফ্যাটি এসিড : এদের প্রস্তুতির মূলনীতি, কতিপয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্ম ও ব্যবহার, সাবান ও ডিটারজেন্ট প্রস্তুতকরণ ও ব্যবহার।

১৫.১ জৈব রসায়ন (Organic Chemistry)

কার্বনের যৌগসমূহকে জৈব যৌগ বলা হয় এবং রসায়নের যে শাখায় কার্বনের যৌগ সম্পর্কিত তথ্যাদি পর্যালোচনা করা হয়, তাকে জৈব রসায়ন বলা হয়। অবশ্য কার্বনের অক্সাইডসমূহ এবং তাদের জাতক, যেমন ধাতু কার্বনেট ও কার্বনিলসমূহকে এবং ধাতু সায়ানাইড, সায়ানেট, থায়োসায়ানেট প্রভৃতি কিছু যৌগকে অজৈব রসায়নে আলোচনা করা হয়। কার্বন পরমাণুবিহীন প্রায় সকল যৌগ অজৈব যৌগ। জৈব যৌগে অবশ্যই কার্বন থাকে, এছাড়া এক বা একাধিক অন্য মৌল বিদ্যমান, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে (ক্রম অনুসারে) হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন প্রভৃতি।

‘জৈব’ শব্দের উৎস : প্রাণশক্তি মতবাদ ও আধুনিক মতবাদ : চিনি, তেল, ঘি, মাখন, শর্করা, প্রোটিন প্রভৃতি যে সকল পদার্থ উদ্ভিদ বা প্রাণিজগৎ, অর্থাৎ জীবজগৎ হতে পাওয়া যায়, তাদেরকে পূর্বে জৈব যৌগ বলা হত। বালু, খনিজ প্রভৃতি নির্জীব পদার্থ হতে যে সকল যৌগ পাওয়া যায়, তাদেরকে অজৈব যৌগ বলা হত। ১৮-২৮ সালের পূর্বে জৈব যৌগসমূহকে পরীক্ষাগারে তৈরি করা যেত না, এ কারণে সকলের ধারণা ছিল যে, জৈব যৌগসমূহ এক রহস্যময় শক্তির প্রভাবে শুধু প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে সৃষ্টি হয়। এ রহস্যময় শক্তিকে ‘প্রাণশক্তি’ (vital force) বলা হত। সুইডিশ বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু বিজ্ঞানী ফ্রিডরিখ ভোলার (Friedrich Wohler) (জার্মান ভাষায় W-এর উচ্চারণ বাংলা ‘ভ’-এর ন্যায়) অজৈব যৌগ অ্যামোনিয়াম সায়ানেটকে উত্তপ্ত করে জৈব যৌগ ইউরিয়া প্রস্তুত করেন।



এ থেকে প্রমাণিত হয় যে জৈব যৌগ উৎপাদনে প্রাণশক্তির কোনো প্রভাব নেই। এদিকে ফরাসি রসায়নবিদ ল্যাভয়সিয়ারের পরীক্ষা হতে প্রমাণিত হয় যে সকল জৈব যৌগে কার্বন বিদ্যমান; এছাড়া অন্যান্য মৌলও আছে। জৈব ও অজৈব যৌগের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য না থাকলেও জৈব যৌগের অস্বাভাবিক উচ্চ সংখ্যার কারণে এদেরকে নিয়ে পৃথক শাখা গড়ে ওঠে।

জৈব যৌগের প্রাচুর্যের কারণ : কার্বন পরমাণুর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এটি একই মৌলের পরমাণুর সাথে বিভিন্ন ধরনের শক্তিশালী ও সুস্থিত বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে। একই মৌলের পরমাণুসমূহের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের শিকল গঠনের ধর্মকে ক্যাটেনেশন বলা হয়। একমাত্র সালফার ও সিলিকন সামান্য পরিমাণে এ ধর্ম দেখালেও কার্বনই সত্যিকারভাবে এ ধর্ম প্রদর্শন করে। এছাড়া কার্বন পরমাণুর যোজনী ৪। সুতরাং এটি নিজেদের মধ্যে একক, দ্বি ও ত্রি-বন্ধন গঠন করার পরেও অন্যান্য মৌলের পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়। এছাড়া জৈব যৌগে সমাগুতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়; অর্থাৎ একই আণবিক সংকেত কিন্তু ভিন্ন আণবিক গঠন বিশিষ্ট একাধিক যৌগের উপস্থিতি দেখা যায়। এ সকল কারণে জৈব যৌগের সংখ্যা খুব বেশি।

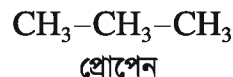
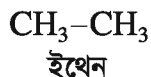
১৫.২ জৈব যৌগের শ্রেণীবিভাগ (Classification of organic compounds)

জৈব যৌগের সংখ্যা খুব বেশি হওয়ায় অধ্যয়নের সুবিধার জন্য এদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা প্রয়োজন। এ শ্রেণী-বিভাগ দুইটি দৃষ্টিকোণ হতে করা হয়। কার্বন শিকলের প্রকৃতি এবং কার্যকরী মূলক। কার্বন শিকলের প্রকৃতি অনুযায়ী

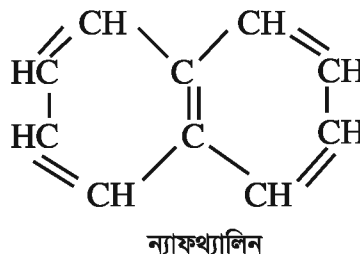
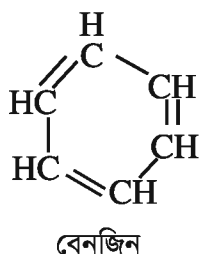
জৈব যৌগসমূহকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

(১) অ্যালিফেটিক যৌগ, (২) অ্যারোমেটিক যৌগ।

(১) অ্যালিফেটিক যৌগ : যে সকল জৈব যৌগের অণুতে কার্বন পরমাণুসমূহের মুক্ত শিকল বিদ্যমান, তাদেরকে অ্যালিফেটিক যৌগ বলা হয়। যেমন :



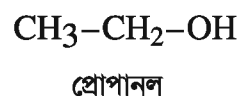
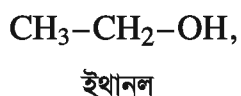
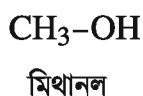
(২) অ্যারোমেটিক যৌগ : যে সকল যৌগের অণুতে এক বা একাধিক বেনজিন চক্র বিদ্যমান, তাদেরকে অ্যারোমেটিক যৌগ বলা হয়। এদের ধর্ম অ্যালিফেটিক যৌগ অপেক্ষা ভিন্ন। যেমন :



এ পুস্তকে শুধু অ্যালিফেটিক যৌগ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

১৫.৩ কার্যকরী মূলক (Functional groups)

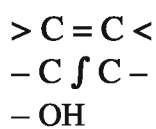
তোমরা নিচের তিনটি যৌগের গাঠনিক সংকেত লক্ষ কর :



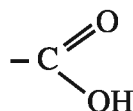
এদের প্রত্যেকের অণুতে একটি হাইড্রক্সিল ($-\text{OH}$) মূলক বিদ্যমান। এদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে গভীর মিল রয়েছে। বিশেষ করে এরা একই ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া দেয়। এ সকল বিক্রিয়ায় $-\text{OH}$ অংশে পরিবর্তন হয়, অন্য অংশ নিষ্ক্রিয় থাকে (এ অধ্যায়ের শেষ দিকে অ্যালকোহল অংশ দেখ)। এ থেকে বুঝা যায় যে, $-\text{OH}$ গ্রুপ এ সকল যৌগের ধর্ম ও বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং এ গ্রুপকে এ সকল যৌগের কার্যকরী মূলক বলা হয়। এ ধরনের আরো অনেক কার্যকরী মূলক আছে।

যে পরমাণু বা মূলক কোনো জৈব যৌগের অণুতে বিদ্যমান থেকে কার্যত তার ধর্ম ও বিক্রিয়া নির্ধারণ করে, তাকে ঐ যৌগের কার্যকরী মূলক বলা হয়। যেমন :

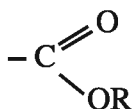
অ্যালকিনের কার্যকরী মূলক, কার্বন-কার্বন দ্বি-বন্ধন,
অ্যালকাইনের কার্যকরী মূলক কার্বন-কার্বন ত্রি-বন্ধন,
অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক হচ্ছে হাইড্রক্সিল মূলক,



জৈব এসিডের কার্যকরী মূলক হচ্ছে কার্বক্সিল মূলক,

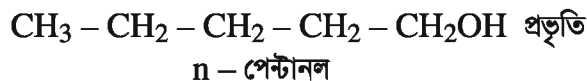


এস্টারের কার্যকরী মূলক হচ্ছে এস্টার মূলক—



১৫.৪ সমগোত্রীয় শ্রেণী (Homologous series)

তোমরা একটু আগে উল্লিখিত তিনটি যৌগের দিকে আবার লক্ষ কর। এদের মধ্যে পার্থক্য কী? একটি $-\text{CH}_2-$ গ্রুপ। সুতরাং আমরা এ গ্রুপ ক্রমাগত যোগ করে আরো অসংখ্য যৌগের সংকেত নিতে পারি, যাদের ধর্ম একই ধরনের হবে; সুতরাং তারা একই শ্রেণীভুক্ত; এদেরকে একত্রে সমগোত্রীয় শ্রেণী বলা হয়। যেমন :



একই কার্যকরী মূলক বিশিষ্ট এবং একই ধরনের ধর্মবিশিষ্ট জৈব যৌগসমূহকে একত্রে সমগোত্রীয় শ্রেণী বলা হয়। কার্যকরী মূলক অনুসারে সমগোত্রীয় শ্রেণীসমূহের নামকরণ করা হয়। যেমন : $-\text{OH}$ গ্রুপ বিশিষ্ট অ্যালিফেটিক যৌগসমূহকে অ্যালকোহল বলা হয়। সমগোত্রীয় শ্রেণীসমূহের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান :

(১) একই শ্রেণীভুক্ত সকল সদস্যের একটি সাধারণ আণবিক সংকেত থাকবে। যেমন অ্যালকোহলসমূহের ক্ষেত্রে সাধারণ সংকেত $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$, অ্যালকেনের ক্ষেত্রে $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ । এখানে $n = 1, 2, 3$ ইত্যাদি।

(২) প্রতিটি সদস্যের আণবিক সংকেতে পূর্ববর্তী সদস্যের চেয়ে $-\text{CH}_2-$ বেশি হবে। যেমন : অ্যালকেনের ক্ষেত্রে $\text{CH}_4, \text{C}_2\text{H}_6, \text{C}_3\text{H}_8, \text{C}_4\text{H}_{10}$ এবং এভাবে চলবে।

(৩) সকল সদস্য একই রূপ রাসায়নিক বিক্রিয়া দেবে, যদিও বিক্রিয়ার গতি ও তীব্রতা ভিন্ন হতে পারে। যেমন : সকল অ্যালকোহল সোডিয়াম ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত করে।

(৪) সদস্যদের ভৌতধর্ম ক্রমান্বয়ে একই দিকে পরিবর্তিত হয়। যেমন : অ্যালকেনসমূহের ক্ষেত্রে গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক আণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ে (সারণি ১৫.১ দ্রষ্টব্য), এ কারণে সাধারণ তাপমাত্রায় ও চাপে CH_4 গ্যাস, C_6H_{14} তরল এবং $\text{C}_{20}\text{H}_{42}$ কঠিন পদার্থ।

(৫) সংশ্লেষণের সাধারণ পদ্ধতিসমূহ সকল সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

সারণি ১৫.১ : কয়েকটি অ্যালকেনের ভৌত ধর্ম

অ্যালকেন	আণবিক সংকেত	গলনাঙ্ক ($^{\circ}\text{C}$)	স্ফুটনাঙ্ক ($^{\circ}\text{C}$)	ভৌত অবস্থা
মিথেন	CH_4	-183	-162	গ্যাস
ইথেন	C_2H_6	-172	-89	"
প্রোপেন	C_3H_8	-188	-42	"
বিউটেন	C_4H_{10}	-135	-1	"
পেন্টেন	C_5H_{12}	-130	36	তরল
হেক্সেন	C_6H_{14}	-95	69	"
হেপ্টেন	C_7H_{16}	-91	98	"
অক্টেন	C_8H_{18}	-57	126	"
ননেন	C_9H_{20}	-54	151	"
ডেকেন	$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	-30	174	"

১৫.৫ হাইড্রোকার্বনসমূহ (Hydrocarbons)

শুধুমাত্র হাইড্রোজেন ও কার্বন বিশিষ্ট যৌগসমূহকে হাইড্রোকার্বন বলা হয়। যেমন $\text{CH}_4, \text{C}_2\text{H}_6, \text{C}_6\text{H}_6, \text{C}_6\text{H}_{12}$ প্রভৃতি। আণবিক গঠন অনুযায়ী অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা : (ক) সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন, (খ) অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন।

CH_3-CH_3 ,	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
ইথেন	প্রোপেন

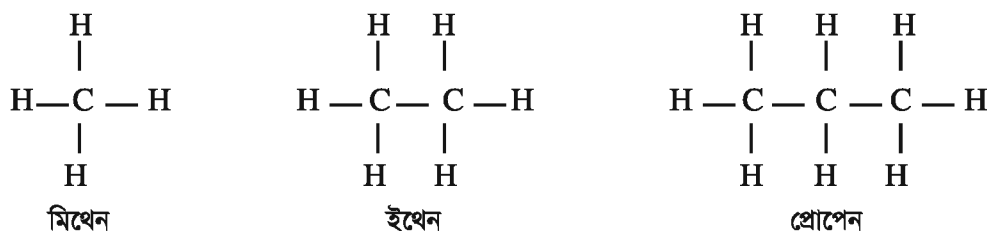
$\text{CH}_2 = \text{CH}_2,$	$\text{HC} \equiv \text{CH},$
ইথিন	ইথাইন

১৫.৬ অ্যালকেনসমূহ (Alkanes)

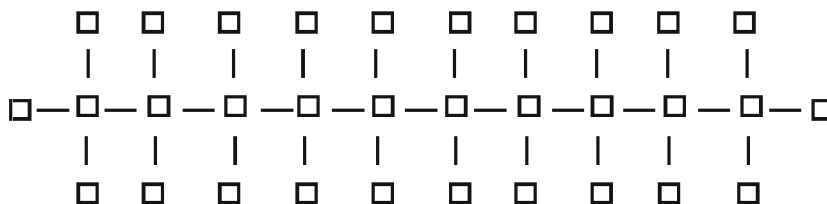
এদের সাধারণ আণবিক সংকেত C_nH_{2n+2} ($n=1, 2, 3-\dots$)। এ শ্রেণীর প্রথম ($n=1$) সদস্যের নাম মিথেন CH_4 এবং দ্বিতীয় সদস্য ($n=2$) হচ্ছে ইথেন C_2H_6 । সারণি ১৫.১ এ শ্রেণীর প্রথম কিছু সদস্যের নাম ও কিছু ধর্ম দেওয়া হয়েছে। প্রথম চারটি ব্যতীত অন্যান্য যৌগের নাম অণুতে বর্তমান কার্বন পরমাণুর সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। যেমন '5'-এর গ্রিক নাম penta। এর সাথে অ্যালকেনের 'ane' যোগ করে C_5H_{12} এর নামকরণ হয়েছে pentane (পেন্টেন)। উচ্চতর অন্যান্য অ্যালকেনের ক্ষেত্রে একই রীতি অবলম্বন করা হয়েছে। প্রতিটি অ্যালকেনের নামের শেষে এন (ane) থাকবে।

অ্যালকেনসমূহের গঠন

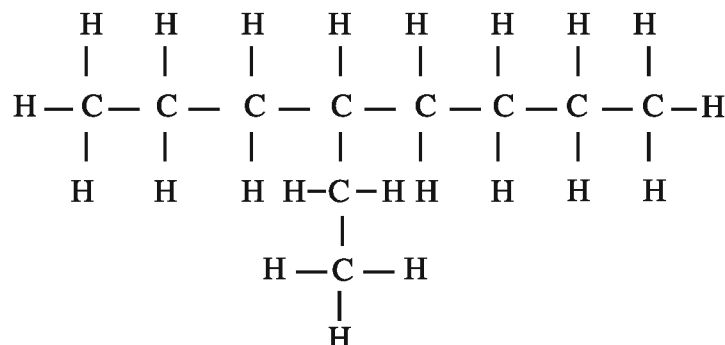
অ্যালকেনসমূহে প্রতিটি কার্বন পরমাণুর 4 যোজ্যতা ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সরলতম অ্যালকেনের সংকেত CH_4 প্রতিটি সমযোজী বন্ধনে এক জোড়া ইলেকট্রন ব্যবহৃত হয়, যার একটি কার্বন পরমাণু হতে এবং অন্যটি হাইড্রোজেন পরমাণু অথবা কার্বন পরমাণু হতে আসে। উচ্চতর অ্যালকেনসমূহে কার্বন পরমাণুসমূহ সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে যুক্ত থেকে শিকলের সৃষ্টি করে। শিকলে দুইটি ও তিনটি কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট যৌগের গঠন মিথেনের সাথে দেখানো হল :



মনে রাখতে হবে যে, মিথেনের গঠন চতুস্তলকীয়। অন্যান্য অ্যালকেনেও প্রতিটি কার্বন পরমাণু চতুস্তলকীয়ভাবে অন্যান্য পরমাণুর সাথে যুক্ত। সুতরাং এ সকল যৌগ সমতলীয় নয়, যদিও ছাপার সুবিধার জন্য সেভাবে আঁকা হয়েছে। কার্বন-কার্বন বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে অনেক বড় শিকলও তৈরি হয়; যেমন ডেকেনের ক্ষেত্রে :



অনেক অ্যালকেনের অণুতে শাখা কার্বন শিকল বিদ্যমান, যেমন :



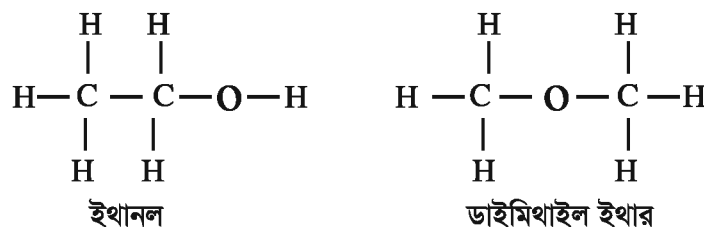
অ্যালকেনের উৎস : মাটির নিচে যে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়, তা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন অ্যালকেনের মিশ্রণ। বাংলাদেশে যে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় তা প্রায় সম্পূর্ণরূপে মিথেন; একে পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়িতে রান্নাঘরে ও শিল্প কারখানায় সরবরাহ করা হয়। সিলিভারে করে যে গ্যাস বিক্রি করা হয়, তা প্রধানত বিউটেন। এর স্ফুটনাঙ্ক কক্ষ তাপমাত্রা হতে খুব কম না হওয়ায় একে চাপ দিয়ে তরল করে সিলিভারে ঢুকানো হয়। পেট্রেন হতে পরবর্তী বেশ কিছু অ্যালকেন সাধারণ তাপমাত্রায় তরল। এদেরকে পেট্রল, কেরোসিন প্রভৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উচ্চতর অ্যালকেনসমূহ কঠিন পদার্থ। মোম হিসেবে এদের ব্যবহার বিদ্যমান।

১৫.৭. অ্যালকাইল মূলক (Alkyl radical)

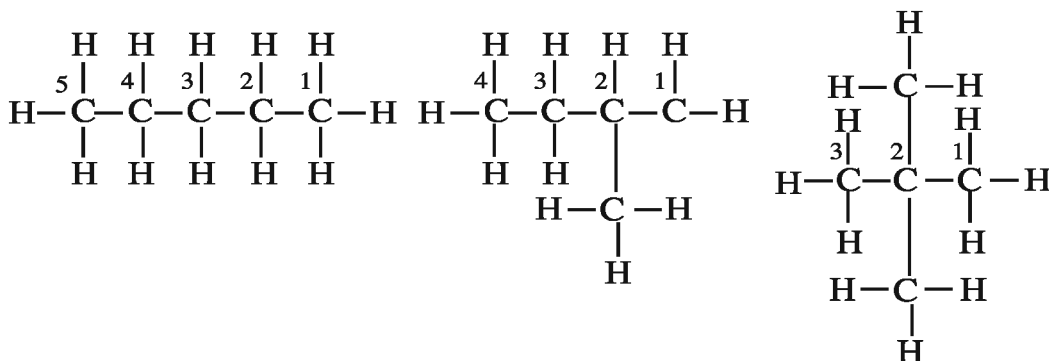
অ্যালকেনের অণু হতে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপসারণ করলে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাকে অ্যালকাইল মূলক বলা হয়। মূল হাইড্রোকার্বনের নামের শেষে এন (ane) বাদ দিয়ে সেখানে আইল(-yl) যোগ করলে অ্যালকাইল মূলকের নাম পাওয়া যায়। যেমন মিথেন CH_4 হতে মিথাইল মূলক CH_3- ; ইথেন C_2H_6 হতে ইথাইল মূলক C_2H_5- । অ্যালকাইল মূলক একযোজী মূলক হিসেবে কাজ করে, অ্যালকাইল মূলকের সাধারণ সংকেত $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}$ । অর্থাৎ অ্যালকেন অপেক্ষা এতে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু কম। অ্যালকাইল মূলককে সাধারণভাবে 'R-' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

১৫.৮ সমাণুতা (Isomerism)

একই আণবিক সংকেত কিন্তু ভিন্ন গাঠনিক সংকেত বিশিষ্ট একাধিক যৌগের অস্তিত্বকে সমাণুতা বলা হয়। $\text{C}_{10}\text{H}_{22}$ সংকেত বিশিষ্ট দুইটি যৌগের আণবিক গঠনই ইতোপূর্বে দেখানো হয়েছে। এদের আণবিক সংকেত এক হলেও এরা দুইটি পৃথক যৌগ, যাদের ধর্মে পার্থক্য বিদ্যমান। এদেরকে একে অন্যের সমাণু (Isomer) বলা হয়। $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ এ সংকেত বিশিষ্ট যৌগের দুইটি আণবিক গঠন নিম্নে দেখানো হল :



এ দুইটি পৃথক আণবিক গঠন বিশিষ্ট যৌগ হচ্ছে ইথানল ও ডাইমিথাইল ইথার। এ দুইটি যৌগ দুইটি ভিন্ন সমগোত্রীয় শ্রেণীর সদস্য। এ কারণে উভয়ের ধর্মে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। অপরদিকে C_5H_{12} আণবিক সংকেত বিশিষ্ট তিনটি গাঠনিক সংকেত সম্ভব।



(ক) পেন্টেন

(খ) 2- মিথাইল বিউটেন

(গ) 2, 2- ডাইমিথাইল প্রোপেন

অ্যালকেনের নামকরণ : আধুনিক (IUPAC) পদ্ধতি

(১) কোনো যৌগের অণুতে দীর্ঘতম কার্বন শিকল নির্ণয় করা হয় এবং যৌগটিকে ঐ শিকলে যতটি কার্বন পরমাণু বিদ্যমান, ততসংখ্যক n - হাইড্রোকার্বনের জাতক হিসেবে ধরা হয়। সুতরাং এ হিসেবে (ক) হচ্ছে n -পেন্টেন, কিন্তু (খ) এর অণুতে দীর্ঘতম শিকল চারটি কার্বন পরমাণু থাকায় একে n -বিউটেনের জাতক, এবং (গ) এর অণুতে দীর্ঘতম শিকলে তিনটি কার্বন পরমাণু থাকায় একে প্রোপেনের জাতক হিসেবে ধরা হয়।

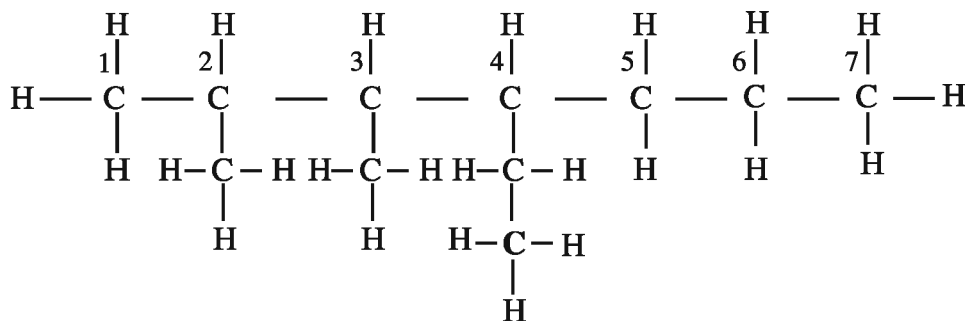
(২) দীর্ঘতম কার্বন শিকলের পরমাণু সংখ্যাসমূহকে এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত 1, 2, 3 ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। দীর্ঘতম শিকলে পার্শ্ব শিকলের অবস্থানকে এ সকল সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করা হয়। যে দিক হতে গণনা করলে পার্শ্ব শিকলসমূহের অবস্থান নির্দেশক সংখ্যা বা সংখ্যাসমূহের যোগফল ক্ষুদ্রতম হয়, সেদিক হতে কার্বন পরমাণুসমূহকে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করতে হয়। যেমন (খ) যৌগের দুইভাবে কার্বন পরমাণুসমূহের সংখ্যা দেওয়া সম্ভব।

১ম হিসাবে পার্শ্ব শিকল 3 নং কার্বন পরমাণুতে এবং ২য় হিসাবে পার্শ্ব শিকল 2 নং কার্বন পরমাণুতে যুক্ত। সুতরাং ২য় হিসাবে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা গণনা করতে হবে।

(৩) দীর্ঘতম যত নম্বর শিকলে যে যে মূলক বা পরমাণু যুক্ত, সে সকল নম্বর ও মূলকের নাম মূল হাইড্রোকার্বনের নামের পূর্বে যোগ করে যৌগের নামকরণ করতে হবে। একটি মূলক কয়েকবার থাকলে তার পূর্বে ডাই; ট্রাই প্রভৃতি যোগ করতে হবে; কার্বন পরমাণুর নম্বরও ততবার উল্লেখ করতে হবে।

(খ) যৌগের নাম 2-মিথাইল বিউটেন। (গ) যৌগের নাম 2, 2-ডাই মিথাইল প্রোপেন।

আরেকটি যৌগের নামকরণ উদাহরণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে :



2, 3-ডাইমিথাইল - 4 - ইথাইল হেপ্টেন

এ যৌগের দীর্ঘতম কার্বন শিকলে ৭টি পরমাণু আছে; সুতরাং একে হেপ্টেনের জাতক হিসেবে গণ্য করতে হবে।

বাম দিক হতে কার্বন পরমাণুসমূহের সংখ্যা গণনা করা হলে পার্শ্ব শিকল বিশিষ্ট কার্বন পরমাণুসমূহের নম্বর হচ্ছে ২, ৩ ও ৪। ডানদিক হতে কার্বন পরমাণুসমূহের সংখ্যা গণনা করা হলে পার্শ্ব শিকল বিশিষ্ট কার্বন পরমাণুসমূহের নম্বর হচ্ছে ৪, ৫ ও ৬। $2 + 3 + 4 = 9$; $4 + 5 + 6 = 15$, দেখা যায় যে, বামদিক হতে গণনা করলে নম্বরসমূহের যোগফল সবচেয়ে কম, সুতরাং সেভাবে গণনা করতে হবে।

এখন দেখা যায় ২ ও ৩ নং কার্বনে দুইটি মিথাইল মূলক এবং ৪ নং কার্বনে একটি ইথাইল মূলক সংযুক্ত। সুতরাং এ যৌগটির আধুনিক নাম হচ্ছে ২, ৩ - ডাই মিথাইল - ৪ - ইথাইল হেপ্টেন।

১৫.৯ অ্যালকেনসমূহের প্রস্তুতি : (Preparation of alkenes)

(১) ফ্যাটি এসিডের সোডিয়াম লবণকে সোডালাইমের সাথে উত্তপ্ত করলে অ্যালকেন উৎপন্ন হয়। এ সময় ফ্যাটি এসিড হতে CO_2 অংশ দূরীভূত হওয়ায় কার্বন পরমাণুর সংখ্যা এক কমে। যেমন-



(২) উর্টজ বিক্রিয়ার সাহায্যে (Wurtz reaction) : শুষ্ক ইথারে দ্রবীভূত অ্যালকাইল হ্যালাইডকে ধাতব সোডিয়ামের সাথে উত্তপ্ত করলে অ্যালকেন উৎপন্ন করে। যেমন ইথাইল আয়োডাইডের সাথে সোডিয়ামের বিক্রিয়ায় বিউটেন উৎপন্ন হয়।



১৫.১০ অ্যালকেনসমূহের ধর্ম : (Properties of alkanes)

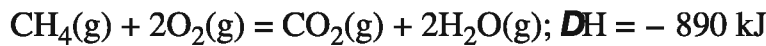
ভৌত ধর্ম : (১) অ্যালকেনসমূহ বর্ণহীন ও প্রায় গন্ধহীন উদ্বায়ী যৌগ। এদের কিছু ভৌত ধর্ম সারণি ১৫.১ এ উল্লেখিত হয়েছে।

(২) এরা পানিতে অদ্রবণীয়, তবে বিভিন্ন জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়। (৩) তরল ও কঠিন অবস্থায় এরা পানি অপেক্ষা হালকা।

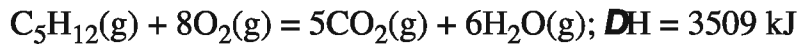
রাসায়নিক ধর্ম : C-C এবং C-H বন্ধনসমূহ শক্তিশালী হওয়ায় অ্যালকেনসমূহ রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়। এরা সাধারণ অবস্থায় তীব্র এসিড, ক্ষারক ও জারক বা বিজারক পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে না। তবে নিম্নের কিছু বিক্রিয়ায় এরা অংশগ্রহণ করে।

১। দহন : অ্যালকেনসমূহ দাহ্য পদার্থ। পর্যাপ্ত বায়ু বা অক্সিজেন দহন করলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও স্টিম উৎপন্ন হয়।

এ সময় প্রচুর তাপ নির্গত হয়। যেমন প্রাকৃতিক গ্যাস মিথেনের দহন

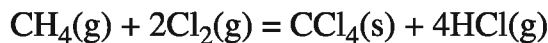


পেট্রলের একটি উপাদান পেন্টেনের দহন :

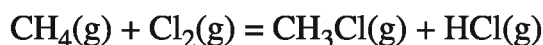


এ কারণে এদের দহন হতে প্রচুর শক্তি পাওয়া যায়, যা রান্না, যানবাহন চালানো প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়।

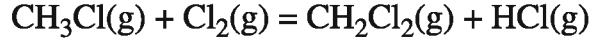
২। ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া : (ক) প্রখর সূর্যালোকে বা অতিবেগুনি রশ্মিতে বা উত্তপ্ত করলে অ্যালকেন ও ক্লোরিন বিক্রিয়া করে কার্বন ডেট্রাক্লোরাইড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে।



বিক্টিপ্ত সূর্যালোকে বা আয়রন গুঁড়া প্রভাবকের উপস্থিতিতে হাইড্রোকার্বন হতে হাইড্রোজেন পরমাণু ক্লোরিন পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।



অতিরিক্ত ক্লোরিনের উপস্থিতিতে এ প্রতিস্থাপন ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে। তবে পরবর্তী ধাপসমূহ ক্রমশ কঠিনতর হয়।



উল্লিখিত দুইটি বিক্রিয়াই মোটামুটি সাধারণ অবস্থায় চালনা করা যায়। অন্যান্য বিক্রিয়ার জন্য খুব উচ্চ তাপমাত্রা, চাপ প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। অ্যালকেনসমূহের নিষ্ক্রিয়তার জন্য এদের অন্য নাম প্যারাকিন। এ ল্যাটিন শব্দটির অর্থ হচ্ছে ‘আকর্ষণ নেই।’

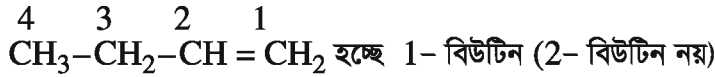
ব্যবহার : অ্যালকেনসমূহ প্রধানত গৃহস্থালিতে, মোটর গাড়ি ও শিল্প কারখানায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়ামকে উচ্চতাপে ভেঙে বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন তৈরি করা হয়, যা থেকে অনেক মূল্যবান যৌগ তৈরি করা হয়।

১৫.১১ অ্যালকিনসমূহ (Alkenes)

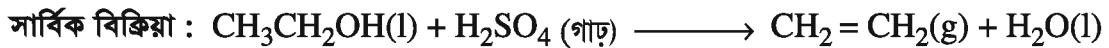
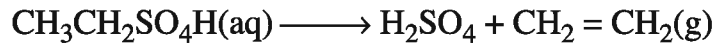
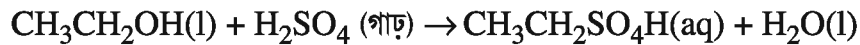
কার্বন-কার্বন দ্বি-বন্ধন যুক্ত অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনসমূহকে অ্যালকিন বলা হয়। এদের সাধারণ সংকেত হচ্ছে C_nH_{2n} , অর্থাৎ অনুরূপ অ্যালকেন হতে এদের দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু কম আছে। যেমন :

অ্যালকেন	অ্যালকিন
ইথেন (C_2H_6)	ইথিন (C_2H_4)
প্রোপেন (C_3H_8)	প্রোপিন (C_3H_6)
বিউটেন (C_4H_{10})	বিউটিন (C_4H_8)

যেহেতু কার্বন-কার্বন দ্বি-বন্ধন সৃষ্টির জন্য দুইটি কার্বন পরমাণু প্রয়োজন, এ ক্রমে সর্বপ্রথম সদস্য হচ্ছে ইথিন। অ্যালকিনসমূহের নামকরণ অ্যালকেনের অনুরূপ, তবে ‘এন’ (ane) এর পরিবর্তে ‘ইন’ (ene) হবে এবং যে দুইটি কার্বন পরমাণুর মধ্যে দ্বি-বন্ধন বিদ্যমান, তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে উল্লেখ করতে হবে যেমন :



প্রস্তুতি : (১) অ্যালকোহল হতে পানি অপসারণ করে : গাঢ় সালফিউরিক এসিড, অ্যালকোহল হতে এক অণু পানি অপসারণ করলে অ্যালকিন তৈরি হয়। সাধারণ তাপে অতিরিক্ত গাঢ় সালফিউরিক এসিড ব্যবহৃত হয়। প্রথম ধাপে অ্যালকাইল হাইড্রোজেন সালফেট উৎপন্ন হয়, যা উত্তাপে বিয়োজিত হয়ে অ্যালকিন তৈরি করে। যেমন ইথানল ও গাঢ় সালফিউরিক এসিডের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে :



(২) অ্যালকাইল হ্যালাইড হতে হাইড্রোজেন হ্যালাইড অপসারণ করে : অ্যালকাইল হ্যালাইডকে অ্যালকোহলীয় NaOH বা KOH দ্রবণের সাথে উত্তপ্ত করলে তা হতে এক অণু হাইড্রোজেন হ্যালাইড অপসারিত হয়ে অ্যালকিন উৎপন্ন করে। হাইড্রোজেন হ্যালাইড NaOH-এর সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।



(৩) পেট্রোলিয়ামের তাপীয় বিয়োজন দ্বারা : শিল্পক্ষেত্রে খনিজ পেট্রোলিয়ামকে উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে কমসংখ্যক কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেনসহ অ্যালকিন উৎপন্ন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ :

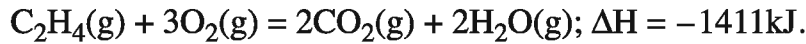


উচ্চতর অ্যালকেন অক্টেন ইথিন প্রোপিন

ভৌত ধর্ম : অ্যালকিনসমূহের ভৌত ধর্ম অ্যালকেনসমূহের অনুরূপ। এরা বর্ণহীন, স্বাদহীন ও গন্ধহীন উদ্বায়ী পদার্থ। এদের স্ফুটনাঙ্ক, গলনাঙ্ক, কার্বন পরমাণুর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে বাড়ে। সাধারণ তাপমাত্রায় ও চাপে বিউটিন পর্যন্ত এরা গ্যাসীয়, পরবর্তী অ্যালকিনসমূহ তরল, অনেক উচ্চতর অ্যালকিন কঠিন। এরা পানিতে অদ্রবণীয়, কিন্তু জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়।

রাসায়নিক ধর্ম : অ্যালকিনসমূহের রাসায়নিক ধর্ম কার্বন দ্বি-বন্ধন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এ দ্বি-বন্ধনের কারণে এরা অনেক সংযোজন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, তখন এ দ্বি-বন্ধন ভেঙে যায় এবং একক বন্ধনের সৃষ্টি হয়।

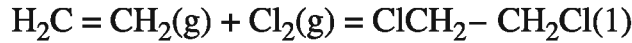
(১) **দহন :** হাইড্রোকার্বন হওয়ার কারণে এরা পর্যাপ্ত বাতাসে বা অক্সিজেনে পুড়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে (অ্যালকেনের সাথে সাদৃশ্য)



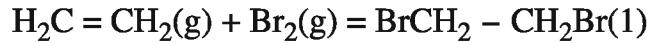
কিন্তু অ্যালকিনে কার্বনের পরিমাণ বেশি থাকায় সাধারণ বাতাসে শিখায় কিছু কার্বন অজারিত অবস্থায় থেকে যায় এবং কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি করে।

(২) **সংযোজন বিক্রিয়াসমূহ :** অ্যালকিনসমূহ বিভিন্ন সংযোজন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, এ সময় প্রতিটি কার্বন পরমাণুতে একটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু বা তার সমতুল্য কোনো পরমাণু বা মূলক যুক্ত হয়। নিম্নে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যমূলক উদাহরণ দেওয়া হল :

(ক) **ক্লোরিন বা ব্রোমিনের সাথে বিক্রিয়া :** কক্ষ তাপমাত্রায় ইথিন এক অণু ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়ে 1,2-ডাইক্লোরোইথেন তৈরি করে।

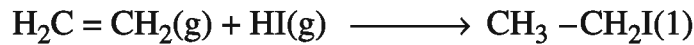


ব্রোমিনের সাথেও অনুরূপ বিক্রিয়া হয় :



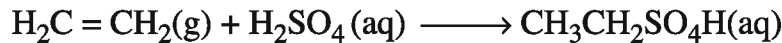
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ব্রোমিনের বর্ণ লাল। সুতরাং ব্রোমিনের জলীয় দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া হলে অথবা কোনো জৈব দ্রাবকে ব্রোমিন নিয়ে বিক্রিয়া করলে এ লাল বর্ণ দূরীভূত হয়। সুতরাং এভাবে অতি সহজে অ্যালকিনকে শনাক্ত করা যায়; অ্যালকেনসমূহ এত দ্রুত ব্রোমিনের সাথে কোনো বিক্রিয়া করে না।

(খ) **হাইড্রোজেন আয়োডাইডের সাথে বিক্রিয়া :** ইথিন দ্রুত এক অণু হাইড্রোজেন আয়োডাইডের সাথে সংযুক্ত হয় এবং ইথাইল আয়োডাইড তৈরি করে।

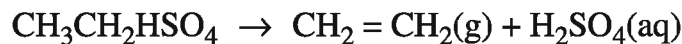


হাইড্রোজেন ব্রোমাইড ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড অনুরূপভাবে বিক্রিয়া করে, তবে তাদের বিক্রিয়া ধীরগতি সম্পন্ন।

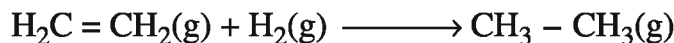
(গ) **গাঢ় সালফিউরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া :** ইথিন গাঢ় সালফিউরিক এসিড দ্বারা সহজেই শোষিত হয়।



একে 180°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে বিক্রিয়াটি বিপরীত দিকে অগ্রসর হয় এবং ইথিন নির্গত হয়।



(ঘ) **হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া :** নিকেল চূর্ণ প্রভাবকের উপস্থিতিতে প্রায় 200°C তাপমাত্রায় ও উচ্চ চাপে অ্যালকিন হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অ্যালকেন উৎপন্ন করে।



এখানে উল্লেখ্য যে, ভোজ্য তেলে অসম্পৃক্ততা অর্থাৎ কার্বন-কার্বন দ্বি-বন্ধন বিদ্যমান। ভেষজ তেলের মধ্য দিয়ে অনুরূপভাবে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবাহিত করলে কার্বন-কার্বন দ্বি-বন্ধন একক বন্ধনে পরিণত হয় এবং উভয় কার্বন

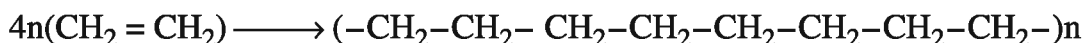
পরমাণুতে একটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু সংযুক্ত হয়। এর ফলে তেলের গলনাঙ্ক কিছুটা বাড়ে, ফলে তা ঘিয়ের মতো হয়। একে আমাদের দেশে বনস্পতি ঘি বা ডালডা নামে বিক্রি করা হয়।

(৬) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সাথে বিক্রিয়া : সাধারণ তাপমাত্রায় ইথিন পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের জলীয় দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে ইথেন-১, ২-ডাইওল বা ইথিলিন গ্লাইকল তৈরি করে।



অক্সিজেন পরমাণুটি পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট হতে আসে। যদি অক্সীয় দ্রবণ ব্যবহার করা হয়, তবে তীব্র বেগুনি বর্ণের পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ বর্ণহীন হয়। অ্যালকেনসমূহ এ বিক্রিয়া দেয় না। সুতরাং গ্যাসীয় অ্যালকেনসমূহ হতে ইথিনকে পৃথকভাবে শনাক্ত করতে এ বিক্রিয়া খুবই ফলপ্রসূ।

(৩) পলিমার গঠন বিক্রিয়া : অতি সামান্য পরিমাণ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে 100 atm চাপে ইথিনকে তাপ দিলে তা একটি প্লাস্টিকে পরিণত হয়, যার নাম পলিইথিন বা পলিথিন।

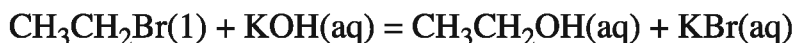


এ সময় কয়েকশত ইথিন অণু একত্রিত হয়ে একটি বড় অণু সৃষ্টি করে। এ ধরনের বিক্রিয়াকে পলিমার গঠন বিক্রিয়া এবং উৎপাদিত দ্রব্যকে পলিমার বলা হয়। সকল অ্যালকিন এ বিক্রিয়া দেয়। উৎপাদিত বস্তু প্রকৃতপক্ষে উচ্চ আণবিক ভর বিশিষ্ট একটি অ্যালকেন। সুতরাং এটি সুস্থিত ও রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়। উদ্ভাপে এটি নরম হয়, তখন এটি দিয়ে বিভিন্ন বস্তু তৈরি করা যায়।

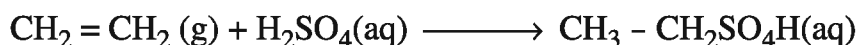
১৫.১২ অ্যালকোহলসমূহ (Alcohols)

হাইড্রোকার্বনের অণু হতে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু হাইড্রোক্সিল গ্রুপ(-OH) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে যে যৌগসমূহ গঠিত হয়, তাদেরকে অ্যালকোহল বলা হয়। অ্যালকেন হতে উদ্ভূত অ্যালকোহলসমূহের সাধারণ সংকেত $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{OH}$ । এ শ্রেণীর প্রথম সদস্য হচ্ছে মিথানল বা মিথাইল অ্যালকোহল CH_3OH , দ্বিতীয় সদস্য হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল বা ইথানল $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ । এখানে ইথানল সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

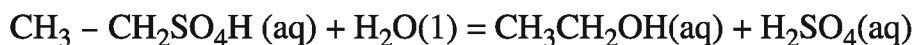
অ্যালকোহলের প্রস্তুতি : (১) অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে কস্টিক সোডা বা পটাসের জলীয় দ্রবণকে উত্তপ্ত করলে অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়।



(২) অ্যালকিনকে গাঢ় সালফিউরিক এসিডে শোষিত করলে অ্যালকাইল হাইড্রোজেন সালফেট উৎপন্ন হয়।

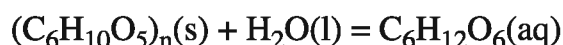


এর সাথে পানি যোগ করে পাতন করলে অ্যালকোহল পাওয়া যায় :



শিল্পক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

শিল্পোৎপাদন : ইথাইল অ্যালকোহল প্রধানত শ্বেতসার বা শর্করা বা স্টার্চের গাঁজান বা ফার্মেন্টেসন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হয়। স্টার্চ বিশিষ্ট পদার্থ, যেমন আলু, চাল, গম, বার্লিতে বিদ্যমান স্টার্চকে প্রথমে এক ধরনের এনজাইমের প্রভাবে পানি যোজিত করে গ্লুকোজে রূপান্তরিত করা হয়।



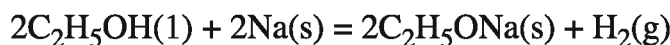
আরেকটি এনজাইমের প্রভাবে গ্লুকোজ ভেঙে ইথানল ও কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়।



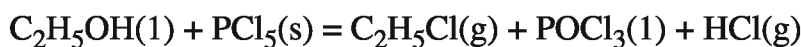
অ্যালকোহলসমূহের ধর্ম : মিথানল, ইথানল, প্রোপানল প্রভৃতি সরল অ্যালকোহলসমূহ কক্ষ তাপমাত্রায় বর্ণহীন, উদ্ভাসী তরল পদার্থ, যাদের বিশেষ গন্ধ আছে। এরা পানির সাথে সকল অনুপাতে মিশ্রণীয়। কার্বন পরমাণুর সংখ্যা বেশি হলে অ্যালকোহলসমূহ প্যারাফিন মোমের মতো কঠিন পদার্থ হয়।

রাসায়নিক বিক্রিয়া : অ্যালকোহলের বিক্রিয়া প্রধানত $-OH$ গ্রুপের এর বিক্রিয়া। তাই সকল অ্যালকোহল নিম্নরূপ বিক্রিয়া প্রদর্শন করে :

(১) সোডিয়ামের সাথে : ইথানলের সাথে সোডিয়াম বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ইথোক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।



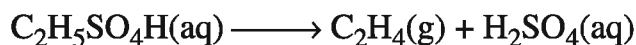
(২) ফসফরাস(V) ক্লোরাইডের সাথে : ফসফরাস(V) ক্লোরাইডের সাথে অ্যালকোহল তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে অ্যালকাইল ক্লোরাইড তৈরি করে।



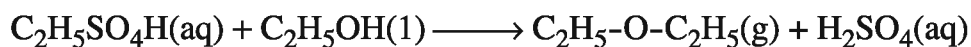
(৩) ফসফরাস(III) ক্লোরাইডের সাথে : অ্যালকোহলসমূহ ফসফরাস(III) ক্লোরাইডের সাথে বিক্রিয়া করেও অ্যালকাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন করে। এ বিক্রিয়া PCl_5 এর তুলনায় কম তীব্রতা সম্পন্ন।



(৪) সালফিউরিক এসিডের সাথে : গাঢ় সালফিউরিক এসিডের সাথে অ্যালকোহলসমূহ দুইভাবে বিক্রিয়া করে। এসিড খুব বেশি হলে এবং প্রায় $180^\circ C$ তাপমাত্রায় অ্যালকিন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়াটি দুই-ধাপে সম্পন্ন হয়।

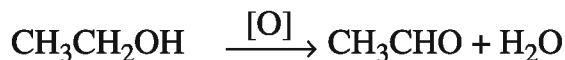


যদি অ্যালকোহল বেশি হয় এবং তাপমাত্রা কিছু কম হয় ($140-150^\circ C$), তবে ইথার উৎপন্ন হয়।

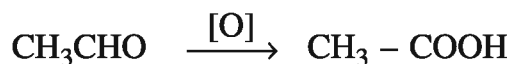


উভয়ক্ষেত্রে সালফিউরিক এসিড নিরুদক হিসেবে কাজ করে। তবে প্রথম বিক্রিয়ায় এক অণু অ্যালকোহল হতে এক অণু পানি বের করা হয়, দ্বিতীয় বিক্রিয়ায় দুই অণু অ্যালকোহল হতে এক অণু পানি অপসারিত হয়।

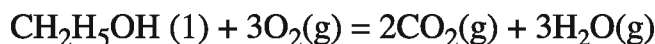
(৫) জারণ বিক্রিয়া : অ্যালকোহলকে দুইধাপে জারিত করা যায়। লঘু সালফিউরিক এসিড ও পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দ্রবণের সাথে বিক্রিয়ায় অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয়। যেমন : ইথানল এভাবে জারণে ইথানাল বা অ্যাসিটালডিহাইড উৎপন্ন হয়।



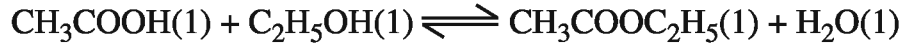
অধিক পরিমাণ ডাইক্রোমেটের উপস্থিতিতে এ উৎপাদ আরো জারিত হয়ে ইথানয়িক এসিড বা অ্যাসিটিক এসিডে রূপান্তরিত হয়।



(৬) দহন : অধিকাংশ জৈব যৌগের ন্যায় অ্যালকোহল দাহ্য এবং তা পুড়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে।



(৭) এস্টার তৈরি : গাঢ় সালফিউরিক এসিডের উপস্থিতিতে অ্যালকোহল ও কার্বক্সিলিক এসিড পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে এস্টার তৈরি করে। এ বিক্রিয়াটি উত্তমুখী।



ইথানলের ব্যবহার : ইথানল (১) গুরুত্বপূর্ণ জৈব দ্রাবক হিসেবে, (২) জ্বালানি তৈরি, (৩) তরল অক্সিজেনের সাথে মিশ্রিত করে রকেটের জ্বালানি হিসেবে, (৪) ইথার, ক্লোরোফর্ম, ইথানয়িক এসিড প্রভৃতি অনেক জৈব যৌগ সংশ্লেষণে এবং (৫) বিয়ার, শ্যাম্পেন প্রভৃতি পানীয় মদ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

১৫.১৩ ফ্যাটি এসিডসমূহ (Fatty Acids)

একটি কার্বক্সিল মূলক বিশিষ্ট অ্যালিফেটিক জৈব যৌগসমূহকে ফ্যাটি এসিড বলা হয়। এদের সাধারণ সংকেত RCOOH ।

ফ্যাটি এসিডের অণুতে সর্বমোট কয়টি কার্বন পরমাণু বিদ্যমান, সে অনুসারে এদের নামকরণ হয়। সমসংখ্যক কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট অ্যালকেনের নাম শেষে "e" বাদ দিয়ে "oic acid" যোগ করলে এসিডের নাম পাওয়া যায়। যেমন :

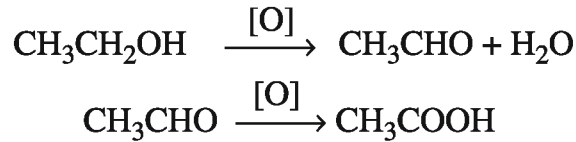
HCOOH - মিথানয়িক এসিড (methane \rightarrow methanoic acid) অথবা ফরমিক এসিড

CH_3COOH - ইথানয়িক এসিড (Ethane \rightarrow ethanoic acid) অথবা অ্যাসিটিক এসিড

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ - প্রোপানয়িক এসিড (Propane \rightarrow Propanoic acid)

প্রস্তুতি : (উদাহরণ হিসেবে ইথানয়িক এসিডের সমীকরণ দেওয়া হল)

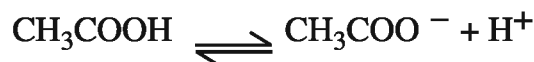
পরীক্ষাগারে ইথানলকে সালফিউরিক এসিডের উপস্থিতিতে পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট দ্বারা জারিত করে ইথানয়িক এসিড উৎপন্ন করা হয়।



ভৌত ধর্ম : কম কার্বন বিশিষ্ট ফ্যাটি এসিডসমূহ (যেমন মিথানয়িক ও ইথানয়িক এসিড) তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ বিশিষ্ট বর্ণহীন তরল পদার্থ। এরা পানি, অ্যালকোহল ও ইথারে সকল অনুপাতে দ্রবণীয়। অ্যাসিটিক এসিড বা ইথানয়িক এসিডের গলনাঙ্ক 17°C , তখন এটি বরফের ন্যায় বর্ণহীন স্ফটিক তৈরি করে। এ কারণে বিশুদ্ধ ইথানয়িক এসিডকে গ্লাসিয়াল অ্যাসিটিক এসিড বলা হয়।

রাসায়নিক ধর্ম : ফ্যাটি এসিডসমূহের কার্যকরী মূলক হচ্ছে $-\text{COOH}$ । প্রায় সকল বিক্রিয়ায় এ মূলক অংশগ্রহণ করে।

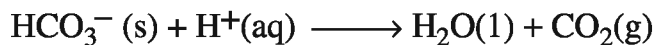
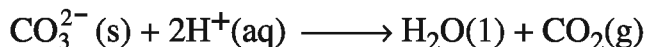
(১) অম্লীয় ধর্ম : সকল ফ্যাটি এসিড দুর্বল এসিড। জলীয় দ্রবণে $-\text{COOH}$ মূলকের হাইড্রোজেন পরমাণু আয়নিত হওয়ায় অম্লীয় ধর্মের উৎপত্তি হয়।



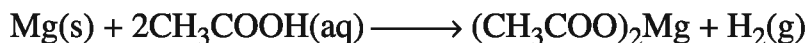
দ্রবণ লঘু হলে আয়নিত হওয়ার মাত্রা বাড়ে। H^+ আয়নের কারণে দ্রবণে এসিডের স্বাভাবিক ধর্মসমূহ দেখা যায়। যেমন এটি নীল লিটমাসকে লাল করে, ক্ষার বা ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।



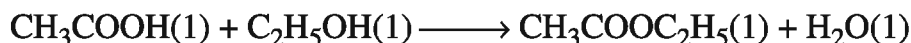
এটি কার্বনেট ও হাইড্রোজেন কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে।



অনেক ধাতু, যেমন ম্যাগনেসিয়ামের (Mg) সাথে এর বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হয়।



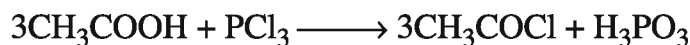
(২) এস্টার গঠন : গাঢ় সালফিউরিক এসিড বা শুষ্ক হাইড্রোজেন ক্লোরাইড প্রভাবের উপস্থিতিতে অ্যালকোহল ও ফ্যাটি এসিডকে উত্তপ্ত করলে সুগন্ধযুক্ত এস্টার তৈরি হয়। যেমন ইথানল ও ইথানয়িক এসিডের বিক্রিয়ায় ইথাইল ইথানয়েট বা অ্যাসিটেট উৎপন্ন হয়।



(৩) ফসফরাস(V)ক্লোরাইডসমূহের সাথে বিক্রিয়া : ফ্যাটি এসিডসমূহ ফসফরাস(V)ক্লোরাইডের সাথে তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে।

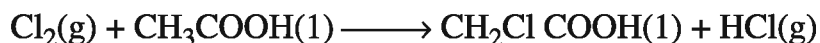


ফসফরাস (III) ক্লোরাইড অনুরূপভাবে বিক্রিয়া করে, তবে কম তীব্রভাবে।



লক্ষ কর যে, অ্যালকোহলসমূহও একই ধরনের বিক্রিয়া দেয়। প্রকৃতপক্ষে এসব বিক্রিয়া $-\text{OH}$ মূলকের বিক্রিয়া। ফ্যাটি এসিডের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ $-\text{COOH}$ মূলক এ বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না, বরঞ্চ শুধুমাত্র $-\text{OH}$ অংশ নেয়।

(৪) ইথানয়িক এসিডের সাথে ক্লোরিনের বিক্রিয়া : ফুটন্ত ইথানয়িক এসিডের মধ্য দিয়ে ক্লোরিন গ্যাস প্রবাহিত করলে মনোক্লোরো ইথানয়িক এসিড উৎপন্ন হয়।

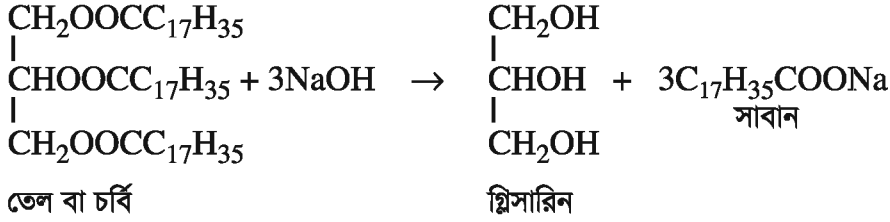


ব্যবহার : ফ্যাটি এসিডসমূহের মধ্যে ইথানয়িক এসিডই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাসিটোন, সেলুলোজ অ্যাসিটেট বা কৃত্রিম সিল্ক, ইথাইল অ্যাসিটেট, অ্যামাইল অ্যাসিটেট প্রভৃতি অনেক যৌগ উৎপাদনে ইথানয়িক এসিড ব্যবহৃত হয়। ভিনেগার হিসেবে অ্যাসিটিক এসিডের লঘু দ্রবণ প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

১৫.১৪ সাবান (Soap)

সাবান হচ্ছে উচ্চতর ফ্যাটি এসিডের সোডিয়াম বা পটাসিয়াম লবণ। তেল বা চর্বি'র সাথে সোডিয়াম বা পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণের বিক্রিয়ায় সাবান উৎপন্ন হয়। তেল বা চর্বি হচ্ছে এক ধরনের এস্টার। গ্লিসারিন হচ্ছে একটি অ্যালকোহল, যাতে তিনটি $-\text{OH}$ গ্রুপ বিদ্যমান। গ্লিসারিন ও উচ্চতর ফ্যাটি এসিডের সমন্বয়ে যে এস্টার গঠিত হয়, তাই হচ্ছে তেল ও চর্বি। যে কোনো এস্টার পানিযোজিত হলে অ্যালকোহল ও এসিড উৎপন্ন হয়। ক্ষারের উপস্থিতিতে

পানিযোজিত করা হলে এসিড প্রশমিত হয়ে লবণ উৎপন্ন হয়। সুতরাং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের উপস্থিতিতে তেল ও চর্বির পানিযোজন বিক্রিয়া নিম্নরূপে ঘটে :



সাবান উৎপাদনের এ পদ্ধতিকে সাবানায়ন বলে।

বিক্রিয়া মিশ্রণে সাধারণ লবণ যোগ করলে সাবান জলীয় মাধ্যম হতে পৃথক হয়। জলীয় মাধ্যম হতে গ্লিসারিন পরে পৃথক করা হয়। এ সোডিয়াম লবণের সাথে বিভিন্ন দ্রব্য (যেমন, রং, সুগন্ধি দ্রব্য) যোগ করে সাবান হিসেবে বিক্রি করা হয়।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

জৈব যৌগ : কার্বনের যৌগসমূহকে জৈব যৌগ বলা হয়।

অজৈব যৌগ : কার্বনবিহীন সকল যৌগ অজৈব যৌগ। এছাড়াও কার্বনের কিছু যৌগ—যেমন ধাতু কার্বনেট, কার্বনিল, সায়ানেট প্রভৃতিকে অজৈব যৌগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ক্যাটেনেশন : একই মৌলের পরমাণুসমূহের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের শিকল গঠনের ধর্মকে ক্যাটেনেশন বলা হয়।

জৈব যৌগের শ্রেণীবিভাগ : জৈব যৌগসমূহকে প্রধান দুইটি ভাগে করা হয়—(১) অ্যালিফেটিক যৌগ, (২) অ্যারোমেটিক যৌগ।

কার্যকরী মূলক : যে পরমাণু বা মূলক কোনো জৈব যৌগের অণুতে বিদ্যমান থেকে কার্যত তার ধর্ম ও বিক্রিয়া নির্ধারণ করে তাকে ঐ যৌগের কার্যকরী মূলক বলা হয়।

সমগোত্রীয় শ্রেণী : একই কার্যকরী মূলক বিশিষ্ট এবং একই ধরনের ধর্মবিশিষ্ট জৈব যৌগসমূহকে একত্রে সমগোত্রীয় শ্রেণী বলা হয়।

সমগোত্রীয় শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যসমূহ : (১) একই শ্রেণীভুক্ত সদস্যের একটি সাধারণ আণবিক সংকেত থাকবে। (২) প্রতিটি সদস্যের আণবিক সংকেত পূর্ববর্তী সদস্যের চেয়ে $-\text{CH}_2-$ মূলক বেশি হবে। (৩) সকল সদস্য একইরূপ রাসায়নিক বিক্রিয়া দেবে, যদিও বিক্রিয়ার গতি ও তীব্রতা ভিন্ন হতে পারে। (৪) সদস্যদের ভৌত ধর্ম ক্রমান্বয়ে একই দিকে পরিবর্তিত হয়। (৫) সংশ্লেষণের সাধারণ পদ্ধতিসমূহ সকল সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

হাইড্রোকার্বনসমূহ : শুধুমাত্র হাইড্রোজেন ও কার্বন বিশিষ্ট যৌগসমূহকে হাইড্রোকার্বন বলা হয়। হাইড্রোকার্বনসমূহকে আবার কয়েকভাগে ভাগ করা হয়েছে।

অ্যালকেনসমূহ : যে সকল অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনে কার্বন-কার্বন একক বন্ধন আছে তাদেরকে অ্যালকেন বলা হয়। এদের সাধারণ সংকেত $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ । অ্যালকেনসমূহ সম্পৃক্ত যৌগ। এরা রাসায়নিকভাবে মোটামুটি নিষ্ক্রিয়।

অ্যালকাইলমূলক : অ্যালকেনসমূহ হতে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপসারিত করলে যে অংশ থাকে, তাকে অ্যালকাইল মূলক বলা হয়। অ্যালকাইল মূলক একযোজী, এদেরকে সাধারণত $\text{R}-$ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

সমাণুতা : একই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট একাধিক যৌগের অস্তিত্ব থাকাকে সমাণুতা বলা হয়। জৈব যৌগসমূহে সমাণুতা খুবই সাধারণ। সমাণুতা বিভিন্ন ধরনের হয়।

অ্যালকিনসমূহ : কার্বন-কার্বন দ্বি-বন্ধনযুক্ত অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনসমূহকে অ্যালকিন বলা হয়। এদের সাধারণ সংকেত C_nH_{2n} । এ সকল যৌগ রাসায়নিকভাবে কিছুটা সক্রিয়। এরা অসম্পৃক্ত এবং দুইটি হাইড্রোজেন বা সমতুল্য কোনো মূলক বা পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়। এরা পলিমার গঠন করে।

অসম্পৃক্ততার পরীক্ষা : অসম্পৃক্ত যৌগসমূহ (অ্যালকিন) ব্রোমিনের সাথে বিক্রিয়া করে এর লাল বর্ণ দূর করে; অম্লীয় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সাথে বিক্রিয়া করেও তার বর্ণ দূর করে। অ্যালকেনসমূহ এ দুইটি পরীক্ষা দেয় না।

অ্যালকোহলসমূহ : অ্যালকেনসমূহের অণু হতে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে একটি হাইড্রক্সিল গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করলে যে যৌগসমূহ গঠিত হয় তাদেরকে অ্যালকোহল বলা হয়। এদের সাধারণ সংকেত $C_nH_{2n+1}OH$ ।

ফ্যাটি এসিডসমূহ : একটি কার্বক্সিলমূলক বিশিষ্ট অ্যালিফেটিক জৈব যৌগসমূহকে ফ্যাটি এসিড বলা হয়। এদের সাধারণ সংকেত $C_nH_{2n+1}COOH$ ।

সাবান : সাবান হচ্ছে উচ্চতর ফ্যাটি এসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. $CH_2-CH_2-CH_2=CH-CH_3$

– এ যৌগটির নাম কী?

ক. ২-পেন্টেন

খ. ২-পেন্টিন

গ. ৩-পেন্টেন

ঘ. ৩-পেন্টিন

২. অ্যালকিনসমূহের সংযোজন বিক্রিয়ায়–

i. একক বন্ধনের সৃষ্টি হয়

ii. পরমাণু বা মূলক যুক্ত হয়

iii. ত্রি-বন্ধনের সৃষ্টি হয়

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৩. C_2H_6O দ্বারা গঠিত সমাণু-

- i. ইথার
- ii. অ্যালকোহল
- iii. অ্যালডিহাইড

কোনটি সঠিক?

- ক. i, ii
- খ. ii ও iii
- গ. i ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

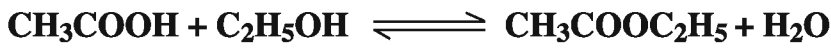
৪. $R-COOH$ একটি এসিড, কারণ-

- i. $-COOH$ মূলক উপস্থিত আছে
- ii. জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন দেয়
- iii. অ্যালকোহল মূলক উপস্থিত আছে

কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. i ও ii
- গ. i ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের সমীকরণ ব্যবহার করে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :



৫. বিক্রিয়াটিকে বলা হয়-

- ক. প্রশমন বিক্রিয়া
- খ. বিয়োজন বিক্রিয়া
- গ. এস্টারিফিকেশন বিক্রিয়া
- ঘ. সাবানায়ন বিক্রিয়া

৬. উপরের বিক্রিয়াটি সংগঠনে নিচের কোন পদার্থকে প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয়?

- ক. HNO_3
- খ. H_2SO_4
- গ. H_3PO_4
- ঘ. H_2CO_3

নিম্নের অনুচ্ছেদটি ব্যবহার করে ৭-৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মি. শরিফ বাজারে বিক্রয় করার জন্য গরু ও মহিষের চর্বির সাথে কস্টিক সোডা যোগ করে সাবান তৈরি করেন। সাবান তৈরির শেষ ধাপে মিশ্রণে খাবার লবণ যোগ করেন।

৭. মি. শরিফ মিশ্রণে লবণ যোগ করেন-

- i. সাবানের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য
- ii. মিশ্রণ হতে সাবান পৃথক করার জন্য
- iii. মিশ্রণকে প্রশমিত করার জন্য

নিচের কোটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. i ও ii
- ঘ. ii ও iii

৮. গল্প মহিষের চর্বিতে উপস্থিত কার্যকরী মূলক হল—

ক. $-\text{COOH}$

খ. $-\text{CHO}$

গ. $-\text{OH}$

ঘ. $-\text{COOR}$

৯. সাবান তৈরিতে কস্টিক সোডার পরিবর্তে নিচের কোন যৌগটি ব্যবহার করা যায়?

ক. $\text{Mg}(\text{OH})_2$

খ. $\text{Ca}(\text{OH})_2$

গ. KOH

ঘ. $\text{Fe}(\text{OH})_2$

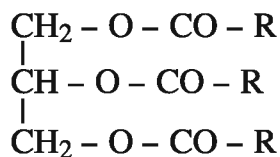
সৃজনশীল প্রশ্ন :

এসিড বা ক্ষারের উপস্থিতিতে এস্টারের পানিযোজন (হাইড্রোলাইসিস) বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। ক্ষার ব্যবহারের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কার্বক্সিলিক (জৈব) এসিডের সোডিয়াম বা পটাসিয়াম লবণ বিশেষ প্রক্রিয়ায় দ্রবণ থেকে পৃথক করা হয়। উৎপন্ন লবণে রং মিশিয়ে ও শুকিয়ে ইচ্ছে মতো আকৃতি দিয়ে সাবান হিসেবে বাজারজাত করা হয়।

ক. এস্টারের একটি উদাহরণ দাও।

খ. পানিযোজন বা হাইড্রোলাইসিস বিক্রিয়ার বর্ণনা দাও।

গ. এস্টারটির সাধারণ সংকেত নিম্নরূপ:



সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্ষার ব্যবহার করে এস্টারটির পানিযোজন বা হাইড্রোলাইসিস বিক্রিয়ার সমতাকৃত সমীকরণ দেখিয়ে এস্টারটির জন্য প্রয়োজনীয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের পরিমাণ উল্লেখ কর।

ঘ. সাবান প্রস্তুতিতে এসিড ব্যবহার না করে ক্ষার ব্যবহার করার কারণ বিশ্লেষণ কর।

বোড়শ অধ্যায়

ব্যবহারিক রসায়ন

ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সাধারণ নির্দেশ

বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে পরীক্ষালব্ধ বিভিন্ন ফলাফল। এ সকল ফলাফলকে যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যা করাই বিজ্ঞানীদের কাজ। বিজ্ঞানের একটি শাখা হচ্ছে রসায়ন। জীবন ও জীবিকার ওপর রসায়নের প্রভাব অনেক বেশি। রসায়ন একটি পরীক্ষার্থী বিজ্ঞান। পরীক্ষা না করে রসায়ন শিক্ষা দুঃসাধ্য। রসায়নের আলোচিত তত্ত্ব ও পদ্ধতি পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ব্যবহারিক রসায়নের প্রয়োজন। রসায়নের পরীক্ষা যেমন ছাত্রছাত্রীদের আনন্দ দান করে, তেমনি তথ্যীয় পাঠ্যবিষয়কে বুঝতে ও মনে রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া পুস্তকে যা যা পড়া হয়েছে, তা যেন গম্ব নয়, বরঞ্চ বাস্তব সত্য, এক্ষণে উপলব্ধিতে সাহায্য করে। সুতরাং রসায়ন শিক্ষায় ব্যবহারিক রসায়নের গুরুত্ব অপরিণীম।

রসায়ন পরীক্ষাগারে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো পালন করতে হবে

১। পরীক্ষাগারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। প্রায় সকল রাসায়নিক দ্রব্য বিষাক্ত অথবা ক্ষয়কারী। সুতরাং এ সকল দ্রব্য নিয়ে কাজ করার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যেন তা কখনো নিজের বা অন্যের শরীরে বা কাপড়ে না পড়ে। এ কারণে :

(ক) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষাগারে ঢোকান আগে সাদা এপ্রন পরে নিবে। তাতে ক্ষয়কারী রাসায়নিক বস্তু হতে শরীর ও কাপড় চোপড় রক্ষা পায়। এছাড়া এপ্রন পরলে শিক্ষার্থী পরীক্ষাগারে কাজ করার মানসিক প্রস্তুতি লাভ করে।

(খ) চোখ অমূল্য সম্পদ। একে রক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে চশমা পরে থাকতে হবে। যাদের চোখের কোনো সমস্যা নেই তাদেরকে বর্ণহীন পাওয়ারবিহীন চশমা পরতে হবে।

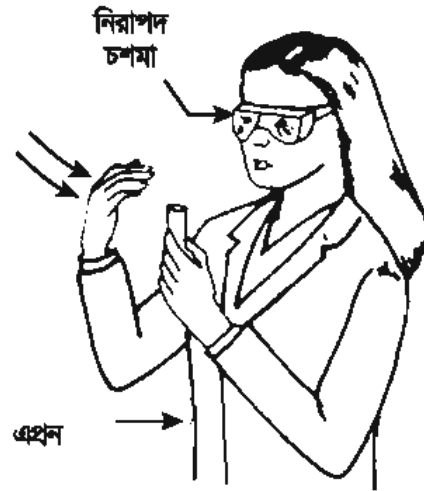
(গ) কখনো কোনো রাসায়নিক দ্রব্য খালি হাতে স্পর্শ করবে না।

(ঘ) না জেনে কখনো কোনো গ্যাসের গন্ধ সরাসরি গ্রহণ করবে না, বা কোনো স্বাদ গ্রহণের চেষ্টা করবে না।

(ঙ) অনেক জৈব যৌগ, বিশেষ করে তরল পদার্থ সহজে দাহ্য। সুতরাং আগুনের কাছে কোনো বোতল রাখবে না বা আনবে না।

(চ) যদি দুর্ঘটনাবশত কোনো রাসায়নিক দ্রব্য শরীরে বা কাপড়ে পড়ে, তবে তৎক্ষণাত তা বেশি বেশি পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এটি এসিড হলে পানিতে ধোয়ার পরপরই খুব লঘু সোডিয়াম বাইকার্বনেট দ্রবণ অথবা খুব লঘু অ্যামোনিয়া দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। ক্ষার পড়লে পানিতে ধোয়ার পরপরই বোরিক এসিড দ্রবণ দিয়ে ধুতে হবে। সকল ক্ষেত্রে শিক্ষক ও চিকিৎসককে জানাতে হবে এবং তাদের উপদেশ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে।

(ছ) সাধু উপায় বলে গণ্য হবে এমন কাজে সহপাঠীকে সাহায্য করবে।



চিত্র ১৬.১ : সাবধানে একটি বাষ্পের গন্ধ নেওয়ার পদ্ধতি

- ২। ব্যবহারিক ক্লাসের দিন সাথে করে ব্যবহারিক বই ও নোটখাতা আনবে।
- ৩। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা কাজ করার জন্য পরীক্ষাগারে প্রবেশের পূর্বেই পরীক্ষা কাজ সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝে নেবে।
- ৪। পরীক্ষা কাজ আরম্ভ করার আগে অপরিষ্কার যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করে নেবে। কাচের যন্ত্রপাতি পরিষ্কার মনে হলেও পরিষ্কার করে নিবে।
- ৫। রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি যতটুকু বলা হয়েছে, সে পরিমাণ ব্যবহার করবে। কখনই তার চেয়ে বেশি নয়।
- ৬। বিকারক বোতল হতে বিকারক নেওয়ার সময় ছিপি টেবিলে না রেখে অন্য হাতে বা কাচের পাত্রে রেখে দেবে। বিকারক নেওয়ার পর বোতল ছিপিবদ্ধ করে যথাস্থানে রেখে দেবে, নিজের টেবিলে জড়ো করবে না। কোনো অবস্থায় ঢেলে নেওয়া বিকারক পুনরায় বোতলের মধ্যে রাখবে না।
- ৭। কঠিন দ্রব্য চামচ বা স্পেচুলা(spatula) দিয়ে নেবে, কোনো অবস্থায় হাতে ধরবে না।
- ৮। অযথা পানির ট্যাপ খুলে রাখবে না বা গ্যাস জ্বালিয়ে রাখবে না।
- ৯। কোনো কঠিন বস্তু সিংকে ফেলবে না। তরল বস্তু সিংকে ফেলার সময় অতিরিক্ত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে, যেন তা পাইপে জমে থেকে ক্ষয় না করে। বিশেষ বিশেষ তরল বর্জ্য(waste) বোতলে সংগ্রহ করতে হয়। পরে যথাস্থানে ফেলে দিতে হবে।
- ১০। পরীক্ষানল সবসময় টেস্ট টিউব হোল্ডার দিয়ে ধরবে।
- ১১। পরীক্ষানলে কোনো তরল পদার্থকে তাপ দেওয়ার সময় তাকে নিজের চোখ মুখ হতে অন্যদিকে, অর্থাৎ যে দিকে কোনো সহপাঠী কাজ করছে না, সে দিকে ঈষৎ কাত করে ধরবে এবং নলটিকে অঙ্গ অঙ্গ নাড়তে থাকবে।
- ১২। খুব সাবধানে কাচের যন্ত্রে তাপ প্রয়োগ করবে, যেন তা তাপে ফেটে না যায়।
- ১৩। নোট খাতায় পরীক্ষা কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত সজো সজো লিখে রাখবে এবং মূল্যায়নের জন্য তোমার প্রতিবেদন (report) শিক্ষকের নির্দেশ মতো উপস্থাপিত করবে।
- ১৪। প্রদত্ত সময়ের মধ্যে পরীক্ষা সম্পূর্ণ করতে হবে।
- ১৫। পরীক্ষা কাজের পরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবে।

রসায়ন পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত কতিপয় যন্ত্রপাতি

(১) টেস্ট টিউব (Test tube) বা পরীক্ষানল : এটা একদিক বম্ব একটি পাতলা কাচের সরু নল। পরীক্ষানল ছোট বড় বিভিন্ন আকারের হতে পারে। সাধারণত 15-16 mL আয়তনের টেস্ট টিউবই বেশি ব্যবহৃত হয়। টেস্ট টিউবকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য কাঠ নির্মিত সরল যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। একে বলা হয় টেস্ট টিউব স্ট্যান্ড (test tube stand)। কাজ করার সময় তাতে টেস্ট টিউব ধরার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাকে টেস্ট টিউব ধারক (test tube holder) বলা হয়।

(২) বিকার (Beaker) : বিকার কাচ নির্মিত এবং অনেকটা কাচের গ্লাসের মতো। বিকার বিভিন্ন মাপের হতে পারে। যেমন : 50, 100, 500 ও 1000 mL। সাধারণত বিকারের গায়ে তার ধারণ ক্ষমতা লেখা থাকে।

(৩) ফ্লাস্ক (Flask) : ফ্লাস্ক অনেকটা বোতলের মতো। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন প্রকার তরল রাসায়নিক দ্রব্য রাখার জন্য ফ্লাস্ক ব্যবহৃত হয়। যে ফ্লাস্ক নিচে প্রশস্ত এবং ক্রমশ উপরে সরু, তাকে কনিক্যাল ফ্লাস্ক (conical flask বা erlenmeyer flask) বলা হয়। ফ্লাস্কের তলা চ্যাপ্টা হলে তাকে চ্যাপ্টাতলি ফ্লাস্ক (flat bottomed flask) বলে। আর ফ্লাস্কের তলা গোলাকার হলে তাকে গোলতলি ফ্লাস্ক (round bottomed flask) বলা হয়। ফ্লাস্কের সরু অংশে একটি পার্শ্ব-নল থাকলে তাকে পাতন ফ্লাস্ক বলা হয়। তরল পদার্থের পাতন কার্যে এ ফ্লাস্ক ব্যবহৃত হয়। ফ্লাস্কের গায়ে সাধারণত ধারণ ক্ষমতা লেখা থাকে।

(৪) **কর্ক (Cork)** বা **ছিপি** : বিশেষ গাছের অংশ থেকে কর্ক প্রস্তুত করা হয়। কর্কের পরিবর্তে রবার অথবা গ্লাস স্টপার (stopper) ব্যবহার করা যায়। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন ফ্লাস্ক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির মুখ বন্ধ করতে এগুলো ব্যবহৃত হয়।

(৫) **কর্ক বোরার (Cork borer)** বা **ছিপি ছিদ্রকারক** : কর্কের মধ্যে সরু কাচনল ঢুকানোর জন্য এর মাঝখান দিয়ে ছিদ্র করা প্রয়োজন হয়। কর্ক ছিদ্র করতে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাকে কর্ক বোরার বলে। এটা ফাঁপা এবং লৌহ নির্মিত। বোরার বিভিন্ন ব্যাসবিশিষ্ট হয়।

(৬) **পোর্সেলিন বেসিন (Porcelain basin)** : এ বেসিনে সাধারণত তরল পদার্থ বাষ্পায়িত করা হয়ে থাকে।

(৭) **ক্রুসিবল (Crucible)** : এটি ঢাকনায়ুক্ত একটি খাড়া বাটি বিশেষ। উচ্চ তাপমাত্রায় কঠিন পদার্থকে শুষ্ক করার জন্য ক্রুসিবল ব্যবহৃত হয়। এটি চিনামাটি দ্বারা তৈরী।

(৮) **মর্টার এবং পেসল (Mortar and pestle)** বা **খল ও মুষল** : রাসায়নিক পদার্থ গুঁড়া করার জন্য অথবা একাধিক গুঁড়া জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত করার জন্য মর্টার এবং পেসল ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত চিনামাটির তৈরী হয়।

(৯) **ফানেল (Funnel)** : তরল পদার্থ ঢালবার জন্য নিচে সরু নলবিশিষ্ট চোঙ ব্যবহৃত হয়। এটিই ফানেল। ফানেল সাধারণত বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন : সাধারণ ফানেল ও থিসল ফানেল।

(১০) **উলফ বোতল (Woulfe's bottle)** : এটি একটি কাচের মোটা বোতল যার দুইটি সরু মুখ আছে। গ্যাস প্রস্তুত করতে এটা ব্যবহার করা হয়। আবিষ্কারকের নামানুসারে এ বোতলের নাম রাখা হয়েছে উলফ বোতল।

(১১) **রিটর্ট (Retort)** বা **বকযন্ত্র** : একটি গোলতলি ফ্লাস্কের মুখ থেকে বের হওয়া লব্ধা সরু ঠোঁটবিশিষ্ট যন্ত্রের নাম বকযন্ত্র। নাইট্রিক এসিড প্রস্তুতকালে এ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। তরলকে বাষ্পে পরিণত করে পুনরায় তরল অবস্থায় পরিণত করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

(১২) **গ্যাস জার (Gas jar)** : উপর নিচে সমান ব্যাসবিশিষ্ট এক মুখ বন্ধ যন্ত্রই হলো গ্যাস জার। এটি পুরো কাচের হয়। পরীক্ষাগারে গ্যাস সংগ্রহ করতে গ্যাস জার ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(১৩) **গ্যাস দ্রোণি (Pneumatic trough)** : গ্যাস সংগ্রহের সময় জারে পানি ভর্তি করে অন্য যে একটি পানি ভর্তি পাত্রের মধ্যে উপড় করে রাখা হয়, সে পানির পাত্রটিই হল গ্যাস দ্রোণি।

(১৪) **ত্রিপদী স্ট্যান্ড (Tripod stand)** : ত্রিপদী স্ট্যান্ডের তিনটি পা আছে। এর উপর তারজালি রেখে কোনো পাত্র বসানো হয় এবং প্রয়োজনে নিচ হতে বার্নারের সাহায্যে তাপ দেয়া হয়।

(১৫) **রিং স্ট্যান্ড (Ring stand)** : এ দ্বারা ফ্লাস্ক আটকিয়ে রাখা হয় এবং প্রয়োজনে নিচ হতে তাপ দেওয়া হয়। আবার রিং স্ট্যান্ডের সাথে ক্ল্যাম্প দ্বারা ব্যুরেট আটকিয়ে টাইট্রেশন করা হয়।

(১৬) **বুনসেন বার্নার (Bunsen burner)** বা **বুনসেন দীপ** : পরীক্ষা কার্যে তাপ সৃষ্টির জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষাগারে সাধারণত বুনসেন বার্নারে প্রাকৃতিক গ্যাস ও বাতাসের মিশ্রণ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকলে স্পিরিট ল্যাম্প (spirit lamp) ব্যবহৃত হয়। এটি কুপি বাতির মতো, তবে তেলের পরিবর্তে স্পিরিট ব্যবহৃত হয়।

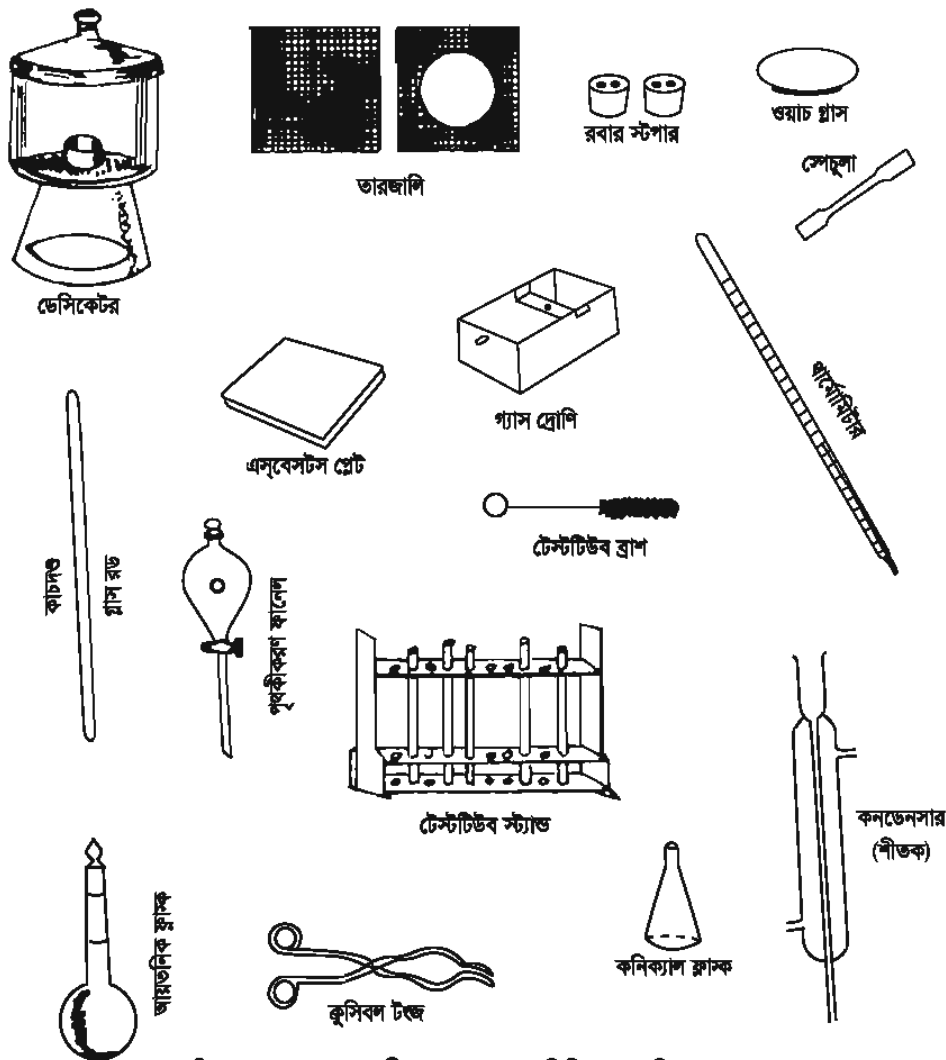
(১৭) **ওয়াশ বোতল (wash bottle)** : এটি কাচ নির্মিত ফ্লাস্ক। ফ্লাস্কের মুখে ছিপি দিয়ে দুটি নল ঢুকানো থাকে। একটি নল দিয়ে ফুঁ দিতে হয় এবং অপরটি দিয়ে ভেতরের পানি বের হয়ে থাকে। এ বোতলের পানি দিয়ে যন্ত্রপাতি ধৌত করা হয় বলে একে ওয়াশ বোতল বলে।

(১৮) **মেজারিং সিলিন্ডার (Measuring cylinder)** : এটি একটি দাগকাটা একদিক বন্ধ কাচের নল। এর দ্বারা তরল পদার্থের আয়তন মাপা হয়। এতে মিলিলিটারে দাগ কাটা থাকে।

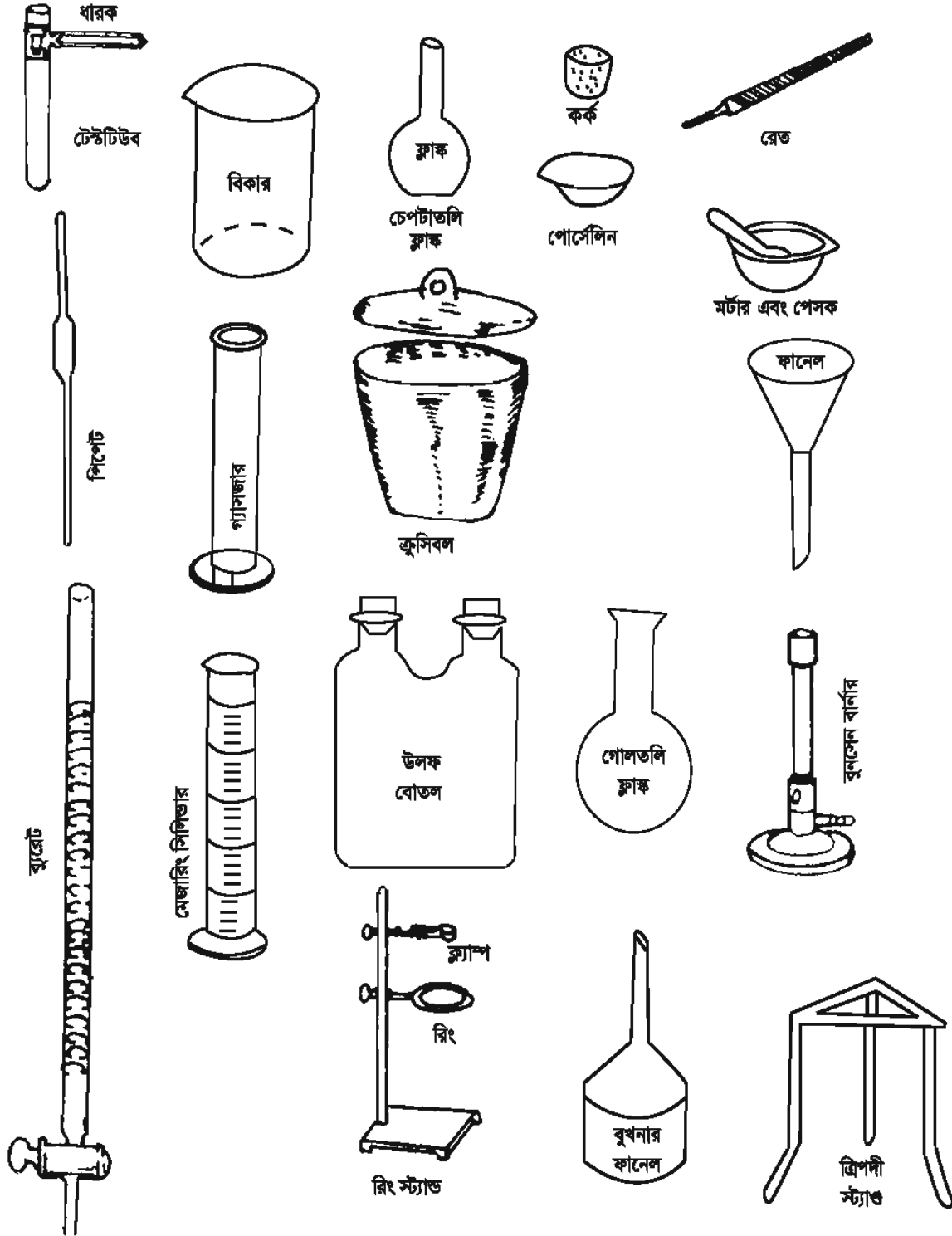
(১৯) **পিপেট (Pipette)** : এটি দাগকাটা কাচের সরু নল। কখনও এক মাথা সরু, অন্য মাথা চোকা এবং মাঝখানে মোটা হয়। সুনির্দিষ্ট পরিমাণ তরল পদার্থ মাপার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

(২০) **ব্যুরেট (burette)** : এটিও মিলিলিটারে দাগকাটা নলবিশেষ। এর নিচের মাথা সরু ও স্টপকক (stopcock) যুক্ত। ফোঁটা ফোঁটা তরল পদার্থ যোগ করা ও মাপার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণত 50 mL বা 25 mL ধারণ ক্ষমতার ব্যুরেট ব্যবহৃত হয়।

(২১) **শীতক (condenser)** : এটি মূলত সম অক্ষবিশিষ্ট দুইটি কাচনল। বাইরের নলের উভয় প্রান্ত ভিতরের নলের সাথে সিল করা থাকে এবং বাইরের নলের উভয় প্রান্তের প্রায় কাছাকাছি স্থানে একটি করে নির্গম নল যুক্ত থাকে। নিচের নির্গম নল দিয়ে ঠান্ডা পানি ভিতরে প্রবেশ করে এবং উপরের নির্গম নল দিয়ে বেরিয়ে যায়। এতে বাষ্পীভূত কোনো পদার্থ পুনরায় তরলে রূপান্তরিত হয়।



চিত্র ১৬.২ : রসায়ন পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি



চিত্র ১৬.২ : রসায়ন পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি

পরীক্ষা নং ১

শিরোনাম : ওয়াশ বোতল প্রস্তুতকরণ

উদ্দেশ্য : (ক) কাচনল কাটা

(খ) কাচনল বাকানো

(গ) জেটনল প্রস্তুতকরণ

(ঘ) কর্ক ছিদ্রকরণ

(ঙ) ওয়াশ বোতল সংযোজন

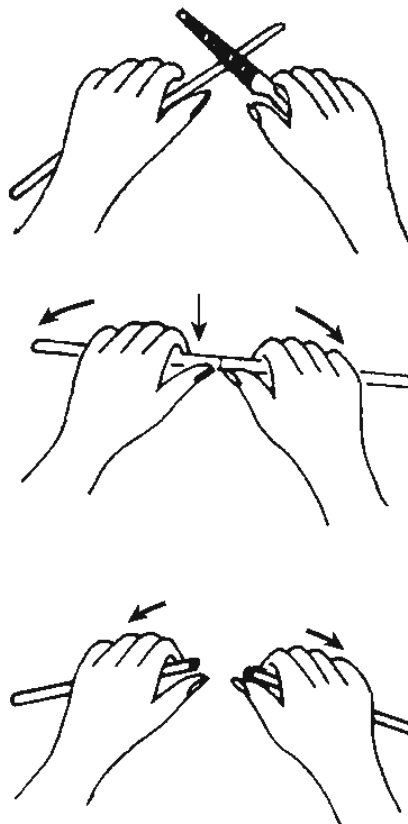
সতর্কতা নির্দেশ : পরীক্ষাগারে সবসময় এপ্রন ও নিরাপদ চশমা ব্যবহার করবে।

পরীক্ষা :

(ক) কাচনল কাটা

যন্ত্রপাতি : কাচনল, ত্রিকোণাকার রেত ও স্কেল

কর্মপদ্ধতি : যে কোন দৈর্ঘ্যের কাচনল কাটার জন্য দীর্ঘ কাচনলটি টেবিলের উপর রেখে সে.মি. স্কেলের সাহায্যে মেপে সেখানে বাম হাতের বৃন্দাজুলির শেষ প্রান্ত স্থাপন কর। ত্রিকোণাকার রেতের এক কিনারা বৃন্দাজুলির গা ঘেঁষে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য সীমার উপর রেখে সজোরে রেতকে পেছন দিকে টান দিয়ে একটি মাত্র গভীর দাগ কাট। কাটা দাগের একটু দূরে দুই হাতে কাপড় দিয়ে ধরে কাটা দাগের বিপরীতে আঙ্গুলের চাপ দিলে দাগ বরাবর নলটি সুন্দরভাবে দুই টুকরা হয়ে যাবে।



সাবধানতা : (১) কখনোই পাতলা কাচনল ব্যবহার করা উচিত নয়।

(২) রেতের কিনারা দিয়ে একটি মাত্র পেছন টানে দাগ কাটতে হয়। সামনে পিছনে দ্বিমুখী টান বর্জনীয়।

(৩) দাগকাটা কাচনল মুখ থেকে দূরে কাপড় দিয়ে ধরে সতর্কতার সাথে চাপ দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করতে হয়।

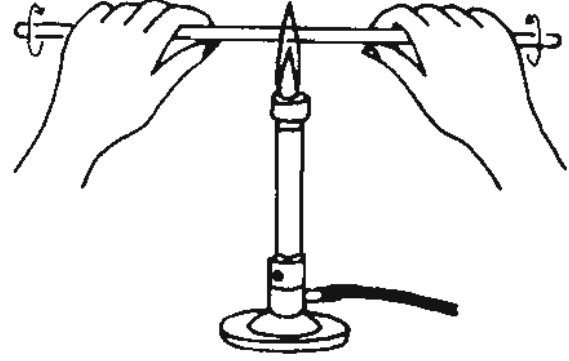
চিত্র ১৬.৩ : কাচনল কাটা

(খ) কাচনল বাঁকানো

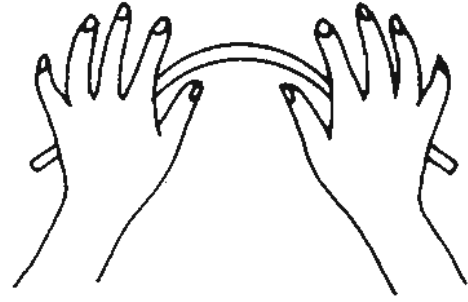
যন্ত্রপাতি : বার্নার, এস্বেস্টেস প্রেট ও কোণ পরিমাপক।

কর্মপদ্ধতি : 40 cm ও 20 cm দীর্ঘ কাচনলকে 45° ও 135° কোণে বাঁকানোর জন্য প্রথমে এস্বেস্টেস প্রেটের উপর 45° ও 135° কোণে দুইটি কোণ অঙ্কন কর। এবার 40 cm কাচনলের দুই প্রান্ত ধরে অনুজ্জ্বল শিখার উপর নলটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উত্তপ্ত কর। উত্তাপে কাচনল যখন নরম হয়ে ওঠে এবং বেকে যেতে থাকে তখন এস্বেস্টেসের উপর অঙ্কিত 45° কোণের এক বাহু বরাবর রেখে কাচনলের অপর প্রান্তকে চেপে 45° কোণ তৈরি কর। অনুরূপভাবে 20 cm দৈর্ঘ্যের কাচনলকে 135° কোণে পরিণত কর।

সাবধানতা : (১) কাচনল বাঁকাতে অনুজ্জ্বল শিখা ব্যবহার করতে হবে। (২) তাপ প্রয়োগ সমভাবে করতে হবে। (৩) স্বল্পসময়ে উত্তপ্ত নলকে বাঁকিয়ে কোণে পরিণত করতে হবে।



চিত্র ১৬.৪ : কাচনল উত্তপ্তকরণ



চিত্র ১৬.৫ : কাচনল বাঁকানো

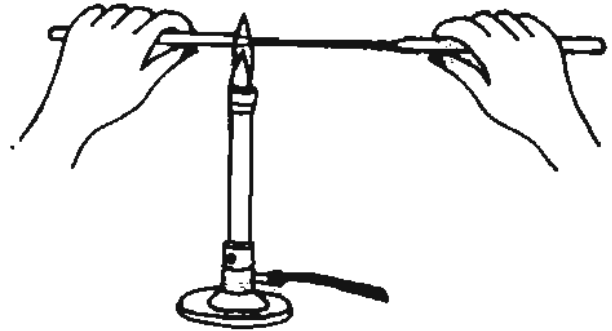
(গ) জেটনল প্রস্তুতি

যন্ত্র : এস্বেস্টেস প্রেট, কাচনল ও রेत।

কর্মপদ্ধতি : 10 cm দীর্ঘ নলের মাঝখানে উত্তপ্ত কর। নরম হয়ে গেলে শিখা থেকে শীঘ্র সরিয়ে সতর্কতার সাথে সমটানে মধ্যস্থ গলিত অংশ সমকৈশিক নলে পরিণত কর। এস্বেস্টেসের উপর রেখে ঠান্ডা করে বৈশিক নলের প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্যে রेत দিয়ে টান দিলে কেটে গিয়ে জেটে পরিণত হয়। কাচনলের ধারাল প্রান্তকে অনুজ্জ্বল শিখায় স্বল্পতাপে উত্তপ্ত করে মসৃণ কর।

সাবধানতা : (১) কাচনলের উত্তপ্ত অংশে হাত না দিয়ে এস্বেস্টেসের উপর শীতল করতে হবে।

(২) প্রান্তীয় ধারাল অংশকে স্বল্পতাপে মসৃণ করতে হবে।

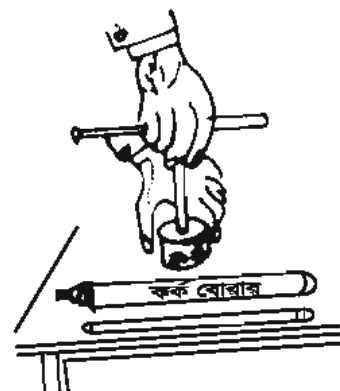


চিত্র ১৬.৬ : জেটনল প্রস্তুতকরণ

(ঘ) কর্ক হিঙ্গকরণ

যন্ত্রপাতি : কর্ক বোরার ও কর্ক প্রেসার।

কর্মপদ্ধতি : ফ্লাস্কের মুখের উপযুক্ত কর্কের উপর কাচনলের ব্যাস সম পাশাপাশি দুইটি হিঙ্গ করার জন্য উপযুক্ত ভালো কর্ক নিয়ে পানিতে ভিজিয়ে নরম কর, যাতে তা ফ্লাস্কের মুখকে বায়ুরোধী করতে পারে। কর্কের সরু প্রান্ত উপরমুখী করে টেবিলের উপর রাখ। কাচনল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট আকারের একটি কর্ক বোরার নিয়ে কর্কের উপর দুইটি হিঙ্গের স্থান ঠিক কর। বাম হাতে পানিতে ভেজা কর্কটিকে ধরে ডান হাতে কর্ক বোরারটিকে লম্বভাবে রেখে পরিমিত চাপে বাম-ডান দিক ঘুরালে বোরারটি কর্ক কেটে আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ে। যখন কর্ক বোরারটি বাম-ডান ঘুরাতে বাধা পায়, তখন বোরারটি টেনে বের করে অভ্যন্তরস্থ কাঁটা গুঁড়া, বোরারের অংশবিশেষ, শক্ত খাতব দণ্ড দিয়ে বের কর। পুনরায় পানি সিক্ত করে বোরারটিকে ঠিকভাবে চাপ দিয়ে হিঙ্গটি পূর্ণ কর। একইভাবে সমান্তরাল করে দ্বিতীয় হিঙ্গটি কর। কর্কের অন্যপ্রান্তে বোরারটি ব্যবহার করে হিঙ্গপথকে কাচনলের জন্য পরিষ্কার কর। টেবিলের উপর যথাস্থানে কর্কটিকে রেখে কর্ক প্রেসার ব্যবহার করেও হিঙ্গ করা যায়।



চিত্র ১৬.৭ : কর্ক হিঙ্গকরণ

সাবধানতা : (১) কর্কটি ফ্লাস্কের মুখের উপযুক্ত ও নরম দেখে নিতে হবে।

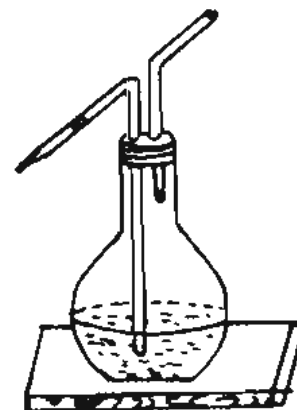
(২) কাচনল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট করে হিঙ্গটি করতে হবে।

(৩) হিঙ্গদ্বয় পরস্পর সমান্তরালে কাটতে হবে।

(ঙ) ওয়াশ বোতল সংযোজন

যন্ত্রপাতি : চ্যান্সাতলি ফ্লাস্ক, 45° ও 135° কোণে বাকনো নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে কাচনল, জেট ও রবার টিউব এবং দ্বি-হিঙ্গবিশিষ্ট কর্ক।

কর্মপদ্ধতি : কর্কের একটি হিঙ্গপথে 135° কোণে বাকানো কাচনলের একবাহু অপর হিঙ্গপথে 45° কোণে বাকানো নলে এমনভাবে সংযোজন কর, যেন ব সংযোজনের পর লম্বা নলটি ফ্লাস্কের প্রায় তলদেশে পৌঁছে। অপর প্রান্তে রবার টিউব দিয়ে জেটটিকে যুক্ত কর। এ সংযোজনের ফলে বাইরের নল দুইটি এবং সরলরেখা বরাবরে থাকে।



চিত্র ১৬.৮ : ওয়াশ বোতল

ফ্লাস্কটিকে পানি দিয়ে ধুয়ে, পাতিত পানিতে তিন-চতুর্থাংশ পূর্ণ করে কাচনলযুক্ত কর্কটিকে ফ্লাস্কের মুখে বায়ুরোধী করে সংযুক্ত কর। দ্বিতীয় নলের বাইরের প্রান্তে মুখ দিয়ে সজোরে ফুঁ দিলে বায়ুচাপে ভেতরের পানি জেট মুখে সরু ধারায় বের হয়। আবার জেট খুলে নিয়ে কর্কটিকে বৃন্দাজুলি দিয়ে ফ্লাস্কের মুখে চেপে ধরে কাত করলে দ্বিতীয় নল দিয়ে স্বাভাবিকভাবে পানি বের হয়।

সাবধানতা : (১) কর্ক সিজি দিয়ে ওয়াশ বোতলকে বায়ুরোধী করতে হবে।

(২) 45° কোণে বাকানো নলের লম্বা বাহু ফ্লাস্কের তলদেশে পৌঁছা দরকার।

(৩) 135° কোণে বাকানো নলের ভেতরের বাহু ফ্লাস্কের উপরিভাগে রাখা হয় এবং কখনও পানিতে ডুবানো উচিত নয়।

(৪) স্বাভাবিকভাবে পানি ঢালার সময় কর্কটিকে বৃন্দাজুলি দিয়ে চেপে রাখতে হবে।

পরীক্ষা নং ২

শিরোনাম : একটি অসমসত্ত্ব মিশ্রণ থেকে উপাদানসমূহ পৃথকীকরণ

উদ্দেশ্য : বালি, লবণ ও লোহার মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলো পৃথক করা।

সতর্কতা নির্দেশ : পরীক্ষাগারে সবসময় এপ্রন ও নিরাপদ চশমা ব্যবহার করবে।

যন্ত্রপাতি : চুম্বক, বিকার (২টি), ফানেল, ফিল্টার পেপার, কাচদণ্ড, ওয়াশ বোতল ও বেসিন।

রাসায়নিক দ্রব্য : লবণ ও সিলভার নাইট্রেট (AgNO_3) দ্রবণ।

তত্ত্ব : চুম্বক দ্বারা লোহার গুঁড়াকে আকর্ষণ করে পৃথক করলে মিশ্রণে অবশিষ্ট থাকে লবণ ও বালি। অবশিষ্ট মিশ্রণে পানি দিলে লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়, বালি হয় না। পরিস্রাবণ দ্বারা অবশেষরূপে বালি এবং পরিস্রুতরূপে লবণের দ্রবণ পাওয়া যায়। পরিস্রুতকে বাষ্পীভূত করলে কঠিন লবণ পাওয়া যায়।

কর্মপদ্ধতি : মিশ্রণটিকে কাগজের উপর ছড়িয়ে নিয়ে চুম্বক দ্বারা লৌহচূর্ণ আকর্ষণ করে অন্য কাগজে পৃথক করে রাখ। অবশিষ্ট মিশ্রণ বিকারে নিয়ে তাতে অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে কাচ দণ্ড (glass rod) দ্বারা নেড়ে লবণকে দ্রবীভূত কর। এরপর মিশ্রণকে ফিল্টার কর। অবশেষরূপে বালি ও পরিস্রুতরূপে লবণের দ্রবণ পাওয়া যায়। পরিস্রুতকে বাষ্পীকরণ করে কঠিন লবণ অবশেষরূপে পাওয়া যায়। বালিকে ধৌত করে তাতে লবণ আছে কিনা তা AgNO_3 দ্রবণ দ্বারা পরীক্ষা করে নিশ্চিত করা যায়।

সারণি ১৬.১ : লবণমুক্ত বালি নিশ্চিতকরণ

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত	করণীয়
(১) পরিস্রাবণের পর প্রাপ্ত বালিকে ধৌতকারী পানি একটি টেস্টটিউবে নিয়ে কয়েক ফোঁটা AgNO_3 দ্রবণ যোগ করা হল।	(১) সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে। অধঃক্ষেপটি সিলভার ক্লোরাইডের।	(১) বালিতে লবণ বিদ্যমান।	(১) আরও পানি দিয়ে লবণ ধৌত করতে হবে।
(২) বালিকে আবার পানি দ্বারা ধৌত করে পরিস্রুত পানিতে AgNO_3 দ্রবণ যোগ করা হল।	(২) অল্প সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে।	(২) কিঞ্চিৎ লবণ বিদ্যমান।	(২) আরো পানি দিয়ে বালি ধৌত করতে হবে।
(৩) পুনরায় বালি ধৌত করে পরিস্রুততে AgNO_3 দ্রবণ যোগ করা হল।	(৩) কোনো অধঃক্ষেপ পড়েনি।	(৩) বালিতে লবণ অনুপস্থিত।	(৩) বালিকে ফিল্টার কাগজে রেখে শুকানো হল।

সাবধানতা :

(১) লোহা গুঁড়া সম্পূর্ণ পৃথক করার জন্য একটি ভালো চুম্বক প্রয়োজন।

(২) পরিস্রাবণ করার সময় মিশ্রণকে ভালোভাবে থিতিয়ে উপরের পরিষ্কার দ্রবণকে প্রথমে ফিল্টার পেপারে ঢালতে হবে, যেন বেশি বালু ফিল্টার পেপারে জমা না হয়। এতে পরিস্রাবণ দ্রুত ও সহজতর হয়। অতঃপর মিশ্রণকে

নেড়ে সকল বালু ও দ্রবণ ফিল্টার পেপারের উপর ঢালতে হবে। এরপর কিছু পাতিত পানি দিয়ে অবশিষ্ট বালুকে বিকার হতে ফিল্টার পেপারে স্থানান্তর করতে হবে।

- (৩) পরিস্রুতকে বাষ্পীকরণের শেষ পর্যায়ে কিছু পানি থাকতে তাপ প্রয়োগ বন্ধ করে কাচের পাত্রটি ভাঙন হতে রক্ষা করতে হবে।

পরীক্ষা নং ৩

শিরোনাম : কেলাসন প্রক্রিয়ায় তুঁতে ও পানির সমসত্ত্ব মিশ্রণ থেকে বিশুদ্ধ তুঁতে পৃথকীকরণ।

উদ্দেশ্য : (ক) তুঁতের সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করা। (খ) সম্পৃক্ত দ্রবণ থেকে তুঁতের কেলাস তৈরি করা।

সতর্কতা নির্দেশ : পরীক্ষাগারে সবসময় এপ্রন ও নিরাপদ চশমা ব্যবহার করবে।

যন্ত্রপাতি : বিকার ২টি, ফানেল, ফিল্টার পেপার, কাচদণ্ড, বেসিন ও ত্রিপদী স্ট্যান্ড ও বার্নার।

রাসায়নিক বস্তু : তুঁতে ($\text{CuSO}_4, 5\text{H}_2\text{O}$)

তত্ত্ব : কোনো যৌগকে পানিতে দ্রবীভূত করলে দ্রবণ তৈরি হয়। যৌগের সাথে কোনো অদ্রবণীয় অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকলে পরিস্রাবণে তা দ্রবীভূত হয়। প্রাপ্ত পরিস্কার দ্রবণকে উত্তপ্ত করলে পানির কিছু অংশ উড়ে চলে যায়। এ দ্রবণকে ঠান্ডা করলে অতিপৃক্ত দ্রবণ পাওয়া যায়। অতিপৃক্ত দ্রবণ থেকে দ্রব সুনির্দিষ্ট ও সুসম জ্যামিতিক আকারে কেলাসিত হয়। অতিপৃক্ত দ্রবণে দ্রবের বিশুদ্ধ স্ফটিকের দানা যোগ করলে অথবা কাচের দণ্ড দ্বারা নিমজ্জিত অংশে বিকারের গা ঘষলে কেলাসন দ্রুততর হয়, তবে ছোট আকারের কেলাস পাওয়া যায়। দ্রবণীয় অপদ্রব্য এবং কিছু যৌগ দ্রবণে থেকে যায়। ফলে এভাবে প্রাপ্ত যৌগের পরিমাণ মূল পরিমাণ হতে কম, কিন্তু বিশুদ্ধ হয়।

কর্মপদ্ধতি : অবিশুদ্ধ কপার সালফেটকে (20–25g) মর্টারে গুঁড়ো করে বিকারে নিয়ে তাতে প্রায় 100 mL পানি যোগ করে নাড়তে থাক। যথাসময়ে দ্রবের সম্পূর্ণ অংশ দ্রবীভূত হয়ে একটি দ্রবণ তৈরি হবে। পরিস্রাবণ করে প্রাপ্ত পরিস্কার পরিস্রুতকে একটি বিকারে নিয়ে ত্রিপদী স্ট্যান্ডে তার জালির উপর রেখে বুনসেন দীপের সাহায্যে উত্তপ্ত কর। দ্রবণের আয়তন যখন প্রায় অর্ধেক পৌঁছে, তখন বুনসেন দীপ নিভিয়ে ফেল এবং দ্রবণকে নিজে থেকে ঠান্ডা হতে দাও। কয়েক ঘণ্টা পরে এসে দেখ সুন্দর স্ফটিক বের হয়েছে কিনা। না হলে এ যৌগের কয়েকটি ক্ষুদ্র দানা দ্রবণে যোগ কর অথবা নিমজ্জিত অংশে কাচদণ্ড দ্বারা বিকারের গা ঘষ। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবে কেলাস এসে গেছে। পরিস্রাবণ করে কেলাসগুলো পৃথক কর। পরিস্রুতকে আবার তাপ দিয়ে গাঢ় করে স্ফটিকের দ্বিতীয় ফসল পাওয়া যায়।

পরীক্ষা নং ৪

শিরোনাম : তুঁতে ও পানির সমসত্ত্ব মিশ্রণ থেকে বিশুদ্ধ পানি পৃথকীকরণ।

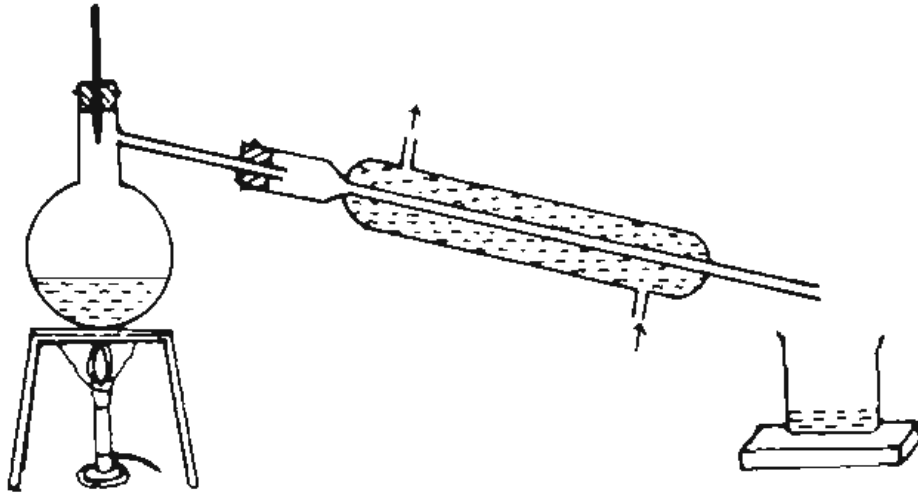
উদ্দেশ্য : (ক) পানিতে তুঁতের দ্রবণ প্রস্তুত করা। (খ) দ্রবণ থেকে পাতন পদ্ধতিতে পানি পৃথক করা।

সতর্কতা নির্দেশ : পরীক্ষাগারে সবসময় এপ্রন ও নিরাপদ চশমা ব্যবহার করবে।

যন্ত্রপাতি : পাতন ফ্লাস্ক, শীতক, রবার টিউব, বার্নার, থার্মোমিটার ও বিকার।

রাসায়নিক বস্তু : তুঁতের দ্রবণ।

তত্ত্ব : তুঁতের দ্রবণ একটি সমসত্ত্ব মিশ্রণ। এর উপাদানসমূহ হচ্ছে তুঁতে ও পানি। তন্মধ্যে তুঁতে একটি অনুদ্রায়ী কঠিন যৌগ, যার স্ফটনাঙ্ক পানির স্ফটনাঙ্কের অনেক উপরে। পানি 100°C তাপমাত্রায় ফোটে এবং তরল পানি বাষ্প রূপান্তরিত হয়। এ বাষ্পকে ঠান্ডা করলে তরল পানি পাওয়া যায়। পাতন যন্ত্রে এ কাজটি করা হয়। উত্তাপে তুঁতের দ্রবণ হতে পানি বাষ্পীভূত হয় এবং সে বাষ্প পাতন ফ্লাস্ক হয়ে শীতকে প্রবেশ করে। শীতকে শীতল হয়ে তা আবার তরল



চিত্র ১৬.৮ : পাতন পদ্ধতিতে সমসত্ত্ব মিশ্রণ থেকে পানি পৃথকীকরণ

পানিতে পরিণত হয় এবং স্বচ্ছকারী পাত্রে জমা হয়। এভাবে পৃথকীকৃত পানিকে পাতিত পানি বলা হয়। সাধারণ পানিতে বিভিন্ন লবণ দ্রবীভূত থাকে। কিন্তু পাতিত পানিতে এ সকল অনুদ্রাব্যী পদার্থ থাকে না, সুতরাং এ পানি সাধারণ পানি অপেক্ষা অনেক বিশুদ্ধ।

কর্ষণপদ্ধতি : উত্তের দ্রবণকে একটি পাতন ফ্লাস্কে নিয়ে তার মুখ ছিপি দিয়ে বন্ধ কর। এবার পাতন ফ্লাস্কের পার্শ্বনল ছিপিসহযোগে শীতকে যোগ কর। পাতিত তরল সঞ্চাহের জন্য শীতকের অপর প্রান্তে একটি স্বচ্ছকারী ফ্লাস্ক সংযুক্ত কর। এ শীতকের নিচের দিকের নলের সাথে রাবার টিউব দিয়ে পানির টেপ হতে ঠান্ডা পানি প্রবেশ করে এবং উপরের নলে যুক্ত রাবার টিউব দিয়ে সে পানি বের হয়ে যায়। এর ফলে শীতকের ভিতরে উত্তম জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হয়ে পাতিত পানিরূপে ফ্লাস্কে জমা হয়।

সাবধানতা : পাতন ফ্লাস্কে মোটামুটি পরিমাণ পানি থাকতেই পাতন প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে, না হলে ফ্লাস্ক উত্তাপে ফেটে যেতে পারে। এছাড়া দ্রবণ হঠাৎ করে বাষ্প (bump) করে শীতকে চলে আসতে পারে।

পরীক্ষা নং ৫

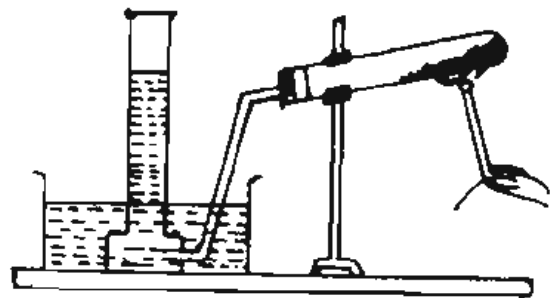
শিরোনাম : রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা অক্সিজেন প্রস্তুতকরণ ও এর ধর্ম পরীক্ষণ।

উদ্দেশ্য : (ক) পটাসিয়াম ক্লোরেট ও ম্যাংগানিজ ডাইঅক্সাইড থেকে অক্সিজেন প্রস্তুত করা। (খ) অক্সিজেনের ধর্ম পরীক্ষা করা।

সতর্কতা নির্দেশ : পরীক্ষাগারে সবসময় এপ্রন ও নিরাপদ চশমা ব্যবহার করবে।

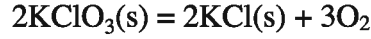
বস্তুপাতি : একটি তাপসহ কাচের পরীক্ষানল, কয়েকটি গ্যাস জার, গ্যাসদ্রোণি, নির্গম নল, আধার দণ্ড, ধারক, বুনসেন দীপ ইত্যাদি।

রাসায়নিক দ্রব্য : পটাসিয়াম ক্লোরেট ($KClO_3$) ও ম্যাংগানিজ ডাইঅক্সাইড (MnO_2)।



চিত্র ১৬.৯ : অক্সিজেন প্রস্তুতকরণ

তত্ত্ব : পরীক্ষাগারে পটাসিয়াম ক্লোরেট ও ম্যাংগানিজ ডাইঅক্সাইডের মিশ্রণকে উত্তপ্ত করলে পটাসিয়াম ক্লোরেট বিয়োজিত হয়ে অক্সিজেন উৎপন্ন করে। ম্যাংগানিজ ডাইঅক্সাইড এখানে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে এবং অপরিবর্তিত থেকে যায়।



প্রস্তুত প্রণালি : 4 ভাগ পটাসিয়াম ক্লোরেট ও 1 ভাগ ম্যাংগানিজ ডাইঅক্সাইড চূর্ণ মিশ্রণ একটি তাপসহ কাচের পরীক্ষানলে নিয়ে তার মুখে ছিপির সাহায্যে একটি নির্গম নল যুক্ত কর। মিশ্রণ চূর্ণসহ পরীক্ষানলটিকে একটি স্ট্যান্ডে ক্ল্যাম্পের সাহায্যে এমনভাবে আবদ্ধ কর যেন এর মুখের দিক ভূমির দিকে ঈষৎ হেলে থাকে। এখন নির্গম নলের শেষ প্রান্তকে একটি পানি ভর্তি গ্যাসদ্রোণির নিচে নিমজ্জিত করে বসায়।

অতঃপর পরীক্ষানলটিকে বুনসেন দীপের সাহায্যে সতর্কতার সহিত সমভাবে উত্তপ্ত কর। পটাসিয়াম ক্লোরেট বিয়োজিত হয়ে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন অক্সিজেন পানির মধ্যস্থিত নির্গম নলের মুখ দিয়ে বের হবে। প্রথম 2-1 মিনিট গ্যাস সংগ্রহ না করে পরীক্ষানলের ভিতরের বায়ু বের হতে দাও। এখন একটি গ্যাস জার পানিপূর্ণ করে গ্যাসদ্রোণিতে নির্গম নলের মুখের উপর উপড় করে ধর ও পানির অপসারণ দ্বারা তাতে গ্যাস ভর্তি কর। জারটি গ্যাস পূর্ণ হলে একটি ঢাকনা দিয়ে মুখ বন্ধ কর ও পানি হতে বের কর। গ্যাস অতি দ্রুত নির্গত হতে থাকলে কিছুক্ষণের জন্য বুনসেন দীপ সরিয়ে রাখ ও প্রয়োজন মতো পুনরায় তাপ প্রয়োগ কর। এভাবে কয়েকটি গ্যাস জার অক্সিজেনপূর্ণ কর।

অক্সিজেন সংগ্রহ করার সময় লক্ষ রাখবে, যেন কখনও পরীক্ষা নলের ভিতর অক্সিজেনের চাপ কমে না যায় অর্থাৎ সর্বদাই অক্সিজেন বের হতে থাকে। নতুবা নির্গম নল বেয়ে পানি শোষিত হয়ে ভিতরে উঠে আসতে পারে এবং পরীক্ষানল ফেটে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কাজেই অক্সিজেন সংগ্রহ শেষ হলে নির্গম নল পানি হতে বের করে আনবে ও তারপরে পরীক্ষা নলে তাপ প্রয়োগ বন্ধ করবে।

সাবধানতা : (১) ম্যাংগানিজ ডাইঅক্সাইড বিশুদ্ধ হওয়া অত্যাাবশ্যক। এতে কার্বনের কণা থাকলে ভিতরে আগুন ধরে যাবে, বিস্ফোরণও হতে পারে।

(২) পরীক্ষানলের এক-চতুর্থাংশের বেশি মিশ্রণ নিবে না।

(৩) পরীক্ষানলে সমভাবে তাপ প্রয়োগ করবে।

(৪) অতি দ্রুত অক্সিজেন নির্গত হতে শুরু করলে কিছুক্ষণের জন্য বুনসেন দীপ সরিয়ে নাও ও প্রয়োজন মতো আবার তাপ প্রয়োগ কর।

(৫) বিক্রিয়া শেষে বুনসেন দীপ সরানোর আগেই নির্গম নল পানির নিচ হতে বের করবে, না হলে পরীক্ষানলের ভিতর গ্যাসের চাপ কমে পানি শোষিত হয়ে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

সারণি ১৬.২ : অক্সিজেন গ্যাসের ধর্ম পরীক্ষা

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
১। একটি অক্সিজেন গ্যাস জার নিয়ে গ্যাসের স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ লক্ষ কর।	১। কোনো স্বাদ, বর্ণ বা গন্ধ অনুভূত হয় না।	১। অক্সিজেন স্বাদহীন, বর্ণহীন ও গন্ধহীন গ্যাস।
২। একটি পরীক্ষানলে পানি নিয়ে তাতে অক্সিজেন চালনা কর।	২। গ্যাস পানিতে তেমন দ্রবীভূত হয় না, বুদবুদ আকারে বের হয়ে যায়।	২। অক্সিজেন পানিতে সামান্য দ্রবণীয় বা অদ্রবণীয়।

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
৩। একটি অক্সিজেন ভর্তি গ্যাস জার নাকের কাছে ধর ও শ্বাস গ্রহণ কর।	৩। অতি সহজে শ্বাস গ্রহণ করা যায়।	৩। অক্সিজেন গ্যাসে শ্বাস গ্রহণ সহজ হয়।
৪। একটি কাঠিতে আগুন ধরাও এবং আগুন থাকা অবস্থায় কাঠিটি একটি অক্সিজেন ভর্তি গ্যাস জারে প্রবেশ করাও।	৪। কাঠিটি উজ্জ্বল শিখাসহ জ্বলতে আরম্ভ করে কিন্তু গ্যাসটি নিজে জ্বলে না।	৪। অক্সিজেন নিজে জ্বলে না, কিন্তু অপর বস্তুর জ্বলনে সাহায্য করে।
৫। কিছুক্ষণ পর কাঠিটি পুড়ে গেলে জারের মধ্যে চুনের পানি নিয়ে ভালোভাবে নাড়াও।	৫। চুনের পানি ঘোলাটে হয়ে গেল।	৫। কাঠির দহনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। তা চুনের পানির সহিত অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন করে বলে চুনের পানি ঘোলাটে হয়। $\text{C(s)} + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g});$ $\text{Ca(OH)}_2(\text{aq}) + \text{CO}_2(\text{g}) = \text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O(l)}$

পরীক্ষা নং ৬

শিরোনাম : কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রস্তুতকরণ ও এর ধর্ম পরীক্ষণ।

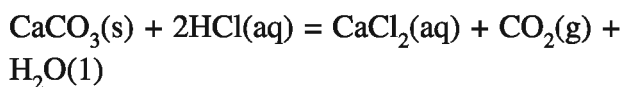
উদ্দেশ্য : (ক) মার্বেল পাথর ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রস্তুত করা। (খ) কার্বন ডাইঅক্সাইডের ধর্ম পরীক্ষা করা।

সতর্কতা নির্দেশ : পরীক্ষাগারে সবসময় এপ্রন ও নিরাপদ চশমা ব্যবহার করবে।

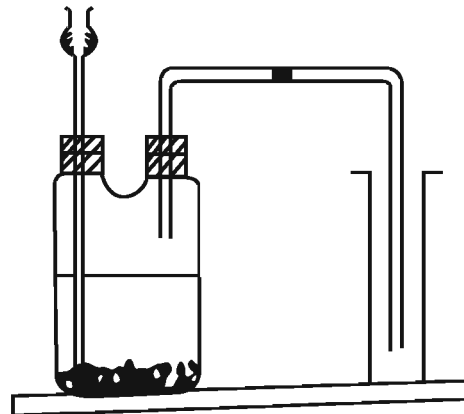
যন্ত্রপাতি : একটি উল্ফ বোতল, একটি থিস্‌ল ফানেল, দুইবার সমকোণ বাঁকানো একটি নির্গম নল, ঢাকনাযুক্ত কয়েকটি গ্যাস জার, ছিদ্রযুক্ত ছিপি ইত্যাদি।

রাসায়নিক দ্রব্য : মার্বেল পাথরের (CaCO_3) টুকরা ও লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড।

তত্ত্ব : মার্বেল পাথরের সাথে লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।



কার্বন ডাইঅক্সাইড পানিতে অল্প দ্রবণীয় বলে পানির অপসারণ দ্বারা একে সংগ্রহ করা হয় না। বায়ু অপেক্ষা ভারী বলে একে বায়ুর উর্ধ্বমুখী অপসারণ দ্বারা সংগ্রহ করা হয়।



চিত্র ১৬.১০ : কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রস্তুতকরণ

প্রস্তুত প্রণালি : একটি উল্ফ বোতলে মার্বেল পাথরের কিছু ছোট টুকরা নাও। ছিপির সাহায্যে বোতলটির এক মুখে থিস্‌ল ফানেল ও অপর মুখে দুইবার সমকোণে বাঁকানো একটি নির্গম নল যোগ কর। থিস্‌ল ফানেলের ভিতর দিয়ে কিছু পরিমাণ পানি বোতলে নাও যেন থিস্‌ল ফানেলের শেষ প্রান্ত ও মার্বেল পাথর পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে। এবার যন্ত্রটি বায়ুরোধী হয়েছে কিনা পরীক্ষার জন্য নির্গম নলে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দাও। দেখবে থিস্‌ল ফানেলে নল বেয়ে পানি উপরে উঠছে। নির্গম নল হতে মুখ সরিয়ে আঙ্গুল দিয়ে প্রান্ত চেপে ধর। যদি থিস্‌ল ফানেলে পানি স্থির থাকে, তবে যন্ত্র বায়ুরোধী হয়েছে। তখন নির্গম নলের বাইরের প্রান্ত খাড়া করে রাখা একটি গ্যাস জারের তলদেশ পর্যন্ত প্রবেশ করাও। এরপর ফানেলের ভিতর কিছু মধ্যম গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিড (১ আয়তন এসিড + ১ আয়তন পানি) ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে যোগ কর। মার্বেল পাথর ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ার ফলে বৃদ্ধবুদু আকারে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় ও নির্গম নল দিয়ে বের হয়ে বায়ুর উর্ধ্বমুখী অপসারণ দ্বারা গ্যাস জারে জমা হয়।

সাবধানতা :

- (১) যন্ত্রটি অবশ্যই বায়ুরোধী হতে হবে।
- (২) থিস্‌ল ফানেলের শেষ প্রান্ত পানির নিচে নিমজ্জিত রাখতে হবে।
- (৩) তাপ প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

সারণি ১৬.৩ : কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের ধর্ম পরীক্ষা

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
১। একটি গ্যাস জারে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বর্ণ ও গন্ধ লক্ষ কর।	১। কোনো বর্ণ বা গন্ধ নেই। কিন্তু সামান্য শ্বাসরোধকর অবস্থা অনুভূত হয়।	১। কার্বন ডাইঅক্সাইড বর্ণ ও গন্ধহীন গ্যাস। এটি শ্বাসরোধী।
২। একটি পরীক্ষানল কার্বন ডাইঅক্সাইড পূর্ণ করে পানির মধ্যে উপুড় করে ধর এবং বেশ কিছুক্ষণ এভাবে রাখ।	২। পরীক্ষা নলের ভিতর কিছু পরিমাণ পানি প্রবেশ করল।	২। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পানিতে কিছুটা দ্রবণীয়।
৩। কার্বন ডাইঅক্সাইড পূর্ণ একটি পরীক্ষানলে সামান্য পরিমাণ পানি নিয়ে ভালোরূপে বাঁকাও এবং এতে কয়েক ফোঁটা নীল লিটমাস দ্রবণ যোগ কর।	৩। নীল লিটমাস দ্রবণ লাল বর্ণ ধারণ করল।	৩। কার্বন ডাইঅক্সাইড এসিড ধর্মীয়। এটি পানির সহিত কার্বনিক এসিড উৎপন্ন করে। $\text{H}_2\text{O(l)} + \text{CO}_2\text{(g)} = \text{H}_2\text{CO}_3\text{(aq)}$
৪। কার্বন ডাইঅক্সাইড পূর্ণ গ্যাস জারে একটি জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করাও।	৪। কাঠিটি নিভে গেল ও গ্যাস জ্বলল না।	৪। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নিজে জ্বলে না এবং অন্য বস্তুকে জ্বলতে সাহায্য করে না, নিভিয়ে দেয়।
৫। একটি বায়ুপূর্ণ গ্যাস জারের উপর একটি কার্বন ডাইঅক্সাইড পূর্ণ গ্যাস জার উলটিয়ে মুখে মুখে স্থাপন কর। এরপর গ্যাস জারের ঢাকনাটি সরিয়ে নাও, কিছুক্ষণ পর উপরের জারটি সরিয়ে উভয় জারে জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করাও।	৫। উপরের জারে কাঠিটি জ্বলতে থাকে আর নিচের জারে কাঠিটি প্রবেশ করানো মাত্র নিভে গেল।	৫। কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ু অপেক্ষা ভারী কেননা উপরের জারের CO_2 নিচের জারের বায়ু সরিয়ে তাতে প্রবেশ করেছে।

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
৬। (ক) একটি পরীক্ষানলে চুনের পানি নিয়ে তাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা কর।	৬। (ক) চুনের পানি ঘোলাটে হয়ে গেল।	৬। (ক) কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রথমে চুনের পানির সাথে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট গঠন করে, ফলে পানি ঘোলাটে দেখায়। $\text{Ca(OH)}_2(\text{aq}) + \text{CO}_2(\text{g}) = \text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
(খ) ঘোলাটে পানিতে পরে অনেকক্ষণ ধরে কার্বন ডাইঅক্সাইড চালনা কর।	(খ) ঘোলাটে পানি আবার পরিষ্কার হয়ে গেল।	(খ) অধিক পরিমাণ CO_2 চালনা করলে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট, $\text{Ca(HCO}_3)_2$ -এ পরিণত হয়। $\text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{g}) = \text{Ca(HCO}_3)_2(\text{aq})$
(গ) পরিষ্কার দ্রবণকে বুনসেন দীপে ফুটাও।	(গ) দ্রবণটি পুনরায় ঘোলাটে হয়ে গেল।	(গ) তাপের প্রভাবে ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট বিয়োজিত হয়ে আবার অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেটে পরিণত হয়। $\text{Ca(HCO}_3)_2(\text{aq}) = \text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
৭। একটি শুষ্ক পরীক্ষানলে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে বৃন্দাজুলির সাহায্যে এর মুখ বন্ধ কর ও পরীক্ষানলটি উপুড় করে বৃন্দাজুলি সমেত পরীক্ষা নলের মুখ কস্টিক সোডা দ্রবণে ডুবাও ও অজুলি সরিয়ে নাও। অজুলি ভালোভাবে পানিতে ধুয়ে ফেল।	৭। কস্টিক সোডা দ্রবণ পরীক্ষা নলের ভেতর প্রবেশ করল ও পরীক্ষানলটি পূর্ণ করে ভর্তি করল।	৭। কার্বন ডাইঅক্সাইড কস্টিক সোডা দ্রবণে শোষিত হয়। $2\text{NaOH}(\text{aq}) + \text{CO}_2(\text{g}) = \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
৮। কার্বন ডাইঅক্সাইড পূর্ণ একটি গ্যাস জারে এক টুকরা জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়ামের পাত প্রবেশ করাও।	৮। ম্যাগনেসিয়ামের পাত উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে থাকে। দহনের ফলে জারের গায়ে কাল বর্ণের কঠিন পদার্থের কণা জমা হল।	৮। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসে ম্যাগনেসিয়াম জ্বলে। এ সময় কার্বন উৎপন্ন হয়। $2\text{Mg}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) = 2\text{MgO}(\text{s}) + \text{C}(\text{s})$

পরীক্ষা নং ৭

শিরোনাম : অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুতি ও এর ধর্ম পরীক্ষণ।

উদ্দেশ্য : (ক) অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও কুইক লাইম থেকে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করা। (খ) অ্যামোনিয়ার ধর্ম পরীক্ষা করা।

সতর্কতা নির্দেশ : পরীক্ষাগারে সবসময় এপ্রন ও নিরাপদ চশমা ব্যবহার করবে।

যন্ত্রপাতি : একটি তাপসহ কাচনল, কয়েকটি গ্যাস জার, সমকোণে বাঁকানো একটি নির্গম নল, দুইটি আধার দণ্ড, ধারক, বুনসেন দীপ, কর্ক, মর্টার, পরীক্ষানল প্রভৃতি।

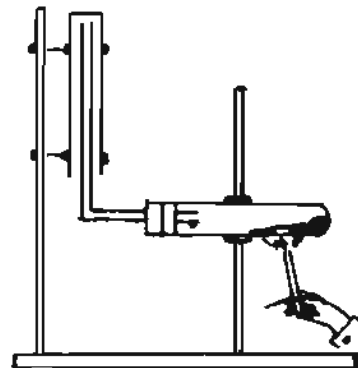
রাসায়নিক দ্রব্য : অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও কুইক লাইম অথবা কলিচুন।

তত্ত্ব : সাধারণত যে কোনো অ্যামোনিয়াম লবণকে যে কোনো ক্ষারের সাথে উত্তপ্ত করে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করা যায়। পরীক্ষাগারে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও কুইক লাইম (CaO) বা স্লেকেড লাইমকে (Ca(OH)₂) উত্তপ্ত করে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করা হয়।



অ্যামোনিয়া পানিতে অতিমাত্রায় দ্রবণীয় বলে পানির অপসারণ দ্বারা একে সঞ্ছদ করা যায় না। অ্যামোনিয়া বাতাস অপেক্ষা বেশ হালকা। অতএব একে বাতাসের নিম্নমুখী অপসারণ দ্বারা সঞ্ছদ করা হয়।

(ক) প্রস্তুত প্রণালি : একটি মর্টারে কিছু শুকনো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও প্রায় ষ্টিগুণ ওজনের শুকনো কলিচুন ভালোরূপে গুঁড়ো করে মিশাও ও মিশ্রণকে একটি বড় আকারের তাপসহ কাচনলে নাও। কাচনলটিকে একটি ধারকের সাহায্যে আনুভূমিক করে আটকিয়ে রাখ। কাচনলের মুখে সমকোণে বাঁকানো একটি নির্গম নল সংযুক্ত কর। নির্গম নলের খোলা প্রান্ত একটি উপুড় করা শুকনো গ্যাস জারের ভেতর প্রবেশ করানো। গ্যাস জারটি আগে থেকে ধারকের সাহায্যে একটি দণ্ডের সহিত আটকিয়ে রাখ। এখন বুনসেন দীপের সাহায্যে কাচনলে ধীরে ধীরে তাপ প্রয়োগ কর। বাঁকাণো গম্বুজ অ্যামোনিয়া গ্যাস বের হবে ও বায়ুর নিম্নমুখী অপসারণ দ্বারা গ্যাস জারে জমা হবে। গ্যাস জার অ্যামোনিয়া পূর্ণ হলো কিনা বুঝার জন্য গ্যাস জারের মুখে HCl-এ ভিজানো একটি কাচ দণ্ড ধর। ঘন সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন হলে গ্যাস জারটি অ্যামোনিয়াতে পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা হবে। গ্যাসপূর্ণ জারের মুখ ঢাকনা দ্বারা বন্ধ করে টেবিলের উপর রাখ। এভাবে কয়েকটি গ্যাস জারে অ্যামোনিয়া গ্যাস সঞ্ছদ কর।



চিত্র ১৬.১১ : অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুতিকরণ

সাবধানতা :

- (১) তাপসহ কাচনলটিকে আনুভূমিক করে রাখা আবশ্যিক। এতে গ্যাস নির্গমনের সুবিধা হয় ও বিক্রিয়ার ফলে উৎপাদিত পানি কাচনলের তলত অংশ আসতে পারে না। উৎপাদিত পানি কাচনলের তলত অংশ আসলে কাচনলটি ফেটে যেতে পারে।
- (২) গ্যাস নির্গমনের সুবিধার জন্য বিক্রিয়া মিশ্রণের পরিমাণ কাচনলের ধারণ ক্ষমতার অর্ধেকের কম হতে হবে।
- (৩) অ্যামোনিয়া পানিতে অতিমাত্রায় দ্রবণীয় বলে নির্গম নল, গ্যাস জার, পরীক্ষানল প্রভৃতি শুষ্ক হওয়া প্রয়োজন।
- (৪) কাচনলে ধীরে ধীরে ও সমভাবে তাপ প্রয়োগ করতে হবে।
- (৫) কাচনলটি অবশ্যই তাপসহ ও শুকনো হতে হবে।

সারণি ১৬.৪ : অ্যামোনিয়া গ্যাসের ধর্ম পরীক্ষা

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
১। একটি শুষ্ক পরীক্ষানল অ্যামোনিয়াপূর্ণ করে এর বর্ণ ও গন্ধ লক্ষ্য কর।	১। কোনো বর্ণ নেই, কিন্তু ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়।	১। অ্যামোনিয়া একটি ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত বর্ণহীন গ্যাস।
২। (ক) একটি শুষ্ক পরীক্ষানল অ্যামোনিয়াপূর্ণ করে তার মুখ বৃন্দাজুলির সাহায্যে চেপে ধর ও পরীক্ষানলটি উপুড় করে বৃন্দাজুলিসহ পরীক্ষানলের মুখ পানিতে ডুবাত, তারপর অজুলি সরিয়ে নাও।	২। (ক) পানি সজোরে নলের ভিতর প্রবেশ করল ও নলটি সম্পূর্ণরূপে ভর্তি করল।	২। (ক) অ্যামোনিয়া গ্যাস পানিতে অত্যন্ত দ্রবণীয়।
(খ) একটি পরীক্ষানলে অ্যামোনিয়া গ্যাস নিয়ে তার ভিতরে একটি ভেজা লাল লিটমাস কাগজ প্রবেশ করাও।	(খ) লাল লিটমাস কাগজের বর্ণ নীল হয়ে গেল।	(খ) অ্যামোনিয়া গ্যাস ক্ষারধর্মী। $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{NH}_4\text{OH}(\text{aq})$
(গ) পরীক্ষানলে অ্যামোনিয়া গ্যাস নিয়ে তার ভেতর ভেজা হলুদ কাগজ ১ প্রবেশ করাও।	(গ) হলুদ কাগজ বাদামি রং ধারণ করল।	(গ) অ্যামোনিয়া শনাক্ত করা গেল।
৩। একটি অ্যামোনিয়াপূর্ণ গ্যাস জারে জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করাও।	৩। কাঠিটি নিভে গেল এবং গ্যাসটি জ্বলল না।	৩। অ্যামোনিয়া গ্যাস দাহ্যও নয় এবং দহনের সহায়কও নয়।
৪। অ্যামোনিয়াপূর্ণ একটি গ্যাস জারের মুখে একটি বায়ুপূর্ণ গ্যাস জার উপুড় করে বসাত এবং তাদের মধ্যকার ঢাকনাটি সরিয়ে নাও। কিছুক্ষণ পরে উপরের জারে পানিতে ভেজা লাল লিটমাস কাগজ প্রবেশ করাও।	৪। লাল লিটমাস কাগজ নীল হল।	৪। অ্যামোনিয়া বাতাস অপেক্ষা হালকা। কেননা, নিচের জারের অ্যামোনিয়া উপরের জারের বাতাসকে অপসারণ করে তার স্থান দখল করেছে।
৫। অ্যামোনিয়াপূর্ণ একটি পরীক্ষানল বা গ্যাস জারের মুখে হাইড্রোক্লোরিক এসিডে ভিজানো একটি কাচ দণ্ড ধর।	৫। পরীক্ষা নলের বা গ্যাস জারের মুখ সাদা ধোঁয়ায় পূর্ণ হয়ে গেল।	৫। অ্যামোনিয়া হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন করে। $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g}) = \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$
৬। পানিতে অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করে অ্যামোনিয়া দ্রবণ প্রস্তুত কর। অতঃপর এই দ্রবণ দিয়ে একে একে নিচের পরীক্ষাগুলো কর।		

১. হলুদ বাটা, পানি সিক্ত সাদা কাগজ।

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
(ক) একটি পরীক্ষানলে কপার সালফেট দ্রবণ নিয়ে তাতে অল্প পরিমাণ অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ কর।	(ক) নীলাভ সাদা বর্ণের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হল।	(ক) কপার সালফেটের সাথে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়ায় ক্ষারকীয় কপার সালফেট গঠিত হয়। $2\text{CuSO}_4 + 2\text{NH}_4\text{OH} = \text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuSO}_4 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
(খ) পরে সে পরীক্ষা নলে অধিক পরিমাণ অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ কর।	(খ) গাঢ় নীল বর্ণের দ্রবণ উৎপন্ন হল।	(খ) কপার হাইড্রোক্সাইডের সাথে অ্যামোনিয়া দ্রবণের বিক্রিয়ায় কপারের দ্রবণীয় জটিল লবণ উৎপন্ন হয়। $\text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{CuSO}_4 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 (\text{aq}) + 6\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq}) = 2[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4(\text{aq}) + 8\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
(গ) একটি পরীক্ষানলে সামান্য পরিমাণ ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ নিয়ে তাতে অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ কর।	(গ) বাদামি বর্ণের অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হল।	(গ) বিক্রিয়ার ফলে ফেরিক হাইড্রোক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। $\text{FeCl}_3(\text{aq}) + 3\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq}) = \text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s}) + 3\text{NH}_4\text{Cl}(\text{aq})$
(ঘ) একটি পরীক্ষানলে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের সাথে অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ কর।	(ঘ) সাদা বর্ণের জেলির মতো অধঃক্ষেপ পড়ে।	(ঘ) বিক্রিয়ায় অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। $\text{AlCl}_3(\text{aq}) + 3\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq}) = \text{Al}(\text{OH})_3(\text{s}) + 3\text{NH}_4\text{Cl}(\text{aq})$
(ঙ) একটি পরীক্ষানলে সামান্য পরিমাণ সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ নিয়ে ধীরে ধীরে অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ কর।	(ঙ) প্রথম বাদামি বর্ণের অধঃক্ষেপ পড়ে, কিন্তু অধিক অ্যামোনিয়া যোগে পরিষ্কার দ্রবণ পাওয়া যায়।	(ঙ) প্রথমে সিলভার অক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু অধিক অ্যামোনিয়ার সাথে তা দ্রবণীয় জটিল যৌগ গঠন করে। $2\text{AgNO}_3(\text{aq}) + 2\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq}) = 2\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{aq}) + \text{Ag}_2\text{O}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l});$ $\text{Ag}_2\text{O}(\text{s}) + 4\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq}) = 2\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{OH}(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

পরীক্ষা নং ৮

শিরোনাম : সাবান প্রস্তুত প্রণালি।

উদ্দেশ্য : নারিকেল ও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়ায় সাবান তৈরি করা।

সতর্কতা নির্দেশ : পরীক্ষাগারে সবসময় এপ্রন ও নিরাপদ চশমা ব্যবহার করবে।

যন্ত্রপাতি : বিকার ২টি, ত্রিপদী স্ট্যান্ড, তারজালি, বুখনার ফানেল, ফিল্টার পেপার, শোষণ পাম্প (পানিচালিত)।

রাসায়নিক দ্রব্য : নারিকেল বা অন্য কোনো তেল, কস্টিক সোডা ও লবণ।

তত্ত্ব : তেল ও চর্বি হচ্ছে উচ্চতর ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারিনের ট্রাই-এস্টার বা গ্লিসারাইডসমূহের মিশ্রণ। উচ্চতর সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডসমূহের মধ্যে, বিশেষত পামিটিক এসিড ($C_{15}H_{31}COOH$), স্টিয়ারিক এসিড ($C_{17}H_{35}COOH$) এবং অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডসমূহের মধ্যে ওলিক এসিড $C_{17}H_{33}COOH$ বিদ্যমান। সুতরাং তেল বা চর্বির সাথে সোডিয়াম বা পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ উত্তপ্ত করলে অন্যান্য সকল এস্টারের ন্যায় তা অ্যালকোহল (এক্ষেত্রে গ্লিসারিন) এবং এসিডের সোডিয়াম বা পটাসিয়াম লবণে পরিণত হয়।

ফ্যাটি এসিডসমূহের সোডিয়াম বা পটাসিয়াম লবণই হচ্ছে সাবান। তৈরির হওয়ার পর তা পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এ দ্রবণে লবণ যোগ করলে সাবান দ্রবণ হতে বের হয়ে আসে। পরিস্রাবণের মাধ্যমে তা পৃথক করা যায়।

প্রস্তুত প্রণালি : প্রায় 50g পরিমাণ নারিকেল তেল একটি বড় বিকারে নাও। আরেকটি বিকারে প্রায় 20g কস্টিক সোডা প্রায় 100 mL পানিতে দ্রবীভূত কর। এ দ্রবণকে প্রথম বিকারে ঢাল। অতঃপর বিকারটিকে একটি ত্রিপদী স্ট্যান্ডে তারজালির উপর রেখে বুনসেন দীপের সাহায্যে তাপ দাও যেন তা ফুটতে থাকে। এক সময় দুইটি স্তরের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। তখন বুনসেন দীপ সরিয়ে একে ঠান্ডা হতে দাও। এরপর প্রায় 10g সাধারণ লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) অল্প অল্প করে এতে যোগ কর এবং কাচ দণ্ড দিয়ে নাড়তে থাক, অতঃপর বুখনার ফানেলে ফিল্টার পেপার রেখে শোষণ পাম্পের (suction pump) সাহায্যে পরিস্রাবণ কর। ফিল্টার পেপারে প্রাপ্ত অবশেষই হচ্ছে সাবান। একে বাতাসে শুকিয়ে নাও।

পরীক্ষা নং ৯

শিরোনাম : ধাতব লবণে কেলাস পানি শনাক্তকরণ।

উদ্দেশ্য : কপার সালফেট লবণে পানি শনাক্ত করা।

সতর্কতা নির্দেশ : পরীক্ষাগারে সবসময় এপ্রন ও নিরাপদ চশমা ব্যবহার করবে।

যন্ত্রপাতি : একটি তাপসহ কাচনল, সমকোণে বাঁকানো একটি লম্বা কাচনল, দুইটি আধার দণ্ড, ধারক, বুনসেন দীপ, কর্ক, মর্টার, পরীক্ষানল।

রাসায়নিক দ্রব্য : তুঁতে বা অন্য কোনো কেলাস লবণ, যেমন $FeSO_4 \cdot 7H_2O$

তত্ত্ব : বিভিন্ন কেলাস লবণের অভ্যন্তরে কেলাস পানি হিসেবে পানির অণু বিদ্যমান থাকে, উত্তাপে পানিযুক্ত লবণ হতে পানির অণু জলীয় বাষ্প হিসেবে বের হয়ে আসে। একে ঠান্ডা করে পানি বলে প্রমাণ করা যায়।



লবণের প্রাথমিক ভর ও উত্তাপের পরের ভর হতে পানির শতকরা পরিমাণও হিসাব করা যায়।

কর্মপদ্ধতি : প্রায় 16g পানিযুক্ত কপার সালফেট নাও, একে মর্টারে গুঁড়ো কর। একটি তাপসহ বড় আকারের কাচনলের ওজন নাও। এর ভেতর কপার সালফেটের গুঁড়ো নিয়ে এর ওজন নাও। দুইটি ওজনের পার্থক্য হতে কপার সালফেটের ভর পাওয়া যাবে। কাচনলটিকে একটি ধারকের সাহায্যে একটি দণ্ডের সাথে আটকিয়ে রাখ যেন কাচনলটির সামনের দিক ভূমির দিকে একটু কাত হয়ে থাকে। কাচনলের মুখে সমকোণে বাঁকানো একটি লম্বা নির্গম নল সংযুক্ত কর। নির্গম নলের মুখ খাড়াভাবে আটকানো একটি পরীক্ষানলের মধ্যে ঢুকবে।

এখন বুনসেন দীপের সাহায্যে কাচনলে ধীরে ধীরে তাপ প্রয়োগ কর। কাচনলের সামনের দিকে পানি জমা হতে দেখলে সেখানেও মাঝে মাঝে তাপ দিয়ে তা বাষ্পীভূত কর। দেখবে নির্গম নলে জলীয় বাষ্প জমতে থাকবে। এক সময় কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ সঞ্ছন নলে জমা হবে। কাচনলটিকে 15-30 মিনিট উত্তপ্ত করে বুনসেন দীপ নিভিয়ে দাও। এটি ঠান্ডা হলে নির্গম নল খুলে একটু ঝাঁকিয়ে এর ভেতরকার তরল পদার্থ যতটা সম্ভব পরীক্ষানলে নাও। এরপর নিম্নের পরীক্ষাগুলো কর।

সারণি ১৬.৫ : পানি শনাক্তকরণ

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
১। পরীক্ষানলের তরলের বর্ণ ও গন্ধ পরীক্ষা কর।	১। কোনো বর্ণ বা গন্ধ নেই।	১। এটি একটি বর্ণ ও গন্ধহীন তরল পদার্থ (সম্ভবত পানি)।
২। পানিশূন্য কপার সালফেট নিয়ে তাতে প্রথম পরখ নল হতে দুই এক ফোঁটা তরল যোগ করা হল।	২। সাদা কপার সালফেট তৎক্ষণাৎ নীল বর্ণ ধারণ করে।	২। তরলটি নিশ্চিতভাবে পানি $\text{CuSO}_4(\text{s}) (\text{সাদা}) + 5\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = \text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}(\text{s}) (\text{নীল})$

পরীক্ষা নং ১০

শিরোনাম : কাপড়ে আয়োডিনের রং বিরঞ্জন।

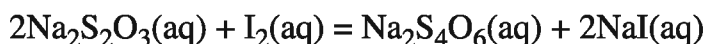
উদ্দেশ্য : মাড় (স্টার্চ) দেওয়া কাপড়ে আয়োডিনের (নীল) রং হাইপো দ্বারা বিরঞ্জিত করা।

সতর্কতা নির্দেশ : পরীক্ষাগারে সবসময় এপ্রন ও নিরাপদ চশমা ব্যবহার করবে।

যন্ত্রপাতি : পরীক্ষানল ও ড্রপার।

রাসায়নিক দ্রব্য : আয়োডিন, পটাসিয়াম আয়োডাইড, হাইপো বা সোডিয়াম থায়োসালফেট, মাড়।

তত্ত্ব : কাপড়ে যে মাড় দেওয়া হয়, তার প্রধান উপাদান হচ্ছে স্টার্চ। আয়োডিন স্টার্চের সাথে গাঢ় নীল বর্ণ উৎপন্ন করে। সুতরাং মাড় দেওয়া কাপড়ে আয়োডিনের দ্রবণ পড়লে গাঢ় নীল বর্ণের সৃষ্টি হয়। হাইপো হচ্ছে সোডিয়াম থায়োসালফেটের বাণিজ্যিক নাম। সোডিয়াম থায়োসালফেট আয়োডিনের সাথে নিম্নরূপে বিক্রিয়া করে।



সুতরাং যে কাপড়ে আয়োডিনে লেগেছে, তাতে ফোঁটায় ফোঁটায় সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণ যোগ করলে তা আয়োডিনের সাথে বিক্রিয়া করে এর পরিমাণ ক্রমশ কমাবে, এক সময় সকল আয়োডিন নিঃশেষিত হবে এবং নীল রং দূর হবে।

কর্মপদ্ধতি : একটি পরীক্ষা নলে 2-3 mL পানিতে 0.1 g-এর মতো পটাসিয়াম আয়োডাইড এবং দুই/এক দানা আয়োডিন যোগ করে ঝাঁকাও। একটি বেগুনি বর্ণের দ্রবণ তৈরি হবে। (আয়োডিন পানিতে স্বল্প মাত্রায় দ্রবণীয়, কিন্তু পটাসিয়াম আয়োডাইডের উপস্থিতিতে দ্রবণীয়তা অনেক গুণ বাড়ে। সে কারণে পটাসিয়াম আয়োডাইড যোগ করা

হয়েছে) একটি সদ্য মাড় দেওয়া কাপড়ে এ দ্রবণ হতে কয়েক ফোঁটা দ্রবণ ফেল। দেখবে গাঢ় নীল বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষককে এ নীল রং দেখাও।

একটি পরীক্ষানলে প্রায় 5 mL পানি নিয়ে তাতে হাইপোর 2-3টি দানা যোগ করে ঝাঁকাও। সাথে সাথে তা দ্রবীভূত হবে।

ছপারের সাহায্যে এখান থেকে দ্রবণ নিয়ে দুই/এক ফোঁটা কাপড়ের নীল রঙের উপর যোগ কর, দেখবে হাইপো দেওয়া স্থানে নীল রং হালকা হয়েছে। নীল রংযুক্ত সম্পূর্ণ কাপড়ে ফোঁটায় ফোঁটায় হাইপো লবণ যোগ করে নীল রং সম্পূর্ণরূপে দূর করে শিক্ষককে দেখাও।

সাবধানতা : বিক্রিয়ায় যে সোডিয়াম আয়োডাইড উৎপন্ন হয়, তা দীর্ঘক্ষণ বাতাসে থাকলে ধীরে ধীরে জারিত হয়ে আয়োডিন মুক্ত করতে পারে, তখন আবার নীল রং ফিরে আসবে। সুতরাং কাপড় হতে এ রং স্থায়ীভাবে দূরীকরণের জন্য হাইপো দিয়ে বিরঞ্জন করার পর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। আয়নিক যৌগ হওয়ায় সোডিয়াম ও পটাসিয়াম আয়োডাইড পানিতে ভালো দ্রবণীয়, সুতরাং সহজেই তা পানি দ্বারা দূরীভূত হবে।

পরীক্ষা নং ১১

শিরোনাম : বিভিন্ন শিলার উপাদান পরীক্ষাকরণ।

উদ্দেশ্য : চূনাপাথর, মার্বেল ও সাধারণ পাথর শনাক্ত করা।

সতর্কতা নির্দেশ : পরীক্ষাগারে সবসময় এপ্রন ও নিরাপদ চশমা ব্যবহার করবে।

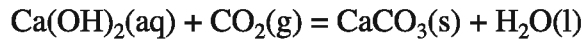
যন্ত্রপাতি : পরীক্ষানল ও 90° ঝাঁকানো নির্গম নল।

রাসায়নিক দ্রব্য : লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড, চুনের পানি বা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ, অ্যামোনিয়াম অক্সালেট।

তত্ত্ব : মার্বেল ও চূনাপাথর হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট। সুতরাং এদের সাথে হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ করলে নিম্নরূপ বিক্রিয়া হয়।



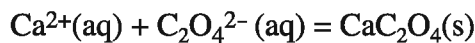
কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বুদবুদ আকারে নির্গত হয়। এ গ্যাসকে চুনের পানির মধ্য দিয়ে চালনা করলে চুনের পানি ঘোলাটে হয়।



অতিরিক্ত গ্যাস চালনা করলে এ ঘোলাটে ভাব দূর হয়।



এভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড শনাক্তকরণ করা হয় এবং নমুনায় কার্বনেট আয়নের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গমনের পরে বিক্রিয়া মিশ্রণে ক্যালসিয়াম লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। একে পরিস্রাবণ করে অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ করে প্রথমে প্রশমিত এবং শেষে ক্ষারীয় করে তাতে সোডিয়াম বা অ্যামোনিয়াম অক্সালেট দ্রবণ যোগ করলে ক্যালসিয়াম অক্সালেটের সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে। তা থেকে মূল নমুনায় ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে জানা যায়।



সাধারণত পাথরে বিভিন্ন সিলিকেট বিদ্যমান, ক্যালসিয়াম কার্বনেট নেই, তাই সাধারণ পাথর হাইড্রোক্লোরিক এসিডে অদ্রবণীয়।

সারণি ১৬.৬ : কর্মপদ্ধতি : বিভিন্ন পাথর শনাক্ত করা।

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
১। একটি পরীক্ষানলে নমুনা পাথরের কিছু অংশ (2-3g) নিয়ে তাতে প্রায় 5 mL লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ করা হল।	১। কোনো গ্যাস নির্গত হল না।	১। পাথরটি চুনাপাথর বা মার্বেল পাথর নয়।
২। (ক) আরেকটি পরীক্ষানলে অন্য আরেকটি পাথরের 2-3g নিয়ে তাতে প্রায় 5 mL লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ করা হল।	২। (ক) একটি গ্যাস বুদবুদ আকারে নির্গত হল। গ্যাসটিকে নির্গম নলের সাহায্যে আরেকটি পরীক্ষানলে রক্ষিত চুনের পানির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হলে প্রথমে তা ঘোলাটে, পরে আবার পরিষ্কার হল।	২। (ক) গ্যাসটি কার্বন ডাইঅক্সাইড; সুতরাং নমুনায় কার্বনেট আয়ন উপস্থিত।
(খ) গ্যাস নির্গমন শেষ হওয়ার পরে দ্রবণটিকে পরিস্রাবণ করে আরেকটি পরীক্ষানলে নেয়া হল এবং ফোঁটায় ফোঁটায় অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ করে প্রশমিত ও ক্ষারীয় করা হল। অতঃপর তাতে অ্যামোনিয়াম অক্সালেট দ্রবণ যোগ করা হল।	(খ) সাদা অধঃক্ষেপের সৃষ্টি হল।	(খ) দ্রবণে ক্যালসিয়াম আয়ন উপস্থিত। অতএব পাথরটি ক্যালসিয়াম কার্বনেট অর্থাৎ চুনাপাথর বা মার্বেল পাথর।

পরীক্ষা নং ১২

শিরোনাম : জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া পরীক্ষাকরণ।

উদ্দেশ্য : পটাসিয়াম পারম্যাংগানেট ও অক্সালিক এসিডের বিক্রিয়া পরীক্ষা করা।

সতর্কতা নির্দেশ : পরীক্ষাগারে সবসময় এপ্রন ও নিরাপদ চশমা ব্যবহার করবে।

যন্ত্রপাতি : পরীক্ষানল বা টেস্ট টিউব, 90° বাকানো নির্গম নল, কর্ক ও বুনসেন দীপ।

রাসায়নিক দ্রব্য : পটাসিয়াম পারম্যাংগানেট, অক্সালিক এসিড, সালফিউরিক এসিড, চুনের পানি ও পাতিত পানি।

তত্ত্ব : জারক ও বিজারকের মধ্যে যে বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, তা হচ্ছে জারণ ও বিজারণ বিক্রিয়া। পটাসিয়াম পারম্যাংগানেট একটি শক্তিশালী জারক ও অক্সালিক এসিড একটি বিজারক। সালফিউরিক এসিডের উপস্থিতিতে এদের মধ্যে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া হয়।



কক্ষ তাপমাত্রায় এ বিক্রিয়া তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন হয় না, উচ্চতর তাপমাত্রায় তা দ্রুততর হয়। বিক্রিয়ায় পটাসিয়াম পারম্যাংগানেট নিঃশেষিত হয় বলে এর তীব্র বেগুনি বর্ণ বিনষ্ট হয়।

সারণি ১৬.৭ : কর্মপদ্ধতি : পারম্যাংগানেট ও অক্সালিক এসিডের বিক্রিয়া

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
১। (ক) একটি বড় টেষ্ট টিউবে 2 mL পটাসিয়াম পারম্যাংগানেটের সম্পৃক্ত দ্রবণ নিয়ে তাতে 3 - 4 mL লঘু সালফিউরিক এসিড যোগ করা হল। অতঃপর তাতে 10 mL অক্সালিক এসিডের সম্পৃক্ত দ্রবণ যোগ করা হল। (খ) এবার টেষ্ট টিউবকে বুনসেন দীপে উত্তপ্ত করা হল।	১। (ক) প্রথম দিকে বেগুনি বর্ণ সামান্য হালকা হতে দেখা গেল। (খ) পটাসিয়াম পারম্যাংগানেটের বেগুনি বর্ণ চলে গেল।	১। (ক) কক্ষ তাপমাত্রায় পটাসিয়াম পারম্যাংগানেটের সাথে অক্সালিক এসিডের বিক্রিয়া ধীরে সংঘটিত হয়। (খ) উচ্চ তাপমাত্রায় পটাসিয়াম পারম্যাংগানেটের সাথে অক্সালিক এসিডের বিক্রিয়া দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হল।

পরীক্ষা নং ১৩

শিরোনাম : ধাতব আয়ন (ধনাত্মক আয়ন বা ক্যাটায়ন) শনাক্তকরণ।

লক্ষ্যসমূহ : (ক) দ্রবণে Cu^{2+} , Fe^{2+} , Fe^{3+} ও NH_4^+ আয়নের পরীক্ষা করা। (খ) লবণে Na^+ , K^+ এবং Ca^{2+} আয়নের পরীক্ষা করা।

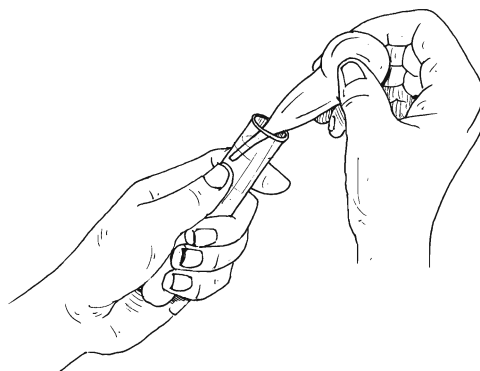
সতর্কতা নির্দেশ : পরীক্ষাগারে সবসময় এপ্রন ও নিরাপদ চশমা ব্যবহার করবে।

যন্ত্রপাতি : পরীক্ষানল, কাচ দণ্ড, নাইক্রোম তার (কাচ দণ্ডে সংযুক্ত) ও বুনসেন দীপ।

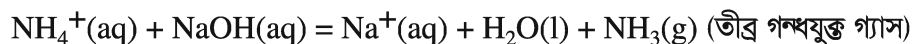
রাসায়নিক দ্রব্য : $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$; $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$; FeCl_3 ; NH_4Cl ; NaCl ; KCl ও CaCl_2

তত্ত্ব : (১) বিভিন্ন ক্যাটায়ন বিভিন্ন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে নানা বর্ণের ও ধরনের অধঃক্ষেপ বা গ্যাস সৃষ্টি করে। তাদের বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে কোনো অজ্ঞাত নমুনায় বিভিন্ন ক্যাটায়ন শনাক্ত করা যায়। যেমন Cu^{2+} , Fe^{2+} , Fe^{3+} আয়ন বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন দ্রবণে লঘু অ্যামোনিয়া যোগ

বাদামি বর্ণের অধঃক্ষেপ পড়ে। অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া যোগ করলে Cu^{2+} আয়ন থেকে প্রাপ্ত অধঃক্ষেপটি দ্রবীভূত হয়ে গাঢ় নীল বর্ণের দ্রবণ উৎপন্ন করে, কিন্তু অন্যান্য অধঃক্ষেপের ক্ষেত্রে আর কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। সুতরাং এভাবে এ তিনটি আয়ন শনাক্ত করা যায়। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ যোগ করলে প্রথম তিনটি আয়ন একই ধরনের অধঃক্ষেপ দেয়। কিন্তু অ্যামোনিয়াম আয়নের ক্ষেত্রে একটু তাপ দিলে অ্যামোনিয়া গ্যাস নির্গত হয়, যা তার ঝাঁঝালো গন্ধ এবং গাঢ় HCl এর সাথে সাদা ধোঁয়া সৃষ্টির মাধ্যমে চেনা যায়।



চিত্র ১৬.১২ : পরীক্ষানলে ছপার দিয়ে বিক্রিয়ক দ্রবণ যোগকরণ



(২) শিখা পরীক্ষায় কিছু ধাতব আয়ন তাদের বৈশিষ্ট্যমূলক বর্ণ প্রদর্শন করে। যেমন সোডিয়াম সোনাগি হলুদ, পটাসিয়াম হালকা বেগুনি এবং ক্যালসিয়াম ক্ষণস্থায়ী ইট-লাল বর্ণ দেখায়। সুতরাং শিখা পরীক্ষা দ্বারা এ সকল ক্যাটায়ন সহজেই শনাক্তকৃত হয়।

সারণি ১৬.৮ : (ক) কর্মপদ্ধতি : দ্রবণে Cu^{2+} , Fe^{2+} , Fe^{3+} ও NH_4^+ আয়নের পরীক্ষা

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
১। একটি পরীক্ষানলে একটি নমুনা দ্রবণ নিয়ে তাতে ফোঁটায় ফোঁটায় লঘু অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ করা হল। একইভাবে বিভিন্ন পরীক্ষানলে বিভিন্ন নমুনা দ্রবণ নিয়ে পরীক্ষা করা হল।	(ক) নীলাভ সাদা অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হল, যা অতিরিক্ত অ্যামোনিয়ায় দ্রবীভূত হয়ে গাঢ় নীল বর্ণের দ্রবণ তৈরি করে।	(ক) Cu^{2+} আয়ন উপস্থিত। প্রথমে কিউপ্রিক হাইড্রোক্সাইডের অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হয়। $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{OH}^{-}(\text{aq}) = \text{Cu}(\text{OH})_2(\text{s})$ অতিরিক্ত অ্যামোনিয়ায় তা দ্রবীভূত হয়। $\text{Cu}(\text{OH})_2 + 4\text{NH}_3 = [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4](\text{OH})_2$
	(খ) মন্দা সবুজ অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হল, যা অতিরিক্ত অ্যামোনিয়াতে দ্রবীভূত হয় না।	(খ) Fe^{2+} আয়ন উপস্থিত। মন্দা সবুজ অধঃক্ষেপটি ফেরাস হাইড্রোক্সাইডের। $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{OH}^{-}(\text{aq}) = \text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s})$
	(গ) লালচে বাদামি অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হল, যা অতিরিক্ত অ্যামোনিয়াতে দ্রবীভূত হয় না।	(গ) Fe^{3+} আয়ন উপস্থিত। লালচে বাদামি অধঃক্ষেপটি ফেরিক হাইড্রোক্সাইডের। $\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{OH}^{-}(\text{aq}) = \text{Fe}(\text{OH})_3(\text{aq})$
	(ঘ) কোনো অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হল না।	(ঘ) Cu^{2+} , Fe^{2+} ও Fe^{3+} আয়ন অনুপস্থিত।
২। একটি পরীক্ষানলে অল্প পরিমাণ একটু দ্রবণ নিয়ে তাতে ফোঁটায় ফোঁটায় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করা হল। পরীক্ষানলে একটু তাপ দেওয়া হল।	(ক) নীলাভ সবুজ অধঃক্ষেপ পড়ে। যা অতিরিক্ত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণে দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ করলে গাঢ় নীল বর্ণের দ্রবণ তৈরি হয়।	(ক) Cu^{2+} আয়ন উপস্থিত।
	(খ) মন্দা সবুজ অধঃক্ষেপ পড়ে, যা অতিরিক্ত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা অ্যামোনিয়া দ্রবণে দ্রবীভূত হয় না।	(খ) Fe^{2+} আয়ন উপস্থিত।

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
	<p>(গ) লালচে বাদামি অধঃক্ষেপ পড়ে, যা অতিরিক্ত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা অ্যামোনিয়া দ্রবণে দ্রবীভূত হয় না।</p> <p>(ঘ) ঝাঁঝালো গন্ধ ওঠে। পরীক্ষানলের মুখে HCl সিক্ত কাচ দণ্ড ধরলে সাদা ধোয়ার সৃষ্টি হয়।</p>	<p>(গ) Fe^{3+} আয়ন উপস্থিত।</p> <p>(ঘ) NH_4^+ আয়ন উপস্থিত। NaOH যোগে ঝাঁঝালো গন্ধ বিশিষ্ট অ্যামোনিয়া গ্যাস সৃষ্টি হয়। $\text{NH}_4^+ (\text{aq}) + \text{NaOH}(\text{aq}) = \text{Na}^+ (\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{NH}_3(\text{g})$ কাচ দণ্ড হতে বাষ্পায়িত HCl এর সাথে তা বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সাদা ধোয়া উৎপন্ন করে। $\text{NH}_3 (\text{g}) + \text{HCl}(\text{g}) = \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$</p>

সারণি ১৬.৯ : (খ) কর্মপদ্ধতি : কঠিন নমুনা লবণে Na^+ , K^+ ও Ca^{2+} আয়নের শিখা পরীক্ষা

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
একটি ওয়াচ গ্লাসে গাঢ় HCl নিয়ে কাচ দণ্ডের সাথে যুক্ত একটি নাইক্রোম তারকে এর মধ্যে ডুবানো হল। তারপর বুনসেন দীপের অনুজ্জ্বল শিখায় উত্তপ্ত করে পরীক্ষার করা হল, যেন তা শিখায় কোনো বর্ণ সৃষ্টি না করে। এরপর নাইক্রোম তারকে গাঢ় HCl-এ ডুবিয়ে একটি নমুনা লবণে স্পর্শ করে কিছু লবণ তার সাথে লাগানো হল। এবার লবণসহ তারটিকে বুনসেন দীপের অনুজ্জ্বল শিখায় স্পর্শ করানো হল। দীপ শিখার বর্ণ সরাসরি এবং নীল কাচের মধ্য দিয়ে লক্ষ করা হল। অন্যান্য নমুনা লবণ নিয়েও একই পরীক্ষা করা হল।	<p>(ক) সোনালি হলুদ বর্ণ সৃষ্টি হয়, যা নীল কাচের মধ্য দিয়ে বর্ণহীন দেখায়।</p> <p>(খ) ঈষৎ বেগুনি বর্ণ সৃষ্টি হয়, যা নীল কাচের মধ্য দিয়ে গাঢ় লাল বর্ণ দেখায়।</p> <p>(গ) ইটের ন্যায় লাল বর্ণের সৃষ্টি হয়, যা নীল কাচের মধ্য দিয়ে হালকা সবুজ দেখায়। এ বর্ণ ক্ষণস্থায়ী।</p>	<p>(ক) Na^+ আয়ন উপস্থিত</p> <p>(খ) K^+ আয়ন উপস্থিত</p> <p>(গ) Ca^{2+} আয়ন উপস্থিত</p>

(ঙ) শিক্ষকদের জন্য পরামর্শ : ছাত্রদেরকে প্রথমে নমুনা লবণ হিসেবে যথাক্রমে $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$; $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$; FeCl_3 ; NaCl ; KCl এবং CaCl_2 প্রদান করুন। প্রথম চারটি আয়নের পরীক্ষার জন্য লবণের দ্রবণ প্রদান করুন, শিখা পরীক্ষার জন্য কঠিন লবণ দিন।

সাবধানতা : হালকা নীল রঙের ফেরাস সালফেট সহজে বাতাসের অক্সিজেন জারিত হয়ে বাদামি রঙের কিছু ফেরিক সালফেট প্রদান করে।

পরীক্ষা নং ১৪

শিরোনাম : ঋণাত্মক আয়ন বা অ্যানায়নের শনাক্তকরণ।

উদ্দেশ্য : Cl^- , SO_4^{2-} ও CO_3^{2-} আয়ন শনাক্ত করা।

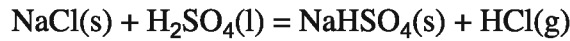
সতর্কতা নির্দেশ : পরীক্ষাগারে সব সময় এপ্রন ও নিরাপদ চশমা ব্যবহার করবে।

(ক) যন্ত্রপাতি : কয়েকটি পরীক্ষানল ও নির্গম নল।

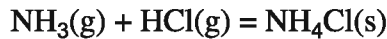
(খ) রাসায়নিক দ্রব্য : $NaCl$, Na_2SO_4 , $CaCO_3$, $AgNO_3$, $BaCl_2$, HCl , $Ca(OH)_2$, গাঢ় H_2SO_4 ও $NH_3(aq)$

(গ) তত্ত্ব : (১) ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) শনাক্তকরণ : বিভিন্নভাবে ক্লোরাইড আয়ন শনাক্ত করা যায়।

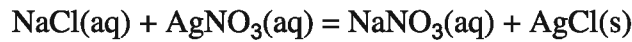
শুষ্ক পরীক্ষা : কঠিন ক্লোরাইড লবণে গাঢ় সালফিউরিক এসিড যোগ করে তাপ দিলে বর্ণহীন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস নির্গত হয়। গ্যাসটি ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ও শ্বাসরোধী।



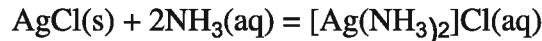
পরীক্ষানলের মুখে গাঢ় অ্যামোনিয়া দ্রবণ সিক্ত একটি কাচ দণ্ড ধরলে সাদা ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। এ সময় হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস অ্যামোনিয়া গ্যাসের সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করে।



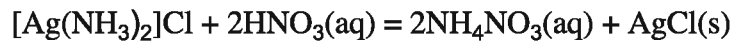
আর্দ্র পরীক্ষা : ক্লোরাইড লবণের জলীয় দ্রবণকে লঘু নাইট্রিক এসিড দিয়ে অম্লীয় করে তাতে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ যোগ করলে সিলভার ক্লোরাইডের দইয়ের মতো সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে।



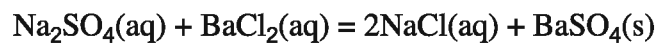
এ অধঃক্ষেপ নাইট্রিক এসিডে অদ্রবণীয়, কিন্তু অ্যামোনিয়া দ্রবণে জটিল যৌগ সৃষ্টির কারণে দ্রবণীয়।



এ পরিষ্কার দ্রবণে নাইট্রিক এসিড যোগ করলে আবার সাদা অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়।



(২) সালফেট আয়ন (SO_4^{2-}) শনাক্তকরণ : সালফেট আয়নকে নিম্নের আর্দ্র পরীক্ষা দ্বারা সবচেয়ে সহজ ও নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করা যায়। সালফেট লবণের জলীয় দ্রবণে লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ করে অম্লীয় করে তাতে বেরিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ যোগ করলে বেরিয়াম সালফেটের সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে। এ অধঃক্ষেপ লঘু নাইট্রিক এসিড বা অ্যামোনিয়াতে দ্রবণীয় নয়।



(৩) কার্বনেট আয়নের CO_3^{2-} শনাক্তকরণ : শুধুমাত্র ক্ষারীয় ধাতুসমূহের (এবং অ্যামোনিয়াম) কার্বনেট পানিতে দ্রবণীয় হওয়ায় এ আয়নের আর্দ্র পরীক্ষা গুরুত্বহীন। শুষ্ক পরীক্ষায় কার্বনেট লবণে লঘু হাইড্রোক্লোরিক/নাইট্রিক এসিড যোগ করা হয়। তখন বুদবুদ আকারে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়।



চুনের পানির মধ্যে দিয়ে এ গ্যাস প্রবাহিত করলে অদ্রবণীয় মিহি ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সৃষ্টি হওয়ায় চুনের পানি গোলাটে হয়।



অতিরিক্ত গ্যাস চালনা করলে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেটে পরিণত হয়, ফলে ঘোলাটে দ্রবণ আবার পরিষ্কার হয়।



সারণি ১৬.১০ : কর্মপদ্ধতি : Cl^- , SO_4^{2-} ও CO_3^{2-} -অ্যানায়নের পরীক্ষা

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
<p>১। একটি পরীক্ষানলে অল্প কঠিন লবণ নিয়ে তাতে 10 ফোঁটার মতো গাঢ় সালফিউরিক এসিড যোগ করা হল এবং বুনসেন বার্নারে মৃদু তাপ দেওয়া হল। একটি কাচ দণ্ডকে গাঢ় অ্যামোনিয়া দ্রবণে ডুবিয়ে পরীক্ষানলের মুখের নিকটে ধরা হয়।</p> <p>২। (ক) একটি পরীক্ষানলে অল্প পরিমাণে কঠিন লবণ নিয়ে তাতে পানি যোগ করে দ্রবীভূত করা হল (অথবা নমুনাকে দ্রবণ হিসেবে দেওয়া হলে অল্প দ্রবণ নেওয়া হল। এতে কয়েক ফোঁটা লঘু নাইট্রিক এসিড যোগ করে দ্রবণের সম পরিমাণ সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ যোগ করা হল।</p> <p>(খ) অধঃক্ষেপ পড়ার পরে পরীক্ষানলটি কাত করে তরল ফেলে দেওয়া হল, যেন সাদা অধঃক্ষেপ পরীক্ষানলে থেকে যায়। পরীক্ষানলে কিছু নাইট্রিক এসিড যোগ করা হল।</p> <p>(গ) পরীক্ষানলকে কাত করে নাইট্রিক এসিড ফেলে দেওয়া হল। তারপর কিছু পানি যোগ করে আবার কাত করে তা দূর করা হল। এরপর তাতে লঘু অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ করা হল। পরিস্কার দ্রবণ পাওয়ার পরে তাতে লঘু নাইট্রিক এসিড যোগ করা হল।</p> <p>৩। (ক) একটি পরীক্ষানলে অল্প কিছু কঠিন নমুনা লবণ নিয়ে তা পানিতে দ্রবীভূত করা হল (অথবা নমুনাকে দ্রবণ হিসেবে সরবরাহ করা হল)। 2 mL লঘু নাইট্রিক এসিড যোগ করা হল।</p> <p>৪। একটি পরীক্ষানলে 1-2g কঠিন নমুনা লবণ নিয়ে তাতে 5-7 mL লঘু হাইড্রোক্লোরিক এসিড যোগ করা হল। এ পরীক্ষানলের সাথে একটি নির্গম নল যোগ করে উৎপন্ন গ্যাসকে আরেকটি পরীক্ষানলে রক্ষিত চুনের পানির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হল।</p>	<p>১। পরীক্ষানলের মুখে সাদা ধোঁয়ার সৃষ্টি হল।</p> <p>২। (ক) দইয়ের মতো সাদা অধঃক্ষেপ পড়ল।</p> <p>(খ) সাদা অধঃক্ষেপ লঘু নাইট্রিক এসিডে দ্রবীভূত হল না।</p> <p>(গ) সাদা অধঃক্ষেপটি লঘু অ্যামোনিয়াতে দ্রবীভূত হয়ে পানির ন্যায় বর্ণহীন পরিস্কার দ্রবণ তৈরি করল। এতে লঘু নাইট্রিক এসিড যোগ করায় আবার সাদা অধঃক্ষেপ ফিরে আসলো।</p> <p>৩। (ক) সাদা অধঃক্ষেপের সৃষ্টি হল।</p> <p>৪। বুদবুদ আকারে গ্যাস বের হল। চুনের পানির মধ্য দিয়ে এ গ্যাস প্রবাহের ফলে প্রথমে ঘোলাটে হল, পরে তা আবার পরিস্কার হল।</p>	<p>১। Cl^- আয়ন উপস্থিত।</p> <p>২। Cl^- আয়ন উপস্থিত।</p> <p>৩। SO_4^{2-} আয়ন উপস্থিত।</p> <p>৪। CO_3^{2-} আয়ন উপস্থিত।</p>

শিক্ষকদের জন্য পরামর্শ : ছাত্রদের প্রথমে নমুনা লবণ হিসেবে যথাক্রমে NaCl, Na₂SO₄ ও CaCO₃ প্রদান করুন। পরবর্তীতে অন্যান্য লবণ দিয়ে এ পরীক্ষা করাতে পারেন।

পরীক্ষা নং ১৫

শিরোনাম : বিভিন্ন ফুলের রং নিষ্কাশন এবং অম্ল ও ক্ষারে তাদের বিক্রিয়া পরীক্ষণ।

উদ্দেশ্য : (ক) কৃষ্ণচূড়া, জবা ও গোলাপ ফুল এবং কাঁচা হলুদের রং নিষ্কাশন করা।

(খ) নিষ্কাশিত রং লেবুর রস ও চুনের পানিতে^৩ পরীক্ষা করা।

সতর্কতা নির্দেশ : পরীক্ষাগারে সব সময় এপ্রন ও নিরাপদ চশমা ব্যবহার করবে।

যন্ত্রপাতি : মর্টার, বিকার, পরীক্ষানল ও পানি গাহ।

রাসায়নিক দ্রব্য : লিটমাস (লিটমাস দ্রবণরূপে), লেবুর রস, চুনের পানি ও ফুল।

তত্ত্ব : ফুলের রং হচ্ছে এক বা একাধিক জৈব যৌগ। ফুলের উপর পানিতে অদ্রবণীয় যৌগের আবরণ থাকায় ফুলকে পানিতে ডুবালেই তার রং নিষ্কাশিত হয় না। ফুলকে বেটে মিহি করলে দ্রাবক ফুলের সমগ্র অংশের সংস্পর্শে আসতে পারে, তখনই ফুলের রং নিষ্কাশিত হতে পারে। অনেক ফুলের রং পানি দ্বারা নিষ্কাশিত হলেও ইথানল, অ্যাসিটোন প্রভৃতি জৈব দ্রাবক অধিকতর ভালো নিষ্কাশনকারী। বিভিন্ন ফুলের রঙিন পদার্থ ভিনু ভিনু যৌগ, এরা নানা ধর্মবিশিষ্ট হতে পারে। লিটমাসের সাহায্যে এদের অম্লতা, ক্ষারতা বা নিরপেক্ষতা পরীক্ষা করা যায়। যদি নিষ্কাশিত যৌগ লাল লিটমাসকে নীল করে, তবে তা ক্ষারীয়; যদি নীল লিটমাসকে লাল করে, তবে তা অম্লীয় এবং যদি কোনো ধরনের পরিবর্তন না করে, তবে তা নিরপেক্ষ। এখানে লিটমাস নির্দেশকের কাজ করছে। লিটমাসের পরিবর্তে ফুল হতে নিষ্কাশিত দ্রবণগুলোও নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অম্লধর্মী লেবুর রস ও ক্ষারধর্মী চুনের পানির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখান হল।

কর্মপদ্ধতি : যে কোনো এক জাত ফুলে 5-6টি পাপড়ি নাও। মর্টারে তা পিষে মিহি কর। অতঃপর তা একটি বিকারে নিয়ে 25-30 mL পানি যোগ কর এবং কাচ দণ্ড দিয়ে ভালো করে নাড়। একটি বড় পাত্রে কিছু গরম পানি নিয়ে বিকারটি তাতে বসিয়ে নাড়লে আরও ভালো হয়। 2-1 মিনিট নাড়ার পরে পরিস্রাবণ কর। পরিস্রুত হচ্ছে নিষ্কাশিত রঙের দ্রবণ। এ নিষ্কাশিত দ্রবণ নিয়ে নিচের পরীক্ষাগুলো কর।

সারণি ১৬.১১ : পানিতে নিষ্কাশিত ফুলের রং পরীক্ষা

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
১। পানিতে নিষ্কাশিত কৃষ্ণচূড়া ফুলের হলুদ রঙের (ক) এক অংশে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস দেয়া হল। (খ) অন্য অংশে কয়েক ফোঁটা চুনের পানি মিশানো হল।	(ক) দ্রবণ লাল রং ধারণ করল। (খ) দ্রবণ হলুদাভ সবুজ রং ধারণ করল।	এ সমস্ত রং (Dye) নিরপেক্ষ, অম্লীয় এবং ক্ষারীয় অবস্থায় বিভিন্ন রং প্রদর্শন করে।
২। পানিতে নিষ্কাশিত জবা ফুলের লাল রঙের (ক) এক অংশে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস দেয়া হল। (খ) অন্য অংশে কয়েক ফোঁটা চুনের পানি মিশানো হল।	(ক) দ্রবণ গাঢ় লাল রং ধারণ করল। (খ) দ্রবণ গাঢ় সবুজ রং ধারণ করল।	

২. লেবুর রস খুব অম্লীয়। এতে ascorbic acid বা ভিটামিন-সি এবং citric acid বিদ্যমান।

৩. চুনের পানি ক্ষারীয়। এতে Ca(OH)₂ বিদ্যমান।

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
৩। পানিতে নিষ্কাশিত গোলাপ ফুলের খয়েরি রঙের (ক) এক অংশে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস, (খ) অন্য অংশে কয়েক ফোঁটা চুনের পানি দেয়া হল।	(ক) দ্রবণ গাঢ় গোলাপি রং ধারণ করল। (খ) দ্রবণ প্রথম কয়েক ফোঁটা গাঢ় ক্ষারে সবুজ রং এবং অতিরিক্ত ক্ষারে কমলা রং ধারণ করল।	অতএব লিটমাসের ন্যায় এ রংগুলো নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
৪। সিদ্ধ পানিতে নিষ্কাশিত কাঁচা হলুদের হলুদ রঙের (ক) এক অংশে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস, (খ) অন্য অংশে কয়েক ফোঁটা চুনের পানি মিশানো হল।	(ক) দ্রবণ প্রায় বর্ণহীন হয়ে গেল। (খ) দ্রবণ ইট-লাল রং ধারণ করল।	

নিষ্কাশিত পানির বেশি অংশ বিকারে লও এবং বিকারটি পানিগাহে রেখে পানি বাষ্পীভূত কর। নিষ্কাশিত রং বিকারে প্রায় শুষ্ক অবস্থায় পড়ে থাকবে। একে একটি কাচের নমুনা শিশিতে ভরে শিক্ষকের নিকট জমা দাও। এ সমস্ত অনেক প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রং আমরা বহুবিধ কাজে ব্যবহার করি। যেমন : কাপড় রাঙানোর কাজে, অনেক টিনজাত খাদ্য রাঙানোর কাজে এগুলো ব্যবহৃত হয়।

একটি কাগজের লেবেলে তোমার নাম, ফুলের নাম ও রঙের প্রকৃতি (অম্লীয়, ক্ষারীয় বা নিরপেক্ষ) লিখে লেবেলটি আঠার সাহায্যে শিশির গায়ে আটকে দাও। একইভাবে অন্যান্য ফুলের রং নিষ্কাশন ও ধর্ম পরীক্ষা কর।

শিক্ষকদের জন্য পরামর্শ : পরীক্ষা নং ১৫ এবং আরো অনেক পরীক্ষা প্রজেক্ট হিসেবে করাতে পারেন। ছাত্রদের বিভিন্ন গ্রুপকে এক এক ধরনের ফুল এনে এ পরীক্ষা করতে বলুন। সবার ফলাফল একত্রিত করে প্রজেক্টের রিপোর্ট তৈরি করুন। এতে ছাত্ররা নিজে সত্যিকার কিছু করেছে বলে অনুভব করবে। চুনের পানি, লেবুর রস, ওয়াশিং সোডা এবং বানিয়া দোকান থেকে সংগ্রহ করা নিরাপদ রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে পাঠের সাথে মিল আছে এমন নানা চমৎকার পরীক্ষা সহজেই করাতে পারেন।

সমাপ্ত



শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে

— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অন্যের দোষ ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি দিও না
সব সময় নিজের দোষগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখ



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য